লাল-নীল-দেশলাই

লীলা মজুমদার

আর্ট ইউনিয়ন

প্রকাশক :
আর্ট ইউনিয়ন
৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

গ্রন্থ ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ, বাঁধাই :
আর্ট ইউনিয়ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিঃ
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট :
প্রণব বিশ্বাস

ব্লক :
রিপ্রোডাকসন সিণ্ডিকেট

পরিবেশক :
দি কাল্‌চার

তিন টাকা

নারীকুল শিরোমণি —

শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর

চরণে —

লীলা মজুমদার

সূচীপত্র

রাগমাগও করে না কখনো, হারানো জিনিষ খুঁজে খুঁজে ঘেমে ওঠে। ঝাঁটা ঝাড়ন আর একগাল হাসি নিয়ে কাজে লেগে যায় যখন তখন। নেড়ি কুত্তো পোষে না ঠিক, কিন্তু কোনো নেড়ি কুত্তো ওদের বাড়ি থেকে না খেয়ে ফেরে না।

কম পাজীও নয় নেড়ি কুত্তোগুলো। গেটের তলায় লক্ষ্মী শিক লাগাবার পর, মেদির বেড়ার তিনচার জায়গায় টানেল্ বানিয়ে ফেলল। শেষটা অতগুলো টাকা খরচ করে লক্ষ্মী আগাগোড়া বিলিতী জালের ঘের দিয়ে নিতে বাধ্য হল। লক্ষ্মীর কাছে পার পাবার জো নেই। নিজেকেও যেমন রেহাই দেয় না কখনো, পরকেও তেমনি ছেড়ে কথা কয় না। বাড়িতে একটা কুটো পড়ে থাকে না, একটা কণা নষ্ট হয় না। সংসারের একটা কর্তব্য বাকি পড়ে থাকে না; সব চাঁদা দেয়া হয়, সব চিঠির উত্তর যায়, সব ছেঁড়া সেলাই হয়, সব অন্যায়ের প্রতিকার হয়, সব গুণের আদর হয়, সব দোষের সাজা হয়— এইখানে ফটিকের কথা মনে হতেই নবগোপালবাবু ছোট্ট একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে গেলেন। যাক লক্ষ্মীছাড়া! কলেজে পড়বে না, কারখানায় যাবে। যাক না কারখানায়, বুঝুক কত মজা। লক্ষ্মীর আর কি দোষ, ওর ভালোর জন্যই যা বলবার বলেছে। মা নেই, বাপ একটা মোদো মাতাল, মামী বলবেনা তো কে বলবে—তবু খালি খালি মন্দারবেঁটে বেঁটে কোঁকড়া চুলে ঘেরা হাসি-মাখা মুখটার কথা মনে হতে লাগল। ছোটবেলায় ভাবী ন্যাওটা ছিল নব-গোপালবাবুর, ভারী ভাবনা ছিল দাদার জন্য। নবগোপালবাবু পেয়ারা গাছে চড়লে, গাছের গুঁড়ি ধরে দাঁড়িয়ে থাকত মন্দা, গাছ উলটে পড়লে ঠেকা দেবে বলে।

সূর্য ডুবে যাবার পরও মাঝে মাঝে যে একটা লালচে আলো দেখা যায়, সেই আলো আজ চারিদিকে মেখে রয়েছে। নবগোপালবাবু আকাশের দিকে চাইলেন, এক ঝাঁক বক উত্তর দিকে উড়ে চলেছে। কোথায় গেল ফটিকটা কে জানে, একটুতেই সর্দি লাগে, রোজ মাছ খাওয়া অভ্যাস।

বাড়ির পথের মোড় ঘুরেই, নবগোপালবাবু থমকে দাঁড়ালেন। কে একটা লোক পথের ধারের কৃষ্ণচূড়ো গাছটার নীচের ডালটা ধরে দাঁড়িয়ে বাড়ির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। মতলব নিশ্চয় ভালো নয়। নবগোপালবাবু নিজেও একটু নজর করে দেখলেন। কেউ কোথাও নেই। রঘু বাড়ির সামনের দিকের বেড়া ছাঁটছে, তার কাঁচির খচ্ খচ্ শোনা যাচ্ছে, আর পিছনের গোল বারান্দায় একটা জলচৌকীতে বসে লক্ষ্মী নিবিষ্ট মনে একটা কাঠির আগায় সাবান মাখা ন্যাকড়া জড়িয়ে, রাশি রাশি শিশিবোতল পরিষ্কার করছে। ঐ রকম মেয়ে লক্ষ্মী। কোনো জিনিষ ফেলবে না, নষ্ট হতে দেবে না, প্রাণপণ যত্ন করবে। শিশিবোতলওয়ালার কাছে যেগুলো বিক্রী হবে, সে বোতল-

গুলোও নিজের হাতে ধুয়ে রাখবে। ভারী লক্ষ্মী মেয়ে লক্ষ্মী। ওর হাতে পড়ে নবগোপালবাবুর জীবনটাই অন্য রকম হয়ে গেছে। নইলে এমন সময় ছিল যখন সূর্য ডোবার পর ঐ লালচে আলো আর বক ওড়া দেখলে নবগোপালবাবুর মনটা আনচান করে উঠত, মনে হত—ততক্ষণে কৃষ্ণচূড়ো গাছের ডাল ধরা লোকটার একেবারে সামনাসামনি এসে পড়েছেন নবগোপালবাবু।

"কি হচ্ছে কি?"

লোকটা এমনি তন্ময় হয়ে তাকিয়েছিল যে, দারুণ চমকে গিয়ে আরেকটু হলে পড়েই যাচ্ছিল। কোনো রকমে সামলে নিল। তার মুখটা যেন ভারী খুসিতে ভরা। একটু লজ্জিত ভাবে বলল, "না; কি হতে পারত তাই দেখছি।" কেন জানি লোকটাকে ভারী ভালো লাগল নবগোপালবাবুর। দু'এক দিন দাড়ি কামায় নি, পরনে একটা রং ওঠা কর্ডুরয়ের পেন্টেলুন আর হাতকাটা খাকি সার্ট, পায়ে এক জোড়া মেটে রং-এর ক্যাম্বিশের জুতো, গালভরা হাসি, মাথা-ভরা কাঁচা-পাকায় মেশানো রাশি রাশি ঢেউ খেলানো চুল। এলোমেলো হয়ে সেগুলো কপালে এসে পড়ছে আর দুই চোখের তারায় সূর্য ডোবার পরের লালচে আলো লেগে রয়েছে। ঠিক সেই সময়, যেন কিছুর সাড়া পেয়ে লক্ষ্মী একবার হাতের শিশি থেকে চোখ তুলে, গেটের দিকে তাকাল, তারপর শিশিটাকে তুলে ধরে ভেতরটা পরীক্ষা করতে লাগল। কি জানি কেন সেই লোকটার সঙ্গে নবগোপালবাবুও করবী গাছের ঘন অন্তরালে সরে দাঁড়ালেন। লোকটা কানে কানে বলল—"ও মেয়েদের কাছ থেকে পালানো ছাড়া উপায় নেই। আসুন আমার সঙ্গে।"

করবী গাছের নীচে, টক দই-এর কৌটো—ভাঁড় আনার অসুবিধা দেখে লক্ষ্মী কৌটোর ব্যবস্থা করে দিয়েছে, পুরোণো সাজা তিন দিনের বেশী রাখতে হয় না, লক্ষ্মী বলে—মাখনের টিন, কাপড় কাচার সাবান আর কাগজের ঠোঙায় কি কি যেন ছিল, সব নামিয়ে রেখে, বিনাবাক্যব্যয়ে নবগোপালবাবু গুটি গুটি লোকটির সঙ্গে চললেন।

বাগমারির রাস্তার বাঁক ঘুরে পথের ধারে একটা পুরোন নড়বড়ে মোটর-গাড়ি দাঁড়িয়েছিল, সেকালে যেমন থাকত, দুপাশে তার পাদানি রয়েছে। কোনো কথা না বলে দুজনে পাশাপাশি সেই পাদানির উপর বসে পড়লেন। লোকটা পকেট থেকে তুবড়োন এক প্যাকেট সিগারেট বের করে একটা ওঁর হাতে গুঁজে দিল, একটা নিজে ধরাল। তার পরেই মুখ থেকে সিগারেটটা আবার বের করে বলল, "ভগবানের কি দয়া ভেবে দেখুন, ঐ মেয়ের হাতে আমি আরেকটু হলেই আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছিলাম।"

নবগোপালবাবু বললেন, "কবে?"

"ও সে ত্রিশ বছরেরও বেশী হবে। ও বাড়িটা ওর বাবার ছিল। ও-ও

ঠিক ঐ রকমই ছিল, আরেকটু বয়স কম, ওজন কম, রং ফর্সা, মাথায় চুল বেশী, নইলে হুবহু ঐ রকম। কি জানি কি চোখে দেখেছিলাম ওকে, দারুণ প্রেমে পড়ে গেছিলাম। জানেনই তো প্রেমের কোনো নিয়মকানুন নেই, কত সময় ভুল লোকের সঙ্গে প্রেমে পড়ে, তাকে বিয়ে করে, তার সঙ্গে কত লোক জীবন কাটিয়ে দেয়, সে যে ভুল লোক তা সন্দেহও না করে। আমারো আরেকটু হলেই তাই হচ্ছিল। টাকাপয়সা জোগাড় করে একটা হীরের আংটিও কিনে ফেলেছিলাম, ওর ভারী সখ। তারপর এমনি সন্ধ্যাবেলায় ওদের ঐ বাড়িতে যাচ্ছিলাম, এমনি লালচে আলো, শির শিরে বাতাস আর বক ওড়ার সময়। ঐ কেষ্টচূড়োর গাছটা তখন ছিল না, বড় রাস্তা থেকেই সব দেখা যেত। দেখলাম ঠিক ঐ জায়গায়, ঐ জলচৌকীটাই কি না তা বলতে পারলাম না, তবে ঠিক ঐ রকম করে কাঠির আগায় ন্যাকড়া জড়িয়ে শিশিবোতল পরিষ্কার করছে। ঐ রকম করে যেই আলোর দিকে তুলে ধরেছে, বুকের মধ্যে ধড়াস্ করে উঠল, চোখ থেকে রঙ্গীন চশমা খসে পড়ল, বুঝলাম দুনিয়াকে দেখবে ও বোতলের ভিতর দিয়ে। কি বলব আপনাকে, জিনিষ কেনবার সময়ও যদি দাঁড়িপাল্লার ডান দিকে সওদা আব বাঁ দিকে বাটখারা রেখে একবার ওজন করে, আবার পাল্টে নিয়ে, বাঁ দিকে সওদা আর ডান দিকে বাটখারা রেখে দুবার করে ওজন না করে তো কি বলেছি—দেখুন যে মেয়ে ঠকতে ভয় পায় তাকে কখনো বিয়ে করবেন না।"

নবগোপালবাবু গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, "তারপর কি হল?"

সে বললে, "হীরের আংটি পকেটে নিয়ে দিলাম টেনে দৌড়। হীরের আংটি বিক্রী করে প্রথমে একটা ঘোড়ার গাড়ি কিনেছিলাম, ঘুরে ঘুরে হোমিও-প্যাথি ওষুধ বিক্রী করতাম। কোথায় যে যাইনি সে আর কি বলব। আসামে গেছি, বর্মায় গেছি, কাম্বোডিয়া গেছি। ঘোড়ার গাড়ি বেচে নৌকো কিনেছিলাম। নৌকো বেচে এই গাড়িটা কিনেছি। জানেন আমার ঔাম্পি খেতে ভাল লাগে। পাথরের শিশিতে আছে একটু আমার কাছে, চেখে দেখবেন?" লোকটা অমনি উঠে দাঁড়াল। নবগোপালবাবু বললেন, "ও বাবা, না!" "কেন, ভয় কিসের? গন্ধকে ভয় পান নাকি? আমি উটের চামড়ার থলিতে রাখা উটের দুধের দই খেয়েছি, তা জানেন? গন্ধ আর আমার কিছু করে না। শুঁকুন, এটা কি?" কি একটা ন্যাকড়ায় জড়ানো ছোট্ট শিশি নবগোপালবাবুর নাকের তলায় ধরল। ভুরভুর করতে লাগল কস্তূরীর গন্ধ। লোকটা লজ্জিতভাবে বললে, "কাঁচা কস্তরী। নিজে খুঁজে পেয়েছিলাম।"

মাথার ওপরে খুব নীচু দিয়ে বক ওড়ে, সূর্য ডোবার পরের লালচে আলো ফিকে হয়ে আসে, লোকটা উঠে দাঁড়ায়।

"চলি। রাতের জন্য একটা আস্তানা খুঁজে নিতে হবে। নেবেন একটু কস্তূরী? পাঁচ সিকে ছোট শিশি, পাঁচ টাকা বড় শিশি।"

বড় দুঃখে নবগোপালবাবু মাথা নাড়লেন। লক্ষ্মীর কাছে কড়ায় গণ্ডায় হিসেব দিতে হয়। যেন মনের কথা বুঝতে পেরে লোকটি বললে, "আচ্ছা থাক। কথা বলে বড় আনন্দ পেলাম।" গাড়িতে উঠে এঞ্জিনে ষ্টার্ট দিয়ে আবার বললে, যারা সরু লম্বা খাতায় হিসেব লেখে এমন মেয়ে কখনো বিয়ে করবেন না। চলি তবে।" হাত নেড়ে চলে গেল লোকটা।

নবগোপালবাবু আস্তে আস্তে ফিরে এলেন, করবী গাছতলা থেকে সওদা-গুলো তুলে নিয়ে, পিছনের গেট খুলে আস্তে আস্তে বাড়ি ফিরলেন। লক্ষ্মী ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। "কিছু হয় নি তো? এত দেরী দেখে ভাবনা হচ্ছিল। যেতে কুড়ি মিনিট, আসতে কুড়ি মিনিট। সেখানে আধঘণ্টাই ধরলাম, তার বেশী তো লাগা উচিত নয়।"

তারপর জিনিষগুলি তুলতে তুলতে বললে, "দইটার ওজন দেখেছিলে? ভারী ঠকায় কিন্তু।"

বাইরের আকাশ থেকে সূর্য ডোবার পরের লাল আলোর শেষ চিহ্নটুকু মুছে গেল। এক ঝাঁক বক এত নীচু দিয়ে উড়ে গেল যে, তাদের ডানার ঝটপটি কানে এল।

রাত্রে হয়তো ঝড় হবে। নাকে একটু একটু কস্তূরীর গন্ধ লেগে আছে।

স্বপ্ন

ছোটবেলায় আমি মাঝেমাঝে একটা স্বপ্ন দেখতাম। কখনও যদি কোনও কারণে মনে একটা দুঃখ দুশ্চিন্তা নিয়ে শুতে যেতাম, সেই একটা পরিচিত স্বপ্ন দেখতাম। তাকে ঠিক স্বপ্নও বলা চলে না। বরং একটা দৃশ্য দেখতাম। দেখতাম একটা সবুজ শ্যাওলা-পড়া পুকুরের কাণা ঘেঁষে একটা মস্ত তেঁতুল গাছ হয়েছে, তার গোড়ার শিকড়গুলো মাটি থেকে উঁচু উঁচু হয়ে রয়েছে, আর তার মধ্যে কতকগুলো দিন রাত্রি পুকুরের জলে ভিজে রয়েছে, তাদের গায়ের খাঁজে খাঁজে ঘন সবুজ শ্যাওলা লেগে রয়েছে। দেখতাম যেন সূর্য উঠেছে, তার রোদে পুকুরের জল ঝিকমিক করছে, কিন্তু তেঁতুলগাছতলায় গভীর ছায়া। আর ঝির ঝির শব্দ করে তেঁতুল পাতার ভিতর দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে।

আমার স্বপ্নে আমি গাছ তলায় যেতাম না; পুকুরের বাঁধ অবধি পৌঁছতাম না; দৃশ্যটা চোখে দেখতাম বটে কিন্তু নিজে থাকতাম দৃশ্যের বাইরে।

একবার নয়, দুবার নয়, বহুবহুবার আমি এই স্বপ্নটা দেখেছি। তেঁতুল গাছের প্রত্যেকটা ঝুলে পড়া পাতার গুছি, মাটি থেকে উঁচু-হয়ে-ওঠা প্রত্যেকটা শিকড়ের গিট আমার চেনা হয়ে গেছিল। তাদের কখনও কোন বদল হত না, তারা বাড়ত না, কমত না, দুরন্ত বাতাসে ঝরে পড়ত না, আর সেই ঝিরঝিরে বাতাস কখনও থামত না। সমস্ত দৃশ্যটা যেন একটা ফটোগ্রাফ, সত্যি অথচ অপরিবর্তনীয়। সবটা আমার মনের মধ্যে গেঁথে গেছিল; এমন করে গেঁথে গেছিল যে শেষটা আর ঘুমিয়ে পড়ে তবে তাদের দেখতে হত না, আমি জেগেজেগেই চোখ বুঁজলে দেখতে পেতাম সেই পুকুরধারের মস্ত তেঁতুল গাছ। হঠাৎ কেমন ধাঁধা লাগত, মনে হত ঐ তেঁতুল গাছটাই বুঝি আসলে সত্যি, আর এই আমি খাচ্ছি দাচ্ছি বেড়াচ্ছি কথা বলছি, এই আমিটাই বুঝি স্বপ্ন।

পষ্ট মনে পড়ে তখন আমার বয়স আট নয়ের বেশী নয়; আমি আসামের পাহাড়ে একটা সহরে জ্যাঠামশাই আর জ্যাঠাইমার সঙ্গে থাকতাম। আমার মা বাবা কবে আমার শৈশবে মারা গেছিলেন তাঁদের কথা একটুও মনে করতে পারি না। মনে আছে জ্যাঠামশাই আমাকে খুব ভালোবাসতেন আর জ্যাঠাইমা একটুও বাসতেন না। তাই বলে আমাকে খেতে পরতে কষ্ট দিতেন না, কিন্তু

তবু বুঝতে পারতাম জ্যাঠামশাই আমাকে ভালবাসেন বলে এটা ওটা দেন আর জ্যাঠাইমা দেন, ছোট মেয়েদের দিতে হয় বলে। আমিও জ্যাঠামশাইকে ভালবাসতাম, আর জ্যাঠাইমাকে ভালবাসতাম না, আর তিনি আমাকে ভালো-বাসেন না বলে একটুও দুঃখ হত না। কিম্বা যদি কখনও একটু বা দুঃখ হত আমি জানতাম চোখ বুঁজলেই দেখতে পাব সেই পুকুরপাড়ের তেঁতুলগাছ আর সেই বাতাসের শব্দ শুনতে পাব, আর তক্ষুণি আমার মনটা ভালো হয়ে যেত।

আমরা থাকতাম ছোট একটা বাংলো ধরণের বাড়িতে; পাশা পাশি একসারি ঘর আর তার সামনে চওড়া কাঠের বারাণ্ডা। রান্নাঘরটা আলাদা, একটু দূরে, আরও দূরে চাকরদের ঘর, একেবারে একটা ছোট পাহাড়ে নদীর উপর, তার পেছনে ঘন সরকারী জঙ্গল। মনে আছে শীতের শেষে গভীর রাত্রে আমার ঘুম ভেঙ্গে যেত, আর একা চুপ করে শুয়ে শুয়ে শুনতাম সরল গাছের বনের ভিতর শীতের হাওয়া মাতামাতি করছে, আর কোথায় যেন একটা কুকুর ক্রমাগত ডাকছে। সেই শীত আর নির্জনতা আর শূন্যতা আস্তে আস্তে আমার বুকে বোঝার মতন ভারী হয়ে আসত। আমি আমার ছোট হাত পাগুলিকে লেপের মধ্যে গুটিয়ে নিয়ে পাথরের মতন প্রায় আড়ষ্ট হয়ে যেতে গিয়ে মনে করতাম তেঁতুলগাছতলায় পুকুরের সবুজ জলে সূর্যের আলো ঝিক-মিক করছে আর মিষ্টি বাতাস দিচ্ছে। অমনি আমার কানের মধ্যে থেকে সেই উদাস হাওয়ার একটানা সুর কোথায় মিলিয়ে যেত। পৃথিবীর সব জিনিষের থেকে যার বেশী দাম সেই মনের শান্তি আমার ছোট প্রাণটাকে ভরে দিত।

মনে আছে সেখানে বর্ষাকালে অনবরত বৃষ্টি পড়ত, সেরকম অবিরাম বৃষ্টি বোধ করি পৃথিবীর আর কোন দেশে ভাবা যায় না; রাত্রে ঘুমোতে যেতাম কানে বৃষ্টির আওয়াজ নিয়ে, সকালে ঘুম ভেঙ্গে শুনতাম বাড়ির টিনের ছাদের উপর সেই একই সুরে বৃষ্টি পড়ছে। আমি জানলার কাঁচের উপর থেকে পর্দাটা সরিয়ে, পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়ে বাইরে দেখতে চেষ্টা করতাম, অবিরাম বৃষ্টি-ধারার দিকে তাকিয়ে দেখতাম অন্য দেশের মতন হীরের মালার মতন বৃষ্টিধারা নয়। এখানে আকাশ থেকে নেমে আসছে যেন এক একটি লম্বা স্রোতের মতন। হঠাৎ বৃষ্টির জলের শব্দ থেমে যেত আর আমি অবাক চোখে তাকিয়ে থাকতাম আমার সেই পুরোণ তেঁতুলগাছের ভিজে শিকড়ের উপর।

এমনি করে আস্তে আস্তে আমি বড় হতে লাগলাম। ইস্কুলে গেলাম। ছেলেবেলাকার প্রিয় খেলাগুলো একে একে ছেড়ে দিলাম, ছেলেবেলাকার আদরের জিনিষগুলি একে একে ত্যাগ করলাম। এমন কি শেষে একদিন যে জিনিষ আমার প্রাণের চেয়ে আদরের ছিল, রিলসূতোর বাক্সে ভরা কতকগুলো

শামুক ঝিনুক আর রঙীন খড়িব টুকরো, সেসবও অন্যমনস্কভাবে যে কোন অযোগ্যকে বিলিয়ে দিলাম নিজেরই মনে নেই।

আমি আরও বড় হলাম। সেলাই শিখলাম, রান্না শিখলাম, ঘর গুছোতে শিখলাম, গান গাইতে শিখলাম, চুল বাঁধতে শিখলাম, ভালো করে চলতে ফিরতে সাজতে গুজতে কথা বলতে শিখলাম। এত সব শেখার মধ্যে আর স্বপ্ন দেখার সময় কোথায়? তবু যদি কোন দিন কঠিন অসহিষ্ণু কথা বলে জ্যাঠামশাইয়ের মনে কষ্ট দিতাম, কিম্বা যদি জ্যাঠাইমা অযথা রূঢ় কথা বলতেন, কি নিজে একটা ভুল করে কি বুদ্ধিদোষে একটা গুরুতর কোন অন্যায় কাজ করে ফেলতাম, যদি রাত্রে শুতে গিয়ে মনটা বিষন্ন হত, তখনই স্বপ্ন দেখতাম গভীর সবুজ জলেব ধারে হাল্কা সবুজ পাতায় ভরা বিশাল তেঁতুলগাছ নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে সেই আমার শৈশবে যেমন দেখেছি তেমনি রয়েছে, পুকুরের জলে রোদের আলো একটুকুও ম্লান হয়নি, আর তখনই সুগভীর অনাবিল শান্তিতে আমারও মন ভরে যেত।

এক এক সময় ভেবেছি হয়তো খুব ছোট বেলায় মাবাবার সঙ্গে ঐ রকম পুকুরধারে তেঁতুল গাছ দেখেছি, সেই একটু মনে আছে আর সব ভুলে গেছি। আবার মনে হত হয়তো বড় হয়ে ঐ রকম তেঁতুলগাছতলায় কিছু একটা ঘটবে তাই অমন স্বপ্ন দেখি। কিন্তু ভিতরে ভিতবে জানতাম ও তেঁতুল গাছ পৃথিবীর মাটিতে গজায় নি, ওর চারাও এখনও অঙ্কুরিত হয় নি, কোনদিন হবেও না।

দিন দিন যেমন বড হতে লাগলাম, জ্যাঠামশাই আমাকে কাছে টেনে নিতে লাগলেন। তিনি ছিলেন পণ্ডিত মানুষ, কবি মানুষ। নিজে পণ্ডিতি করতেন না, খালি অন্য পণ্ডিতদের প্রত্যেকটি কথা বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে নিতেন আর অন্য কবিদের কবিতা অস্থি দিয়ে প্রত্যেক শিরা দিয়ে মর্মে মর্মে অনুভব করতেন। সেই কল্পনার রাজ্যে আমাকেও টেনে নিয়ে গেছিলেন। ছোট বেলা থেকে "খুকুমণির ছড়া" দিয়ে আরম্ভ কবে শেষে এমন সময় এল ইংরিজি বাংলা সব কাব্যের দরজা আমার সামনে খুলে দিলেন।

আস্তে আস্তে জ্যাঠাইমাব কাছ থেকে সরতে সরতে শেষে এমন একটা জায়গায় দাঁড়ালাম যেখানে তাঁর সব থেকে চোখা কথাটিও আর আমার মনে আঁচড় দিতে পারত না। আমার মনেব উপব যেন বর্ম আঁটা ছিল, তাকে ভেদ করতে হলে যে অস্ত্র দরকার ছিল জ্যাঠাইমার তা জানা ছিল না, কিন্তু জ্যাঠামশাই অনায়াসে দুখানা পোকা খাওয়া কালোমতন মলাটের মধ্যে থেকে বের করে দিতে পারতেন।

একজন ইংরেজ কবি একবার বলেছিলেন যা আমরা চাই, তাই যদি ধরা ছোঁয়ার মধ্যে আনা যেত, তা হলে স্বর্গও আর স্বর্গ থাকত না। যেটা

আমাদের আদর্শ সেটাকে লক্ষ্য করে আমাদের সমস্ত কাজ চলবে কিন্তু আদর্শটা পর্যন্ত কোন দিন পৌঁছাব না; কারণ যদি পৌঁছালাম তাহলে আদর্শ আর আদর্শ থাকল না, বাস্তব হয়ে গেল। আমিও এই কথাকে প্রতিষ্ঠা করে রেখেছিলাম, তাই আমি হতাশও হতাম না, দুঃখও পেতাম না। যা কিছু শ্রেষ্ঠ তাকে আমার সেই তেঁতুলগাছের শিকড় ধোয়া জলের মতন ধরাছোঁয়ার বাইরে মনে করতাম।

হঠাৎ আমার এই মনগড়া আদর্শবাদকে উলট পালট করে দিয়ে দুঃখবাদ আমার জীবন জুড়ে বসল। আমার জ্যাঠামশাই হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেলেন। একদিন বর্ষা সন্ধ্যায়, কোলের উপর একখানা আধছেঁড়া সেক্সপীয়ারের বই নিয়ে হঠাৎ মারা গেলেন। আমিই লাইব্রেরীতে প্রথম গিয়ে তাঁকে খুঁজে পেলাম। কারো মলিন হাতের ছোঁয়া লাগবার আগে আধ-ছেঁড়া তাঁর সেই আদরের বইটাকে তাকে তুলে রাখলাম। জ্যাঠাইমা এলেন, কাঁদলেন, শাঁখা ভাঙলেন, চুল ছিঁড়লেন, সব কিছু করলেন, সবার সহানুভূতি পেলেন। তাঁর দুটি হ্যাংলা মতন ভাইপোকে আনালেন মনের ব্যথা হাল্কা করবার জন্য। জ্যাঠামশাইয়ের উইল বার করলেন, তাতে জ্যাঠামশাই তাঁকেই একমাত্র উত্তরাধিকারিণী করে গেছেন। বহু দিনের পুরোন, হলদে হয়ে যাওয়া একখানা উইল, তাতে আমার নাম গন্ধও নেই।

আমার সুখদুঃখ বোধ করবার, অভিমান করবার, এমন কি সবার অগোচরে স্বপ্ন দেখবার ক্ষমতাও যেন চলে গেছিল। হঠাৎ একদিন চেতনা হল এ বাড়ির ক্ষুদ্রতম কোণেও আমার দাঁড়াবার স্থান নেই। সব জ্যাঠাইমার আর তাঁর হ্যাংলামতন ভাইপো দুটির এলাকা। আমি দূর দেশে একটা ইস্কুলে সামান্য চাকরী নিয়ে চলে গেলাম। যাবার সময়ে জ্যাঠাইমা খুব আশীর্ব্বাদ করলেন! সেই রাত্রে, জ্যাঠামশাই মারা যাবার পর প্রথম আমি আবার সেই স্বপ্ন দেখলাম, তখন মনে হল এ জগতে আর কেউ কোনদিনও আমাকে বিচলিত করতে পারবে না। কিন্তু সকালে উঠে দেখলাম জ্যাঠামশাইয়ের উপর একটু অভিমান থেকে গেছে, আমাকে ভুলে যাবার জন্য।

তারপর একে একে পনেরো বছর কেটে গেল। আমি বিবাহ করলাম না; কাজের মধ্যে এমন ভাবে জড়িয়ে গেলাম যে পড়াশুনা করবারও তেমন অবসর পেলাম না। জ্যাঠাইমার কোন খোঁজ নিলাম না, তিনিও একদিনের জন্যও আমার কথা মনে করলেন না। প্রথমটা উৎসাহ করে কাজ আরম্ভ করলাম, তারপর যখন দেখলাম বছরের পর বছর ধরে সেই একই কাজ চাকার মতন ঘুরছে, দারুণ একটা ঔদাসীন্য এলো। মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মতন সৌন্দর্য আমার ছিল না; যদি অন্য কোন গুণ থেকে থাকে তাহলে চিনতে পারবার মতন এত কাছে কেউ আমার আসেনি। আমার যৌবন আস্তে আস্তে গড়িয়ে চলল। মনে হত জীবন বুঝি আমার ব্যর্থ হ'য়ে গেল।

কিছু পেলাম না, কিছু দেখলাম না, আমার পৈতৃক সম্পত্তিটুকুও জ্যাঠাইমার হ্যাংলা ভাইপোরা নিয়ে নিচ্ছে। মনে হত ওদের সংগে মামলা করি, আমার বাপের ভাগটুকু আদায় করি। আবার মনে হত, বাপ? আমার বাবা কই? জ্যাঠামশাই ছাড়া আমাব আবার অন্য বাবা কই? জ্যাঠামশাই যিনি আমার নাম করতে ভুলে গেলেন, তিনি নয় তো কে আমার বাবা?—আর মামলার কথা মনে আনতাম না। যেদিন রাগ নিয়ে অভিমান নিয়ে শুতে যেতাম সেদিন আর কোন স্বপ্ন দেখতাম না; আর যেদিন জ্যাঠামশাইয়ের কথা ভেবে ঘুমোতাম সেদিনই দেখতাম সবুজ শ্যাওলাজমা পুকুরের জলের ধার ঘেঁষে একটা মস্ত তেঁতুল গাছ, তার শিকড়গুলো মাটি থেকে উঁচু উঁচু হয়ে রয়েছে। কতকগুলি তার জলে ভিজে সবুজ হয়ে গেছে, আর উপর থেকে ফিকে সবুজ পাতার ছড়া নেমে এসেছে; সোনালী রোদ পুকুরের জলে ঝিকমিক করছে, আর শীতল মধুর হাওয়া দিচ্ছে আমার সর্বাঙ্গে, আমার সর্বান্তঃকরণে।

এমনি করে এক এক করে পনেরো বছর কেটে গেল, আমার জীবনের চৌত্রিশটা বছর কেটে গেল। এমনি করে কেটে গেলো বলা ঠিক হল না, শেষের পাঁচটা বছর আমি আবার পড়াশুনা আবস্ত করলাম। হঠাৎ একদিন ঘুম থেকে উঠে ছোট একটা কবিতা লিখে ফেললাম। তাবপব আরও অনেক কবিতা লিখলাম, লোকের কাছে কবি বলে পরিচিত হলাম। আব রাতের পর রাত আমার সেই মধুর স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। যে স্বপ্নে আমার কোন স্থান নেই, আমি দর্শক মাত্র। কবির যেমন মাটির পৃথিবীতে স্থান নেই, সে যেমন দর্শক মাত্র।

জ্যাঠামশাইয়ের সেই শীতের দেশের মস্ত লাইব্রেরির হাওয়া একটু একটু আমার ছোট ঘরেও বইত। আমি মনের মধ্যে আশ্চর্য্য শান্তি ফিরে পেলাম। তখন আমার পনেরো বছর না দেখা জ্যাঠাইমার কথা মনে করলাম, আসামের সেই সহরের সীমানায় সেই লম্বা গড়নের বাংলোটা মনে করলাম। তাব বাগানের প্রত্যেকটা ফুলের ঝোপ, লতা জড়ানো গাছ মনে করলাম। আমার সেই ছোট ঘরখানা মনে করলাম, রাত্রে শুয়ে সেই বাড়ির পিছনে নদীর ধারের সরকারী ঘন বনের মধ্যে বাতাস বওয়ার শব্দ মনে করলাম-শোঁ-ও-শোঁ-ও করে একটানা সুরে সরল গাছেব লম্বা ছুঁচের মতন পাতার মধ্যে দিয়ে বাতাসের শব্দ মনে করলাম। মনে হল রাত্রে সেই জঙ্গলে হুতুমপ্যাঁচা, আর শেয়াল ডাকত। সেখানে এমনি কাক ছিল না, বড় বড় কুচকুচে কালো দাঁড়কাকরা সরল গাছের উবড়োখেবড়ো ডালে বসে আ—আ—আ— করে ডাকত। গত কালকার সারাদিনে কথা যত না স্পষ্ট করে মনে করতে পারি তার থেকেও অনেক বেশী স্পষ্ট করে আমার

সেই কবেকার ছোট বেলাকার কথা সমস্ত খুটিনাটি সুদ্ধ মনে পড়ল।

রান্নাঘরের সামনে নাসপাতি গাছতলায় চাটাইয়ের উপর সকাল বেলা জ্যাঠাইমা আর আমি দুজনে মিলে বড়ি দিতাম, সেই ডালবাটার সোঁদাসোঁদা গন্ধটা পর্যন্ত যেন নাকে এল। শীতের দিনে মালী শুকনো পাতা জড় করে গাদা করে রাখত আর সন্ধ্যেবেলা তাতে আগুন ধরিয়ে দিত। আমি তার খুব কাছ ঘেঁষে দাঁড়াতাম, মুখের দিকটা আগুনে তেতে লাল হয়ে যেত, কিন্তু পিঠের দিকটা ঠাণ্ডা বরফ হযে থাকত, তারপর আগুন উপরে নিবে যেত, তবু ছাইয়ের ভিতবে অনেকক্ষণ জ্বলত; আর আমিও ঘরে যেতাম, কাপড়চোপড়ে একটা পোড়া পাতার গন্ধ লেগে থাকত। কতদিনকার ভুলে যাওয়া সেই কনকনে ঠাণ্ডা জলে হাত ধোযা, কনকনে ঠাণ্ডা বিছানায় শোয়া, সমস্ত মনে পড়ে গেল। জ্যাঠামশাইয়েব গলাব আওয়াজটা মনে পড়ল, জ্যাঠাইমাকে মনে পড়ল। ভাবলাম কাল জ্যাঠাইমাকে চিঠি লিখব।

কিন্তু আমি জ্যাঠাইমাকে চিঠি লিখবার আগেই, জ্যাঠাইমাই আমাকে চিঠি লিখে ফেললেন। লিখলেন—"তোমাকে অনেক বছর দেখিনি, উনি তোমাকে নিজের সন্তানের মতন ভালোবাসতেন সে কথা জন্মে কখনও ভুলব না। আমার শরীর মন ভেঙ্গে পড়েছে, বোধ হয় আমাবও সময় এসে পড়েছে। তার আগে তোমাকে একবার দেখতে চাই। আমি জানি আমার কাছ থেকে তুমি কিছু আশা কর না, যতদূর জানি তোমার কিছুব অভাবও নেই, তাই আমার সমস্ত সম্পত্তি আমার ভাইপোদের দিয়ে দিচ্ছি; তাতে তুমি কিছুমাত্র দুঃখিত হবে না এই আমার বিশ্বাস। তবু মারা যাবার আগে তোমাকে একবার দেখতে চাই। তারপর যদি কোনখানে তোমার জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে দেখা হয় তোমার কথা যেন বলতে পারি।"

আমার জন্য নয়, জ্যাঠামশাইয়ের জন্য আমাকে দেখতে চান। প্রথমটা একটু রাগ হল, তারপর হাসি পেল, দিব্যি আমার বাপের সম্পত্তিটি গাপ করে বলছেন যে তিনি নিশ্চয় জানেন আমি কিছু আশা করি না। তারপর নিষ্ঠাবতী জ্যাঠাইমার পতিভক্তি দেখে—যে পতির মনের বাইরের দরজা অবধিও পৌঁছবার তাঁর ক্ষমতা ছিল না—তাঁর সেই অটল পতিভক্তি দেখে আমার বৃদ্ধা মূর্খা মূঢ়া জ্যাঠাইমার জন্য আমার সমস্ত মনটা করুণায় ভরে গেলো। আমি তখনই যাবার আয়োজন করতে লাগলাম।

পনেরো বছর আগেকার কথা, অসহ্য রকমের দীর্ঘ পনেরো বছর আগের কথা, আমার কানকে ঝালাপালা করে দিতে লাগল। ভেবেছিলাম আমি বুঝি উদাসীন হয়ে গেছি, নির্বিকার অনাসক্ত হয়ে গেছি, কিন্তু পুরোন জায়গার পুরোন দৃশ্যগুলো চোখে পড়তেই তখনকার সমস্ত দুঃখ-দুরাশাগুলো আমাকে ঝেঁকে ধরল। আমি সেই অতি পরিচিত কাঠের সিঁড়ির চারটে ধাপ উঠে

জ্যাঠাইমাকে প্রণাম করলাম, জ্যাঠাইমা বসতে বললেন। দেখলাম তিনি অতি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, শুকিয়ে ছোটটি হয় গেছেন, তখুনি, তিনি কিছু বলবার আগে তাঁর সমস্ত অবজ্ঞা অনাদর ক্ষমা করে দিলাম। দেখলাম ছোটবেলা থেকে সব বিষয়ে যে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল সে একটা ছায়ামাত্র। যৌবনে কত অসম্ভব ঘটনা কল্পনা করতাম, জ্যাঠাইমা ও তাঁর হ্যাংলা ভাইপোদের অপদস্থ হওয়ার কত অসম্ভব কল্পনা। আজ তাঁদের প্রতি করুণাপরবশ হয়ে গেলাম। যাদের করুণা করা যায় তাদের সঙ্গে শত্রুতা করা চলেনা, তারা আশ্রিতের মতন হয়ে যায়। সেইখানে তখুনি আমার সব অভিমানের অবসান হল; আমার দুর্লভ যৌবন ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য আমার সব অভিযোগের অবসান হল। জ্যাঠাইমা বুড়ী হয়ে গেছেন বলে আমি তাঁকে ক্ষমা করলাম।

সন্ধ্যাবেলা লাইব্রেরিতে গিয়ে দেখলাম চিমনিতে একটুখানি কাঠের আগুন জ্বলছে, তার পাশে জ্যাঠামশাইয়ের হাতল দেয়া চেয়ারটা তেমনি রয়েছে। সেক্সপীয়র কোলে জ্যাঠামশাইয়েব শেষ দেখার কথা মনে হল। তাক থেকে আধছেঁড়া বইখানা ধীরে ধীরে নামালাম। অমনি তাব ভেতর থেকে দুখানা পুরু কাগজ পড়ে গেল; তুলে দেখলাম মাবা যাবার কয়েকদিন আগের তারিখ দেয়া দুকপি উইল। জ্যাঠামশাইয়েব শেষ উইল। তাতে আমাকে দিয়ে গেছেন তিনভাগ আর জ্যাঠাইমাকে একভাগ সম্পত্তি।

আমার মাথা ঘুরতে লাগল, আমাব অতৃপ্ত যৌবন অতীত থেকে ফিরে এসে আমার শিরা ধরে, স্নায়ু ধরে টানাটানি করতে লাগলো। এর থেকে বড় ব্যর্থতা কী হতে পারত? যতদিন পাইনি ততদিন শুধু অভিমান ছিল, এ যে পেয়েও পাইনি, তাই এমন অন্ধ আদিম হতাশয় আমার সমস্ত হৃদয় মন তোলপাড় হতে লাগল যে তার কাছে খুন করা, আত্মহত্যা করাও ছেলেখেলা বোধ হতে লাগলো।

এমন সময় লাইব্রেরির চারখানা বই-ভরা দেয়াল সরিয়ে দিয়ে, চিম্‌নির আগুনের শব্দ ছাপিয়ে দিয়ে, দেখলাম শ্যামলঘন পুকুরের জলের ধারে উঁচু শিকড়-বের-করা তেঁতুলগাছ, তার কতকগুলো শিকড় ভিজে ভিজে সবুজ রং ধরেছে; উপর থেকে সবুজ পাতার ছড়া নেমে এসেছে, সবুজ জলে সোনালী রোদ চিকমিক করছে, আর মৃদু মধুর বাতাসের একটুখানি শব্দ শুনলাম। যে জল কোথাও নেই, যে সবুজ ভগবানও কল্পনা করেন নি, যে গাছ আজও জন্মায় নি, কখনও জন্মাবে না, আজ আমি তার শীতল ছায়ায় প্রবেশ করলাম, তাতে আকণ্ঠ অবগাহন করলাম, আমার মুখে, আমার চুলে সেই হাওয়ার ছোঁয়া লাগল। আমি ত্রস্ত হাতে উইল দুখানা আগুনে ফেলে দিলাম। বুকের মধ্যে হঠাৎ জ্যাঠামশাইয়ের কবিদের সেই অনাসক্তি খুঁজে পেলাম যার জন্য সত্য আর স্বপ্ন জায়গা বদল করে।

কন্যা

সিলাকের বাবা সারা দিন কাঠের বেঞ্চিটার উপর বারান্দায় বসে থাকে, গোল আংঠায় করে ইলবন কাঠকয়লা ধরিয়ে দিয়ে যায়; কিন্তু আজ-কাল আর কিছুতেই হাড়ের মধ্যে থেকে শীত যেতে চায় না। যে আসে, তার কাছেই সিলাকের বাবা দুঃখ করে বলে, কলকাতায় গিয়ে লেখাপড়া শিখেই নাতনীটির কাল হল। তখন রেসে একসঙ্গে অতগুলো টাকা জিতে মাথাটা গরম হয়ে গিয়েছিল, কারো কথায় কান দিই নি, এখন মেয়ে হয়ে উঠেছে এক মহাভাবনা।

সিলাকের বাবার সঙ্গে প্রতিবেশীদের সহানুভূতি থাকলেও মনে মনে তারা খুসি না হয়ে পারে না। যেমনি দেমাক ছিল সিলাকের মার তার উপযুক্ত পরিণামই হয়েছে। ওদের দুঃখ শুধু এই যে, সে এসব দেখে যেতে পারল না। সিলাকের বাবা সবই বোঝে। টাকা পয়সার কোনো অভাব নেই ওদের, কোথায় ঘরে একটা স্বামী নিয়ে আসবে মেয়েটা, সুখে ছেলেপুলে মানুষ করবে, তা নয়, ধারে কাছে কাউকে ঘেঁষতে দেবে না। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সিলাকের বাবা উঠে দাঁড়ায়।

মৌলাইয়ের এই দিকটাতে রাজ্যের যত শীত এসে জমা হয়। সব সময় কাঁধে থলি ঝোলানো থাকে, পান খাবার জন্য কাকেও বিরক্ত করতে হয় না। কিন্তু একটু চূণ আর কাঁচা সুপুরি দিয়ে গোটা একটা পান মুখে দিয়েও সিলাকের বাবার মনে সান্ত্বনা আসে না। সিলাকের মার জন্য হঠাৎ মন কেমন করে ওঠে। ভারী কড়া শাসনে রেখেছিল পঁচিশ বছর; বছরের মধ্যে ঐ একবার নংক্রেমের নাচের সময় ছাড়া একটি দিনের জন্যেও চোখের আড়াল করত না। গায়ে শক্তিও ছিল কি কম, পিটিয়ে ছাতু করে দিতে পারত সিলাকের বাপকে। গর্বে বুড়োর বুকটা এতখানি হয়ে উঠত। দেখতেও ছিল খাসা, মাথায় স্বামীর সমান সমান, এক তাল রেশমের মত নরম, লালচে রং-এর চুল, ছেড়ে দিলে সোজা একটা জলপ্রপাতের মতো হাঁটুর নীচে গিয়ে পড়ত। কিন্তু বাড়ির লোক ছাড়া ক'জনারই বা তা দেখবার সুযোগ হয়েছিল?

ভারী সম্মানজ্ঞান ছিল সিলাকের মা'র, দেশের যেমন দস্তুর তার থেকে এতটুকুও স্খলন হবার যো ছিল না। দেশী পোশাক ছাড়বার কথা মনেও আসে নি কখনো। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সিলাকের বাবা স্ত্রীর কথা ভাবে। সুন্দর দেখাত ঐ সেকেলে সাজে তাকে। কবজি অবধি লম্বা হাতার উঁচু গলার একটা জামা, দুই বগলের তলা দিয়ে নিয়ে দুই কাঁধের উপর দিয়ে পিঠ বাঁধা

দু' টুকরো মুগার কাপড়, তার ধারে কি সুন্দর করেই না সিলাকের মা ঝালর বেঁধে দিত। আর মাথার উপরে ঘোর রং-এর ঘোমটা বাঁধা। সাদা কখনো পরত না সিলাকের মা। সাদা পরে উদ্‌খারদের মেয়েরা। কিন্তু সিলাকের মা সৌখীন ছিল না কম! দু' কানে কাঁচা সোনার দু'টি গয়না পরত, উপরে নীচে দুই ছ্যাঁদার মধ্যে দিয়ে, কান জুড়ে থাকত সে গয়না। গলায় হাঁসের ডিমের মতো এত বড় বড় সত্যিকারের পলার আর সোনার পুঁতির মালা পরত। সমুদ্রের বুক থেকে তুলে আনতে হয় পলা, এ পাহাড় দেশের কেউ সমুদ্র চোখেও দেখে নি সেকালে। কেবল যারা ঐ ফ্রাং দেশে গেছিল যুদ্ধের সময়, তবে তাদের মধ্যে ক'জনাই বা ফিরেছিল! সিলাকও তো ফেরেনি।

সেই সিলাকের মার স্বামী সে, পঁচিশটা বছরের মধ্যে এক মুহূর্তের জন্যও সিলাকের মা স্বামীকে তার অযোগ্য হতে দেয় নি। এরকম পা গুটিয়ে গুটিয়ে জবুথবু হয়ে বসতে দিত সে কখনো? সিলাকের বাবা পা দুখানি নামিয়ে, হলদে রং-এর বুট জোড়ার ভিতব গলিয়ে নিয়ে, পিঠ সোজা করে বসল।

সরল গাছের লম্বা পাতার মধ্যে দিয়ে শোঁ-শোঁ করে বাতাস বইছে, কাঁচা ধূনোর মতো একটা গন্ধ নাকে আসছে, দিন তার ডানা গুটিয়ে বাসায় ফিরবার উদ্যোগ করছে। একটু একটু খিদে পেতে থাকে। খিদে পেলেই আজ-কাল সিলাকের বুড়ো বাবার নিজের মার জন্য মন কেমন করে। বাবা মদ খেয়ে পথে-ঘাটে পড়ে থাকত, সারা দিন মা রাস্তা তৈরীর পাথর ভাঙ্গার কাজ করত, ছ'আনা দিন পেত। তখন মৌলাই-এর নীচে ঐ ধানক্ষেতির উপরকার পথ তৈরী হচ্ছিল। ওখানে এরকম কেরাণী বাবুদের বাড়ি গিজগিজ করত না তখন, সত্যিকারের ধানক্ষেত ছিল। আর তার এক ধারে কুতুক বুড়োর কুঁড়ে ঘর ছিল। বাবা! কি ভয় করত তাকে! বাড়ির চার দিকে আলু কুমড়োর বাগান ছিল তার, সারা দিন সেখানে খাটত। বাড়ির পিছনে ঝির-ঝির করে পাথরের উপর দিয়ে পাহাড়ী নদী বয়ে যেত। দুপুর বেলায় কুলী মেয়েরা এক ঘণ্টার জন্য কাজ বন্ধ করে ভাত খেত।

কি মিষ্টি ছিল সেই ভাত। মার পিঠে ছোটভাই খুল্লুং বাঁধা থাকত। সারা দিন পিঠ থেকে নামতে চাইত না, মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়লে মা ওকে নামিয়ে গাছতলায় শুইয়ে দিত, পাশেই রেখে দিত ময়লা কাপড়ের টুকরো দিয়ে বাঁধা এই বড় বাটি ভরা ভাত। আর খুল্লুংএর জন্য বীচে কলা। কাঁদলেই কলা চটকে খাওয়াতে হত খুল্লুংকে; কি মোটাই ছিল সে, তাকে আগলাতেই সিলাকের বাবার প্রাণ বেরিয়ে যেত। তারপর খাবার সময় হয়ে যেত। বড় এক বাটি ঠাসা মোটা চালের ভাত আর তার এক পাশে একটুখানি রগরগে লাল শুঁটকি মাছের চচ্চড়ি। মধুর সঙ্গে তার কোনো তফাৎ ছিল না। তারপর মা হাত ধরে নদীতে নিয়ে গিয়ে ওর মুখ ধয়ে দিত, আঁজলা ভরে জল খাওয়াত।

কাঁধে ঝোলা থলি থেকে চূণের কৌটো, পান, সুপারি বের করত। পানের বোঁটাটি ছিঁড়ে ওর হাতে দিত। হঠাৎ সেই ঝাল ঝাল পানের বোঁটার স্বাদটি মুখে ফিরে এসে সিলাকের বাবাকে ব্যগ্র-ব্যাকুল করে তুলল।

ঐ যে আবার পাকদণ্ডি বেয়ে মেয়েটা উঠে আসছে। পাড়ার মধ্যে দিয়ে দিব্যি বাঁধানো সিঁড়ি আছে, এর রান্নাঘরের পাশ দিয়ে, ওর গুদোমের দরজা ঘেঁষে। উঠতে উঠতে সবাকার কুশল জেনে নেয়া যায়, সে পথ দিয়ে ও মেয়ে কখনো ওঠে না। মা দিদিমার পায়ে হাঁটা সিঁড়ি ওর মনে ধরে না। কুসমি এসে ডাকল —"দাদা।" গাল দুটি একটু রাঙ্গা হয়ে উঠেছে, একটুখানি হাঁপ ধরেছে, এই শীতেও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। সবুজ সাড়ি পরেছে কুসমি, দু'হাতে দুটি মোটা কাঁচা সোনার বালা ঝিক-ঝিক করছে। "কি দেখছ, দাদা?" সিলাকের বাবা বললে, "হঠাৎ মনে পড়ে গেল ঐ যেখানে ঝাউগাছগুলো লম্বা হয়ে চাঁদকে আড়াল করে দেয়, ওখানে বাঘ ধরবার খোঁয়াড় ছিল। রাত করে কেন ফিরিস, কুসমি, তোর কি প্রাণে ভয়-ডর নেই?"

কুসমি চোখের কোণা দিয়ে একটু হেসে, মাথা থেকে দুটি বড় বড় রূপোর কাঁটা খুলে নিল। অমনি জলপ্রপাতের মতো সোজা, রেশমের মতো নরম, এক ঢাল লালচে চুল হাঁটু পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। সিলাকের বাবার গলার কাছটি ব্যথা করতে লাগল। সে বললে, "এত দেরী করিস কেন কুসমি, কোথায় গেছলি? আমার খিদে পায় জানিস না?"

কুসমি কাছে এসে তাকে আদর করে বললে, "কেন? তোমার কি ভয় হচ্ছিল? বল না সন্ধ্যে হলেই তুমি অন্য রকম হয়ে যাও কেন? বাঘরা তো আর নেই।"

কেমন হঠাৎ সন্ধ্যা নামে এদেশে। দূরের ন্যাড়া পাহাড়গুলোর পিছনে যেমনি সূর্য ডুবে যায়, কোথা থেকে রাশি রাশি অন্ধকার নেমে চারি দিকে জমাট বেঁধে থাকে। গাছে গাছে জোনাকিরা বসে; ঝিঁঝির ডাকে কানে তালা লাগে; দূরে যেমনি শেয়াল ডেকে ওঠে, পাড়ার কুকুররাও অমনি সাড়া দেয়; বুনো নাসপাতি গাছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাদুড়রা ফল খেতে এসে কামড়া-কামড়ি করে, তার পর দুটো কালো ছাতার মতো মস্ত ডানা মেলে অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে যায়। অন্ধকারে মনে হয়, দূরের জঙ্গল বুঝি বড় কাছে চলে এসেছে। উপরের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, তারায় ভরা ঘোর বেগুনী রং-এর আকাশটা বুঝি বড় নীচে নেমে এসেছে। দম আটকে আসে সিলাকের বাবার, মুখে কথা জোগায় না, খালি বলে, "রাত জাগা ভালো নয় রে, কুসমি। আগে আমরা সন্ধ্যে লাগতেই খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়তাম। বাইরে বড় ভয় ছিল।"

কুসমি তার কোমল দু'টি বাহু দিয়ে সিলাকের বাবার গলা জড়িয়ে ধরে, চুলগুলিতে মুখখানিকে আড়াল করে রাখে; তার মাঝখান দিয়ে ঘরের মধ্যেকার

কেরোসিন ল্যাম্পের আলো দেখা যায়; লাল চুলকে আরো লালচে মনে হয়; কুসমির লাল চুল থেকে কি একটা সুবাস উঠতে থাকে। সিলাকের বাবার মাথায় জড়ানো পাগড়ি খুলে যায়, মাথায় শীত লাগে; কুসমি হেসে ন্যাড়া মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়; কানে কানে বলে, "অন্ধকারকে ভয় লাগে তো বনবাদাড়ের ধারে বাড়ি করেছিলে কেন, দাদা ?"

সিলাকের বাবা তো বাড়ি করে নি। তখনকার দিনে অন্য রকম ছিল। পুরুষ মানুষরা সাধারণ কাজ করলে মান যেত সেকালে। পলটনে গেল, নিদেন পুলিশেও গেল, সে আলাদা কথা। সিলাকের বাবা কখনো কাজ করে নি। তবু ভারী খাতির ছিল তার। তীরখেলায় পাঁচটা পাহাড়ে তার জুড়ি মেলা দায় ছিল; নংক্রেমের নাচে পাগড়ির উপর ঝালর বেঁধে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরত যখন, যাদুকর চোখে মেয়েরা চেয়ে থাকত, ঈর্ষায় জ্বলে-পুড়ে পুরুষরা চেয়ে থাকত। তবে বাড়িঘর সবই করেছিল সিলাকের মায়ের মা। এখন কোনকালে তারা সব মরে ঝরে গেছে, বাকি আছে শুধু সিলাকের বাবা। তার একটি দাঁতও পড়ে নি।

"ঘরে চল, কুসমি, আমার খিদে পেয়েছে।"

মুর্গীর ঝোল রেঁধেছে ইলবন, ভাতের মধ্যে দুটো ডিম ছেড়ে দিয়েছে। সিলাকের বাবা সে সব লক্ষ্যই করে না, বলে, "কেন ডমরুকে বিয়ে করবি না, কুসমি ? রাজাদের বংশধর সে, তা জানিস ? আগে ইদিককার সবাই ওদের প্রজা ছিল, ফসলের ভাগ দিতে হত, মুর্গী দিতে হত; তোর সাত পুরুষের ভাগ্যি তোকে ও বিয়ে করতে চায়; কেন করবি না বল ?"

কুসমি সিলাকের বাবার মুখ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, "কিসের তাড়া, দাদা ?" "দেরীই বা কিসের, কুসমি ? লেখাপড়া শেখা হল, ঘরে ফিরলি, বিয়েই বা করবি না কেন? ওরা বলেছিল তুই আর ফিরবিই না। বলেছিল কলকাতার ভাত খেয়েছিস, এখানে আর তোর মন টিকবে না। ডমরুকে বিয়ে করে আমার কাছে থাক রে কুসমি, আজকাল আমি পায়ে জোর পাই না।"

কুসমির মুখে কেরোসিন বাতির আলো পড়ে। পাতলা ভুরুর নীচে পাটকিলে চোখের মণি চকচক করে, গালের হাড় দু'টি একটু উঁচু, ছোট নাকটি বড় পাতলা, ঠোঁট দু'টি গোলাপ ফুলের পাপড়ির মতো, পিঠময় ছেয়ে আছে এক ঢাল লালচে চুল।

কুসমি বলল, "পায়ে জোর পাও না, তবু একটু দুধ খাও না কেন, দাদা ?"

তখন দুধ খেত না কেউ। ছোট ছেলেরা মা'র দুধ ছেড়েই কলা খাওয়া ধরত। কি মিষ্টি ছিল সেই কলা। মা বীচি বের করে দিত, আর সিলাকের বাবা আর খুলুং মার হাত থেকে কলা চেটে খেত। আজ-কাল আর কোনো

জিনিষ সেরকম মিষ্টি লাগে না। সিলাকের বাবা থালা সরিয়ে উঠে পড়ে।

বন্ধ জানালার কাঁচের মধ্যে দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখে শির-শির ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, পথের দু'ধারে লম্বা লম্বা ঘাসগুলো নুয়ে যাচ্ছে, তারার আলো ফুট ফুট করছে, কি সুন্দর, কি সাদা, কি ঠাণ্ডা, কি একলা। সিলাকের বাবার গা শিউরে ওঠে। কুসমি বলে, "এখনি শুতে যেও না, দাদা, খেয়েই শুয়ে পড়তে হয় না। এইখানে আংঠা দিচ্ছে, তার পাশে পা মেলে বস দিকিনি। দাদা, আমার বাবা সিলাক কি রকম লোক ছিল?"

সিলাককে কিছুতেই মনে করতে পারে না সিলাকের বাবা। মাঝে মাঝে প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসা করেছে, তারা ভারী অবাক হয়েগেছে, কিন্তু তাদেরও কারো মনে নেই। সিলাকের বাবা বললে, "ফ্রাং এর যুদ্ধে সে মরে গেছে।" কুসমি অধীর ভাবে বলে, "সে তো জানি। খুব দুরন্ত ছিল, তোমাদের হাড় জ্বালিয়ে ছিল, লুকিয়ে ভিনদেশী মেয়ে বিয়ে করেছিল, আমি হয়েছিলাম, দিদিমা গিয়ে ঝগড়া করে এসেছিল, বাবা রাগ করে পলটনে নাম লিখিয়ে ফ্রান্সে চলে গিয়েছিল আর ফেরে নি।" একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে কুসমি বলে "কি রকম লোক ছিল সে, বল না, আমার মা কি রকম ছিল, ?"

সিলাকের বাবা ব্যাকুল হয়ে ওঠে, "কি জানি কি রকম ছিল। তবে ভারী দুষ্টু ছিল, আমার বড় ধনুকটা এমনি এমনি ভেঙ্গে দিয়েছিল। কি রকম ছিল আমি কি করে বলব। বোধ হয় দেখতে ভালো ছিল। পাড়ার মেয়েদের ভারী ঘেন্না করত, বলত ওদের বেঁটে গড়ন, চ্যাপ্টা নাক, মোটা মোটা পায়ের কব্জি, পাহাড়ের মেয়েরা কক্ষণো ভালো হয় না। নংপো থেকে বেজাতের মেয়ে নিয়ে এল। হ্যাঁ, এবার মনে পড়ছে। এই রকম সন্ধেবেলায় এল, ওর মা ওদের ঘরে ঢুকতে দিল না। খুব শীত ছিল তখন, আমার ভারী দুঃখ হচ্ছিল। মেয়েটা বাইরে দাঁড়িয়ে রইল, আর ও-ও চৌকাঠের ওপারে থাকল। ওরও শীত করছিল, বারে বারে কোটের গলাটা ধরে টানছিল। দিলে ওর মা ওকে তাড়িয়ে। সিলাকের বাবা অনির্দ্দিষ্ট ভাবে এদিক-সেদিক তাকায়। কুসমির মুখের উপর চোখ পড়তেই বললে, "কাঁদছিস, কুসমি? বলছি না ভারী দুষ্টু ছিল, অবাধ্য ছিল, কুড়ি বছর বয়স হয়েছিল, কিন্তু যেমনি তার তেজ তেমনি দেমাক। আমাকে পরে ওর মা বুঝিয়ে বলেছিল, অমন ছেলে দূর করে দিতে হয়। ওকে আর দেখিনি, জানিস। মুখটাও মনে করতে পারি না আর।"

ধরা গলায় কুসমি বললে, "এত দিন এ-সব বলনি কেন, দাদা ?"

সিলাকের বাবা বললে, "কি জানি, বোধ হয় ভুলে গেছিলাম"

"বল, তারপর কি হল ?"

"লুমপারিংএ একটা দোকানের পাশে ঘর নিয়ে দু'মাস ছিল। তার পর

গেল ফ্রাংএ, আর এল না।

"তারপর ?"

"কি জানি, এত দিনের কথা মনেই পড়ে না ভালো করে। তুই জন্মালি, মেয়ে হয়েছে শুনে ওর মা গেল দেখতে। তোর মা শুয়ে শুয়েই খুব ঝগড়া করেছিল। তারপর বিকেলের দিকে সে-ও গেল মরে।"

বাইরে হু-হু করে হাওয়া দেয়, শীতের চোটে শেয়ালরা ডাকে। ধরা গলায় কুসমি বলে, "তারপর ?"

"রাতে তখন কেউ বেরুতো না ভয়ে।"—"জানি, সাপের যারা পূজো করে, তাদের ভয়ে। বল, তারপর ?"—"সিলাকের মা খবর পেয়েই চলে গেল। "আর তুমি ?"—"আমিও সঙ্গে গেলাম। তোর মরা মার বুক থেকে তোকে তুলে আনল সে। এতটা পথ অন্ধকারে হেঁটে এলাম, কেউ কিছু বলল না। —তারপর—তারপর— কি জানি ভুলে গেছি। কুসমি, তুই কাঁদলে আমার বুক ফেটে যায়।" সিলাকের বাবার হাত কাঁপে, তবু হাত বাড়িয়ে কুসমিকে কাছে টানতে চেষ্টা করে।

"না, দাদু, না, আর কাঁদব না। তোমার তখন দুঃখ হয় নি, তুমি কাঁদ নি, দাদা? তোমার কুড়ি বছরের ছেলেকে আর দেখলে না, দুঃখ হল না ?"

সিলাকের বাবা আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে, "কি জানি মনে নেই।" চোখ দিয়ে বড় বড় ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে, "তখনকার কথা মনে নেই বে কুসমি।"

বাইরে হু-হু করে হাওয়া দেয়। কুসমি বলে, "দাদা, আমিও বেজাতের ছেলেকে ভালোবাসি।" সিলাকের বাবার মুখের দিকে চেয়ে থাকে কুসমি। "তুমি মত দিলে সে এসে তোমার সঙ্গে দেখা করে। কিন্তু—কিন্তু—" সিলাকের বাবা বললে, "কোথায় থাকে সে ? কি নাম? কি করে ?" কুসমি বললে, "লাইমোখরার ফিরিঙ্গী স্কুলে পড়ায়, তার নাম অলক। কলকাতায় আমরা একসঙ্গে কলেজে পড়তাম। সে বাঙ্গালী, দাদা। তোমার দুঃখ হলে তাকে চলে যেতে বলব, দাদা, তুমি কিছু ভেবো না।"

"চলে যেতে বলবি ?"— "ভেবেছিলাম আজ তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব,— কিন্তু তোমার চোখ দিয়ে কেন জল পড়ছে, দাদা ?"

সিলাকের বাবা কোটের পকেট থেকে একটা আধময়লা রুমাল বের করে চোখ মুছল, নাক ঝাড়ল।

সিলাকের মা ভারী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল।

কুসমি উঠে দাঁড়ায়। "দাদা, তুমি ভেবো না, ওকে চলে যেতে বলব।"

রুমালটাকে আবার ভাঁজ করে পকেটে পুরে, ডান হাতের পিছন দিক দিয়ে চোখ দুটো ভালো করে মুছে নিয়ে, নাক টেনে, সিলাকের বাবা বললে, "না, তাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বল।"

প্রেম-পারিজাত

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যখন আমার নীলমণিদিদিমা, বরানগরের ওদিকে তাঁদের পৈত্রিক বাগানবাড়ির চারিদিকে দেড় মানুষ উঁচু পাঁচিল তুলে দিয়ে, একটা ঈষৎ বিলিতী ধাঁচের মহিলা শিক্ষা সদন খুলে বসলেন, তখনই জনসাধারণের সন্দেহ হয়েছিল যে হয়ত বা এই শুভ প্রচেষ্টার পিছনে নির্জলা বিদ্যাসাগরীয় শিক্ষা-প্রীতি ছাড়াও একটা নিগূঢ়তর কারণ নিহিত ছিল। ঐ কারণ নিয়ে নানান জল্পনা কল্পনাও আত্মীয়-বন্ধু মহলে চলেছিল। আসল কথা হল যে প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে এমন একটা উগ্র পরমহংসী ভাব দৃষ্ট হল যে সকলের কৌতূহলী দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়ে যায় না।

সেই সময়কার মুষ্টিমেয় প্রগতিশীলাদের মধ্যে টুঁড়ে টুঁড়ে নীলমণিদিদিমা যে কয়েকটি উজ্জ্বল রত্ন আবিষ্কার করলেন তাঁদের সকলকার রূপের জৌলুস না থাকলেও বিদ্যার যে যথেষ্ট গরিমা ছিল একথা নিঃসন্দেহ। তাঁরা প্রায় সকলেই রূপপ্রসাধনকে সর্বান্তঃকরণে ্ণা করতেন, নিজেদেব সুন্দবী প্রতিপন্ন করবার চেষ্টাকে দুর্নীতির অঙ্গ জ্ঞান করতেন এবং সাধারণতঃ স ̍প্রকার বিলাসকে পরিহার করে চলতেন। তবে তাঁদেব সন্ন্যাসিনী ভাবলে ভুল হবে, কারণ তাঁরা সাধাবণ সামাজিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে শিক্ষা, সুনীতি ও কৃষ্টি বিস্তার করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। এবম্বিধ আচরণ থেকে অতি সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে তাঁরা পুরুষ জাতিকে ঘৃণা মিশ্রিত কৃপার চক্ষে দেখতেন, এবং মানব বংশের অস্তিত্বের জন্য এরূপ দুর্বল সহকারীর প্রয়োজনীয়তাকে পরমেশ্বরের অন্যমনস্কতার নিদর্শন বলেই ধরে নিয়েছিলেন।

নীলমণিদিদিমা শিক্ষাসদনের প্রতিষ্ঠাত্রী ও প্রধানা পৃষ্ঠপোষক এবং বলা বাহুল্য মুখ্য পাণ্ডাও ছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি, এমনি ছিল তাঁর পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের ও আটচল্লিশ ইঞ্চি প্রস্থেব দেহের জ্যোতি, এমন ছিল তাঁর সোজা সোজা ভুরুর নীচে পিঙ্গল নয়নের দৃষ্টি, যে কখনও যদি ভ্রমবশতঃ একটা অন্যায় কথাও বলে ফেলতেন, তা প্রতিবাদ করবার মত কারো সাহস ছিল না।

এই সকল বিবরণী, কতক কতক প্রকাশ্যে পুরাতন চিঠিপত্র ও বাজারের হিসাব থেকে এবং কতক কতক আমার মা-মাসীদের স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে এবং বাকী গোপনে এর ওর ডাইরী ও কিছুটা অনুমান থেকে সংগ্রহ করা, অতএব এতে যেমন সন্দেহ করবারও কিছু থাকতে পারে না ; আবার তেমনি আমার

নিজস্ব দায়িত্বও কিছুমাত্র নেই। বর্তমান যুগের জন্য এই কাহিনীতে অনেক শিক্ষনীয় বিষয় নিহিত থাকতে পারে, কেবল মাত্র এই উদ্দেশ্যে ঘটনাগুলি আদ্যোপান্ত বিবৃত করছি।

বাগানবাড়িটির নাকি নন্দনকাননের সঙ্গে সাদৃশ্য ছিল। ঘন নীল সরোবরে লাল মাছরা কিলবিল করত ও পদ্ম ফুল ফুটত, চারিদিকের ফুল ফলের গাছে কোকিলরা আর মৌমাছিরা কূজন গুঞ্জন করত, নীচে নরম গালচের মত শ্যামল দূর্বাদল ছিল। সংসারের ব্যবস্থাও ছিল নিখুঁৎ, শিক্ষাসদনের সভ্যারাই পালা করে রান্নাবান্না ও বাগানের পরিচর্যা করতেন।

এই রকম প্রতিষ্ঠানে যেমন হয়ে থাকে খাওয়া দাওয়া ছিল উগ্র নিরামিষ ধরণের, সেটা কোনওরূপ কুসংস্কারজনিত নয়,—পেঁয়াজ রসুন শ্লেষ্মার ওষুধ বলে সে সকলই চলত, কিন্তু প্রাণী হত্যা মহাপাপ বলে মাছ, মাংস, ডিম বারণ ছিল। সৌভাগ্যবশতঃ উত্তরকালে যে সকল জগদীশচন্দ্রীয় মতবাদ প্রচলিত হয়েছিল তখন পর্যন্ত সে সকল জনসাধারণের অবিদিত ছিল। নইলে নীলমণিদিদিমাকে মহা ফাঁপরে পড়তে হত।

সিনেমা, থিয়েটারের তখন বালাই ছিল না, সাজপ্রসাধন ত বারণই ছিল। আবার ওদিকে শিক্ষা, ধর্মসঙ্গীত, চারুশিল্প, ব্যায়াম, মাটি কোপানো কিছুই তাঁদের তালিকা থেকে বাদ যায়নি।

কাতারে কাতারে তৎকালের প্রগতিশীল পরিবারের মেয়েরা এসে ছাত্রী হল। দেখতে দেখতে শিক্ষাসদন স্বাবলম্বী হয়ে গেল, আর মাসকাবারে নীলমণিদিদিমাকে স্বীয় ট্যাঁক শূন্য করে দেনা শোধ করতে হত না।

পুরুষজাতির সম্বন্ধে তাঁদের মতামত যাই হোক না কেন, বিবাহক্ষেত্রে দেখা গেল তাঁদের ছাত্রীদের ভারী চাহিদা। বাস্তবিক নীলমণিদিদিমার কঠিন হাতে মানুষ করা মেয়েগুলির স্বভাবচরিত্র ছিল একেবারে নিষ্পাপ। এমন কি ক্লাশে তাদের নাটক নভেল পড়তে বাধ্য করা হত বলে, স্বাভাবিক নিয়মানুসারে অল্প দিনেই ঐ সকলের প্রতি তাদের মনে একটা নিদারুণ বিদ্বেষের সঞ্চার হত। এও নীলমণিদিদিমার দূরদর্শিতার দৃষ্টান্ত।

তবে মেয়েগুলোর এমন টপাটপ বিয়ে হয়ে যাবে এটা অবশ্য আদৌ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, বরং একদল উচ্চ-শিক্ষিতা নানান গুণে বিভূষিতা, পুরুষজাতির প্রতি ঘৃণাপরায়ণা, সবলা, শক্তিশালিনী ব্রহ্মচারিণী তৈরী করাই তাঁর অভিলাষ ছিল। কিন্তু সকল প্রচেষ্টার এরূপ বিপরীত ফল হওয়াতে একদিকে যেমন তাঁর অর্থ ও খ্যাতি বৃদ্ধি পেতে লাগল অপর দিকে মেজাজখানিও দিনে দিনে আরও রুক্ষ হয়ে উঠতে লাগল। নানারূপ কৃচ্ছ্র-

সাধনের ব্যবস্থা করে সকলের চরিত্রকে বলিষ্ঠ করে তোলবার চেষ্টা চলতে লাগল। সহকর্মিনীরা প্রমাদ গণলেন।

পাঠকবর্গ নিশ্চয় এতক্ষণে উপলব্ধি করেছেন যে নীলমণিদিদিমার এই তপস্যার মূলে একটা স্থূল কারণ ছিল। ঐ কারণটির নাম ছিল অতুলপ্রসাদ, এবং তিনি আদৌ স্থূল ছিলেন না। তাঁর নাকি এমনি অপরূপ রূপরাশি ছিল যে একবার দর্শনমাত্রেই নীলমণিদিদিমার শিল্পানুরাগী পিতৃদেব, তাকে তাঁর একমাত্র সন্তানের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে ঘরজামাই করে রেখে দিয়েছিলেন। তখন নীলমণিদিদিমার এগার বৎসর বয়স ছিল, এবং মাথায়ও বেশী লম্বা ছিলেন না। তাছাড়া মুখমণ্ডলে এমন একটা কপট কমনীয়তা ছিল যে তাই দেখে এবং প্রভূত অর্থের প্রত্যাশায় অতুলপ্রসাদ কোনও দ্বিধা না করেই তাঁর পাণিগ্রহণ করেছিলেন।

কিন্তু যেমন নীলমণিদিদিমা শশীকলার মত দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বাড়তে লাগলেন, তেমনি তাঁর চরিত্রের তেজ ও বাহুর বলও বৃদ্ধি পেতে লাগল। অগত্যা একদিন হাতের কাছে নীলমণিদিদিমার যে কয়খানি অলঙ্কার পেলেন, তাই গামছায় বেঁধে নিয়ে, নীলমণিদিদিমার সাময়িক অনুপস্থিতিতে অতুলপ্রসাদ ফেরারী হয়ে গেলেন। তখন নীলমণিদিদিমা সতেরো বছরেরটি।

আর তাঁদের দেখা হয় নি। মাস দুই রাগ মাগ কান্নাকাটি করে সুবুদ্ধির জয় হল। নীলমণিদিদিমা জ্ঞানসাধনায় মন দিলেন এবং এই ঘটনার প্রায় বিশ বৎসর পরে লাঞ্ছিত নারীত্বের স্মৃতিসৌধ স্বরূপই যে ঐ শিক্ষাসদনের ভিত্তি-স্থাপন, এ বিষয়ে অন্তরঙ্গ আত্মীয়স্বজনের মনে কোনই সন্দেহ ছিল না।

লঘু আচরণ অথবা কোনরূপ উচ্ছ্বাস করবার বয়স যাদের অতিবাহিত হয়ে গেছে দেখে দেখে এইরূপ সব সহকর্মিনীদেরই দিদিমা নিযুক্ত করেছিলেন। ফলে সুখে ও শান্তিতে যে তাঁদের দিন কাটত এ কথা যেন কেহ মনে না করেন। কারণ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষসংসর্গ-বিহীনা মহিলাদের এমন একটা চিত্তের ও চরিত্রের দৃঢ়তা জন্মায় যে তখন ছোট ছোট খণ্ড প্রলয় ছাড়া একত্র বাস করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

তবে কিনা সুখে শান্তিতে বাস করতে চাওয়াটাই মানব ধর্মের চরম কাম্য নয়। বরং তাতে চিত্তে একান্ত জড়ভাবের উদ্রেক হবারই সম্ভাবনা। সেই জন্য একারণে নীলমণিদিদিমার মনে কোন খেদ ছিল না। নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছিল গণিতের অধ্যাপিকার বেলা। দুবেলা ভারত ললনাদের মধ্যে সর্বপ্রথম গণিতের গ্র্যাজুয়েট, স্বয়ং স্নেহলতা মজুমদারের বাড়ি হাঁটাহাঁটি করে, শেষ পর্যন্ত যখন একবিংশতি বৎসর বয়স্কা সুশ্রী ললিতা সেন ছাড়া অপর কাকেও পাওয়া গেল না, চিন্তিত মুখে নীলমণিদিদিমা তাঁকেই নিয়োগপত্র দিলেন এবং তৎসঙ্গে বারংবার সতর্ক করে দিলেন যেন সে ভুলেও

কখনো রঙীন কাপড় না পরে, এবং কোঁকড়া চুলগুলিকে যেন কপালের ওপর থেকে এঁটে তুলে রাখে।

বলা বাহুল্য গোলমাল সুরু হল ঐ ললিতা সেনকেই কেন্দ্র করে। বর্ষা তখনও এমনি ঘোর ঘনঘটা করে চারিদিক আচ্ছন্ন করে আসত, শ্রাবণের বারিধারাপাতে এমনি করেই পথঘাট প্লাবিত হয়ে যেত।

সন্ধ্যাবেলা হাঁটু জল ভেঙ্গে ডাকওয়ালা ললিতা সেনের জন্য একখানি চিঠি দিয়ে গেল। পুরু নীল খাম, কেমন যেন একটা খসখসে সুগন্ধ, দেখলেই মনে সন্দেহ জাগে।

নীচের হল্ ঘরে অধ্যাপিকাদের নিয়ে ছোট-খাট একটা সাহিত্য-বাসর বসেছিল, তারই মাঝখানে চিঠিখানি দিয়ে গেল। সৌভাগ্যবশতঃ ছাত্রীরা সকলেই দোতলার মাঝের ঘরে পরীক্ষার পাঠে নিমগ্ন ছিল, হেমলতাদিদির কড়া প্রহরায়। নীলমণিদিদিমা কোনো প্রকার গোপনীয়তা সইতে পারতেন না। হাতে নিয়ে বললেন, "কেমন যেন রহস্যময় মনে হচ্ছে, ললিতা, জোরে জোরে পড়তো আমরা সকলেই উপভোগ করি।"

এমন কিছু অন্যায় কথা নয়, এখানকার সকলের জীবন খোলা পাতার মত, চিঠিপত্র এলে সকলেই ভাগ বসিয়ে থাকেন। উত্তেজিত হবার মতন কিছুই নয়। কিন্তু ললিতা সেন ঝড়ের মত ছুটে এসে, একেবারে নীলমণিদিদিমার হাত থেকে চিঠিখানি ছিনিয়ে নিয়ে ঘর থেকে প্রস্থান করলেন। বিস্ময়ে সকলে নির্বাক্। নীলমণিদিদিমা যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না, এমনি করে বিমূঢ়ের মতো সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

অবশেষে হাওয়াটাকে লঘু করার উদ্দেশ্যে মৃণ্ময়ীদিদি বললেন—"বাবাঃ, কি মেয়ে গো। দুই চোখ দিয়ে যেন বিদ্যুৎ ছুটছিল।" কাষ্ঠ হেসে নীলমণি-দিদিমা আসন গ্রহণ করলেন। তাঁর হাত দুখানি অস্বাভাবিক রকমে কম্পিত হচ্ছিল। "পরের মেয়ে আমরা তৈরী করব কি, মৃণ্ময়ী, আমাদের নিজেদের বুকের মধ্যেই যে সাংঘাতিক কীট প্রবেশ করেছে, ভিতর থেকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলছে।" শুনে সকলে শিউরে উঠে কানে হাত দিলেন।

নীলমণিদিদিমা মন্ত্রমুগ্ধের মতো বললেন—"বললে হয়তো বিশ্বাস করবে না কিন্তু ও চিঠি কোনও মেয়ের লেখা নয়।"

পাংশুমুখে সকলে যেন কোনো নিদারুণ বিপদ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে গায়ের চাদরগুলি দিয়ে আপাদমস্তক জড়িয়ে নিলেন। বলা বাহুল্য, সেকালের মেয়েরা এখনকার মেয়েদের মত শুধু শাড়ি[illegible]

পেটিকোট বডি পরে লোকচক্ষুর গোচর হওয়াটাকে অসভ্যতার শেষ সীমানা ব'লে জ্ঞান করতেন।

বিধুদিদি বললেন—"আপনার ভুলও তো হতে পারে।" "ভুল ? জীবনে একবারই ভুল করেছিলাম। তাতেই আমার এমন শিক্ষা হয়েছিল যে আর আমি ভুল করি না। শুধু পুরুষের লেখা নয়, ওটা একটা প্রেম পত্র।"

বোধ হয় প্রেমপত্র ছুঁয়ে ফেলেছেন বলেই নীলমণিদিদিমা চাদরের কোণা দিয়ে নিজের হাতদুখানি বারংবার ঘষে ফেলতে লাগলেন।

রাধারাণীমাসিমা কেঁদে ফেললেন। মৃণ্ময়ীদিদি বললেন—"এত শিক্ষার পর তা কি কখনো সম্ভব হতে পারে ?"

কর্কশ কণ্ঠে দিদিমা বললেন—"শুধু পারে না, পেরেছে। পুরুষ মানুষরা সব পারে। আমার অভিজ্ঞতা আছে।" বিধুদিদি তাঁকে উত্তেজিত দেখে হাতপাখাখানি তুলে নিয়ে কাছে যেতেই, নীলমণিদিদিমা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে বললেন—"এমনি করেই স্বর্গের সিঁড়িতেও ভাঙ্গন ধরে।"

এমন সময় খিড়কি দুয়ারে করাঘাত হল। বিবর্ণ মুখে তাঁরা পরস্পরকে অবলোকন করতে লাগলেন। রাধারাণীমাসি ততক্ষণে প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠেছেন, চাপা কণ্ঠে বললেন—"দরওয়ানদের দুজনকে একসঙ্গে মাসকাবারের বাজারের জন্য সহরে পাঠানো উচিত হয়নি।"

কারো মুখে শব্দ নেই। এত জলঝড়ে এই সন্ধ্যাকালে কোনো ভালো মানুষের ছেলে যে দোরগোড়াতে দাঁড়িয়ে নেই, একথা সকলেরই মনে হয়েছিল।

নীলমণিদিদিমাকে বলিহারি, উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—"কেন উচিত হয়নি ? বিপদ হলেই একজন পুরুষ মানুষের পিছনে গা ঢাকা দিতে হবে ? একথা কি তোমাদের উপযুক্ত হল ? যাক, ভাঙ্গন যখন ধরেইছে। তোমরা এখানে বস, আমি দেখে আসছি।" নীলমণিদিদিমা বারান্দার কোণা থেকে দারোয়ানের মোটা লাঠি গাছি তুলে নিয়ে লণ্ঠন হাতে খিড়কি দোরের দিকে সেই যে গেলেন আধ ঘণ্টার মধ্যে আর ফিরলেন না।

ততক্ষণে আশঙ্কায়, উদ্বেগে বাকীরা প্রায় অর্ধমৃত। ঐ আধ ঘণ্টার কাহিনী ললিতা সেনের ডাইরী থেকে উদ্ধৃত করে দিই। ললিতা সেন এখনো জীবিত আছেন, অবশ্য অন্য পদবীদ্বারা বিভূষিতা হয়ে, আশা করি ঐতিহাসিক প্রয়োজনকে তিনি মার্জনা করবেন। ডাইরীতে লেখা ভাষার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি, কারণ বিশুদ্ধ জিনিষ আজকাল অচল।

"দোতালার পেছন দিকে, খিড়কি দোরের ওপরে, নিজের কক্ষে দোর দিলাম। অনভ্যস্ত আবেগে বক্ষ উদ্বেলিত। হেনকালে জলঝড়ে খিড়কি দোরে করাঘাত। জানালা দিয়ে দেখলাম, লাঠি বগলে, লণ্ঠন হাতে, নীলমণি-দিদিমা দ্বার উন্মোচন করলেন। ভয়ে আমি কাষ্ঠপ্রায়। লণ্ঠনের আলোতে স্পষ্ট দেখলাম দীর্ঘ, শীর্ণ, ফর্সা আধাবয়সী পুরুষমানুষ প্রবেশ করে, নীলমণিদিদিকে সরিয়ে দিয়ে, নিজেই দরজায় আগল লাগিয়ে, দরজায় ঠেস দিয়ে, হাঁপাতে লাগল। নীলমণিদিদি লণ্ঠন উঁচু করে, তার মখাবলোকন করলেন; লোকটা নির্ভয়ে অস্বাভাবিক উজ্জ্বল চোখ দিয়ে চেয়ে রইল, খাঁড়ার মত নাক, পটোলচেরা চোখ; কোঁকড়া চুলের রাশি; ঠোঁটের কোণে তিল আর তারই উপরে সরু গোঁফ; চোখের কোলে কালি; পরণে আদ্দির পাঞ্জাবী আর চুড়িদার পাজামা, গলায় একটা সোনার হার চিকচিক করছে।

বললে হয়তো কেউ বিশ্বাস করবে না, নীলমণিদিদির আড়াই মণি দেহখানি বেতসলতার মত কম্পিত হতে লাগল। অস্ফুট কণ্ঠে বললেন—"তুমি ? এতদিন পরে সত্যিই তুমি ?" লোকটা লজ্জিত মুখে বলল—"কি করি বল ? আমাকে যে সিংহে তাড়া করেছে। আরেকটু হলেই ধরে ফেলত।"

লণ্ঠনের আলোতে দেখলাম নীলমণিদিদির মুখ কঠিন হয়ে উঠল—"এখনো মিথ্যা কথা ছাড়নি ?" লোকটা ব্যস্ত হয়ে নীলমণিদিদির হাত চেপে ধরে বলল—"মাইরি বলছি, সিংহে তাড়া করেছে। ঐ শোন।"

জলঝড়ের শব্দ ভেদ করে স্পষ্ট শুনলাম পিছনের দরজায় কুকুরের নখ আঁচড়ানোর মতো খচ মচ শব্দ। তখন কি আর বলব, নীলমণি-দিদি লণ্ঠনটা নামিয়ে রেখে সত্যি সত্যি লোকটার বুকের উপর মূর্চ্ছিত হয়ে লুটিয়ে পড়লেন। সে রোগা মানুষ পারবে কেন ? এমন সময় বিধুদিদি, রাধারাণীপিসিরা পাঁচ সাত জনা পাংশুমুখে পরস্পরের কাঁধে ভর দিয়ে এসে হাজির। লোকটা যেন কুল পেল—"কি দেখছেন ? ধরুন, ধরুন, ঠেকা দিন। ও খচমচ আওয়াজটা কিছু না, সিংহে দরজায় আঁচড়াচ্ছে।"

"এঁ্যা, সিংহ ?"

"আহা, বিচলিত হবেন না। সার্কাসের সিংহ। কাজ ছেড়ে চলে এসেছি; তা আমায় এমনি ভালোবাসে যে কিছুতেই ছাড়বে না। কিছু ব্যস্ত হবেন না দিদিমণিরা, দলের লোকরা পেছনে আছে, এখুনি ধরে নেবে। একদম পোষ মানা।"

ততক্ষণে নীলমণিদিদিকে বারান্দার শ্বেত পাথরের উপর শোয়ানো হয়েছে।

চোখ মেলেই বললেন—"দেখ, আমাকে ক্ষমা কর, তোমাকে অবিশ্বাস করে-ছিলাম।"

লোকটি তড়াক করে কাছে এসে হাত ধরে বলল—"কি মুস্কিল ক্ষমা করতেই ত' এসেছি। বয়স হয়ে গেছে সার্কাসে সিংহের খেলা দেখান আর পোষায় না। তা ছাড়া এখন আর সংসার করাকে ভয় পাই না।"

এইখানে দিদিমণিরা সকলে প্রস্থান করলেন, তা কেউ অতটা লক্ষ্যই করল না।

নীলমণিদিদি উঠে বসে বললেন—"তোমাব কাপড়-চোপড় ভিজে গেছে, অসুখ করবে যে।"

"আহা, তাই তো চাই, তা হ'লে তোমার হাতের সেবা যত্ন পাব। দেখ, সার্কাসেও আমার সব কৃতিত্বের মূলে তুমি। তোমার কাছে যে ট্রেণিং পেয়েছিলাম এতদিন তাই ভাঙ্গিয়ে খেযেছি। এখন যদি থাক্‌তে দাও, থাকব। আর যদি না দাও, যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাব।"

তখন নীলমণিদিদি হাত বাড়িয়ে—নাঃ বাকীটা লিখতে ভারী লজ্জা করছে।

ললিতা সেনের ডাইরী থেকে এতটা পেয়েছিলাম, বাকী অংশ তাঁর ননদকে লেখা, আমার দিদিমার চিঠি থেকে সংগ্রহ করেছি। দিদিমা লিখছেন—"তুমি শুনিয়া সুখী হইবে যে নীলমণির স্বামী অতুলপ্রসাদ ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহারা পরম সুখে বাগানবাড়ির পিছন দিকে বাস করিতেছে, সামনের দিকে শিক্ষা সদনের কার্য্যাদি নির্বিঘ্নে চলিতেছে। তবে আজকাল অনেকগুলি তরুণী শিক্ষয়িত্রীও নিযুক্ত হইয়াছেন। ঐ যে ললিতা সেনের রূপ দেখিয়া তোমরা এত প্রশংসা করিয়াছিলে, শুনিয়া নিশ্চয় আহ্লাদিত হইবে, যে আমার মধ্যম পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ। সম্বন্ধ নিজেরাই স্থির করিয়াছে। কালের সঙ্গে চলিতে হইলে এক্ষেত্রে আপত্তি করিবার কিছু নাই। আশা করি বিবাহ-কালে সকলেই উপস্থিত থাকিতে পারিবে। ইতি।"

বাস্তবিকই ঘরের কথা ঘরেই থাকা উচিত, তথাপি এই পারিবারিক কাহিনী সকলের সম্মুখে প্রকাশ করবার একমাত্র কারণ যে বর্তমান কালের তরুণীদের মধ্যে ইদানিং এমন একটা ভাব পরিলক্ষিত হয়েছে যেন প্রেম জিনিষটা তারাই আবিষ্কাব করেছে। সত্যযুগে হয় তো বা ছিল, কিন্তু তাবপরে যেন চাপা পড়ে গিয়েছিল। একথা যে সর্বৈব মিথ্যা তার প্রমাণস্বরূপ এই উপাখ্যান।

প্রজাপতির নির্বন্ধ

কবিগণ প্রেমের গতিকেই দুনিয়ার বৃহত্তম রহস্য বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু তার চেয়েও বড় রহস্য হল যে ষাট বছর আগেকার নরনারীরা, অন্ততঃ আমাদের দেশে, প্রেমে আবদ্ধ হবার সুযোগ করে নিতেন কি উপায়ে। এখনকার অতিশয় সুবিধাজনক পরিস্থিতির কথা ভুলে যেতে হবে। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের তরুণীরা অষ্টপ্রহর যে রকম-আষ্টে পৃষ্ঠে নিয়ম নিগড়ে বাঁধা থাকতেন, তাঁদের নৈতিক নিরাপত্তার দিকে তাঁদের গুরুজনদের যেরূপ সতর্ক প্রহরা ছিল, ভালোবাসার কথা যে আদৌ তাঁদের মনে স্থান পেত, এই বড় আশ্চর্য।

আমি সেই সকল রক্ষণশীল পরিবারের মেয়েদের কথা বলছি না, যাদের বারো বছর পূর্ণ হবার পূর্বেই, যেমন তেমন করেই হক না কেন, একজন হতভাগ্য স্বজাতির গলায় সংলগ্ন করে দিয়ে একযোগে জাতরক্ষা ও প্রকৃতিকে দমন করা হত। তখন গৃহের শান্তি রক্ষার জন্য ঐ পুরুষমানুষটিকে ভালোবেসে ফেলা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকত না। আমি তাঁদের কথা ভাবছি, যাঁরা কালো জুতো পরে আর কালো মোজা হাঁটুর কাছে ইলাষ্টিকের গার্টার দিয়ে নিরাপদভাবে আটকিয়ে, লম্বা হাতার ও উঁচু গলার জামা গায়ে দিয়ে, এবং আগুল্ফলম্বিত সাড়ি, বামস্কন্ধে পিন্ দিয়ে আবদ্ধ করে, আপিসযান ঘোড়ার গাড়ির উভয় পাশের দরজা উপযুক্তভাবে ঈষৎ টেনে দিয়ে, সাধারণের লুব্ধদৃষ্টি থেকে আপনাদের যথাসাধ্য গোপন করে, বেথুন কলেজে যাতায়াত করতেন।

আমি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি যে এঁদের হৃদয়ও মাঝে মাঝে প্রেমের কারণে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠত, এবং বিষম আঁটো জামা পরিধান করা সত্ত্বেও থেকে থেকে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস থেকে উদ্বেলিত হৃদয়ের পরিচয়ও পাওয়া যেত।

প্রেমের পথে তখন কত যে বিঘ্ন ছিল তার লেখাযোখা নেই। তখনকার শিক্ষিত লোকদের মধ্যে অনেকেই দেশের যত সব নেটিভ আনাড়িপনা দেখে, উপযুক্তরূপে নাসা কুঞ্চিত করে বিলিতী আদর্শকে বক্ষে ধারণ করতেন। তাতে একটা মুস্কিল হত। সেই সময়ে ইংলণ্ডের সিংহাসনে মহারাণী ভিক্টোরিয়া কেবল যে দৃঢ়ভাবে আসীনা ছিলেন তা নয়, তদুপরি সেখান থেকে কেউ যে সহজে তাঁকে বিচ্যুত করতে পারবে একথাও মনে হত না, তা সে ক্রমবর্দ্ধমান বার্ধক্যই হক, অথবা ক্রমশঃ অসহিষ্ণু পুত্রকন্যাই হক।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া যে নানাবিধ সদ্‌গুণ দ্বারা বিভূষিতা হলেও কিঞ্চিৎ বাতিকগ্রস্তা ছিলেন, সে বিষয় কোনই সন্দেহ নেই। জ্যেঠাখুড়া -পিতামহের আমলে যে সকল সহজ আমোদ প্রমোদ ও প্রেমের ব্যাপার নির্বিঘ্নে চলে আসছিল, সে সকলই তিনি এককথায় বন্ধ করে দিলেন। তার প্রতিক্রিয়া এ দেশে পর্যন্ত দৃশ্যমান হ'ল।

শিক্ষিতা আধুনিকা তরুণীদের অভিভাবকবা প্রেমের মহা শত্রু হ'য়ে দাঁড়ালেন। তখনকার তরুণীরাও যে প্রেমের পথকে সহজ করবার জন্য বিশেষ যত্নবতী ছিলেন সে কথাও মনে হয় না। বরঞ্চ সেলী কীট্‌স্ পড়ে পড়ে তাঁদের মনের মধ্যে নানাবিধ আদর্শবাদ বিরাজ করতে শুরু করল, যার নায়কদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার সাহস কজনারই বা ছিল?

তথাপি প্রেমের ব্যাপার যে আদৌ সংঘটিত হত, এই বড় আশ্চর্য। আমার সেজমাসিমার কথাই উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক। দেখতে মন্দ ছিলেন না, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, দোহারা গড়নটি, অবশ্য সাড়ি-জ্যাকেট এবং গোটা দুই তিন আভ্যন্তরীণ পরিচ্ছদ যার নাম মুখে আনাও অসভ্যতা বলে গণ্য ছিল, এই সব দ্বারা উক্ত গড়নটিকে যথাসম্ভব শাসন করে রাখা হত। দিব্যি লম্বা কোঁকড়া কালো এক মাথা চুল, ছেড়ে দিলে হাঁটু ছাড়িয়ে যায়। অবশ্য সর্বদা দৃঢ়বেণী সংবদ্ধ করে পাকিয়ে পাকিয়ে একুশটা কালো কাঁটা দিয়ে যথাস্থানে আবদ্ধ। তার উপর খাসা সুগঠিত নাক, চোখ, চিবুক, ঠোঁট, অবশ্য সে সকল লোকচক্ষু গোচর হলেই একটা গম্ভীর সংযত শিক্ষিত হাঁড়িপানা ভাবদ্বারা আচ্ছন্ন থাকত। শুনেছি ব্যবহারটিও ছিল তদনুযায়ী সরস, সুমধুর, অবশ্য প্রকাশ্যে একটা অভেদ্য বর্ম আঁটা আড়ষ্ট ভাবই লক্ষিত হত। যাই হক, যৌবনের লাবণ্যকে নিশ্চয়ই সম্পূর্ণরূপে দমন করা যায় না, নইলে এত সব ভেদ করে আমার সেজমাসিমার উপরেই বা কি করে প্রেমের বাণ নিক্ষিপ্ত হল?

দিদিমা ও তাঁর পাঁচ ভগ্নীর পরামর্শে প্রথম যৌবন থেকেই সেজমাসিমা পুরুষজাতিকে ঘৃণা করতেন। এও মহামান্যা ভিক্টোরিয়ারই আদর্শের অনুযায়ী। তিনি নাকি একবার গোপনে কোনও একজন বিশেষ বান্ধবীর কানে কানে বলেছিলেন যে একমাত্র তাঁর স্বামী বেচারা প্রিয় অ্যালবার্ট ছাড়া সমগ্র পুরুষ জাতটাই অতিশয় মন্দ। তার উপর দিদিমাদের ছয় বোনের দীর্ঘ বিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতার প্রভাবে সেজমাসিমার আদৌ বিয়ে হওয়াটাই এক মহা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল।

বড়মাসিমা, মেজমাসিমার বেলা অতটা হয় নি, কারণ তখনও দিদিমার বয়সটা নেহাৎ অপরিণত থাকাতে মতামতগুলোও ছিল

অতিশয় কাঁচা। পরিস্থিতিটা তাঁর সম্যক্ বোধগম্য হবার পূর্বেই তাঁর শ্বশুর মহাশয় প্রথমা ও দ্বিতীয়া পৌত্রীর, তাঁর মতে উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে, একদিন সুন্দর সকালবেলায় দিব্যি ড্যাং ড্যাং করে স্বর্গারোহণ করলেন।

এই সকল ঘটনার কিছুকাল পরেই পাশের বাড়ির ছেলে রতন চৌধুরী বিলেত থেকে ব্যারিষ্টারি পাশ ক'রে অনেকগুলো বহুমূল্য কোট পেণ্টেলুন ও আধুনিক মতামত নিয়ে ফিরে এল। দিদিমা তার ভাবগতিক দেখে হাড়ে চটে গেলেন। বললেন, ওব স্বভাব উচাটন। মহারাণীর উচ্চ আদর্শ গ্রহণ না করে, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের মন্দ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করছে।

শোনা যেত নাকি রোজ বিকেলে কলারের বাইরে দিয়ে অতি ফ্যাসানেব্‌ল্ সাদা ফুট্‌কি দেওয়া নীল টাই বেঁধে, বাদামী রংএর চওড়া কাঁধের ও সরু পায়ের কোট প্যাণ্ট পরে, মাথায় হ্যাট্ চড়িয়ে, মেমেদের সঙ্গে ছোকরা টেনিস্ খেলতে যেত। মাঝে মাঝে এক ঘোড়ায় টানা, হলদে চাকাওয়ালা ডগ্--কার্ট চেপে গঙ্গার ধারে বিড়ালাক্ষী সুন্দরীদের সঙ্গেও নাকি তাকে দেখা গিয়েছিল। এবং চুরুট্ মুখে দিয়ে, চোখে বাইনকুলার লাগিয়ে যে দোতলার বারান্দা থেকে সে চারিদিক পর্যবেক্ষণ করত, এর তো বহু সাক্ষী পাওয়া গিয়েছিল।

সেজমাসিমার বালবন্ধু মিস্ সলীলা সরকার সবে লেডি ডাক্তার হয়ে বেরিয়েছেন। মোটা, বেঁটে, ঘোর কালো, এবং দারুণ বিবাহবিরোধী। তাঁর কাছে সেজমাসিমা অহরহ রতন চৌধুরীর নিন্দা করেও মনের ঝাল মেটাতে পারতেন না।

আমার দাদামশাইরা সেকালের ফ্যাসানেব্‌ল্ লোক ছিলেন, এখানে ওখানে পার্টিতে যেতেন। সঙ্গে দিদিমা তাঁর অবিবাহিতা মেয়ে কটিকেও নিয়ে যেতেন। বিয়ে তো দিতে হবে। সবাইতো আর ঐ সলীলা সরকারের মত কালো কুৎসিৎ নয়, যে আজীবন কুমারী থাকবে। সেইজন্য মেয়েদের সভ্যসমাজে একটু আধটু বেরোনো দরকার বৈ কি। কিন্তু তাই বলে তো আর যার তার সঙ্গে, যত সব রেচেড্ বাউণ্ডার ভদ্রসমাজের আনাচে কানাচে শিকারের আশায় ঘুরে বেড়ায়, তাদের সঙ্গে তো আর মেলামেশা করতে দেওয়া যায় না।

সেইজন্য দিদিমার অপরিবর্তনীয় নিয়ম ছিল যে তাঁর কাছ থেকে পাঁচ পদক্ষেপের বাইরে মেয়েরা যাবে না। চেঁচাবে না ; কারণ কোনো শিক্ষিত মানুষ চেঁচায় না। কিন্তু তাই বলে কোনো পুরুষমানুষের সঙ্গে, সে হাজার চেনা মানুষ হক না কেন, তাদের কারো সঙ্গে এতটা নিম্নকণ্ঠেও কথোপকথন করবে না যে দিদিমা শুনতে না পান। আর অপরিচিত পুরুষমানুষদের দিকে তো দৃষ্টিপাত পর্যন্ত করবে না।

সেকালের স্ত্রীস্বাধীনতা এমনি কঠোর সংযমের ব্যাপার ছিল।

এমনি একটা বাগান-পার্টিতে রতন চৌধুরী সেজমাসিমাকে দেখেছিলেন। এবং সম্পূর্ণ অপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও যথাসম্ভব কাছে এসে, অমার্জনীয় এবং অভদ্রভাবে, পুরুষজাতির বিরুদ্ধে সলীলা সরকারের কাছে যে সকল কটু মন্তব্য করছিলেন সে সকল শুনে, তৎক্ষণাৎ মেমটেম বিষয়ে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে, সেজমাসিমার সঙ্গে আকণ্ঠ প্রেমে পড়ে গেলেন।

কিন্তু সেকালেও শুধু প্রেমে পড়লেই তো আর ল্যাঠা চুকে যেত না। রতন চৌধুরীও পড়ে গেলেন মহা সমস্যায়। যদি বা কোর্টে গিয়ে দাদামশাইকে লজ্জাস্কর সব চাটুবাক্যে মুগ্ধ করে ফেললেন ; যদি বা নিজের মাসির বন্ধু লেডি মজুমদারের পক্ষপুটের নীচে ভালো মানুষটী সেজে দাঁড়িয়ে, দিদিমার সঙ্গে আলাপটি বাগিয়ে নিলেন ; এমন কি লেডি মজুমদারের সুপারিশে মাঝে মাঝে বৈকালীন আসরে নিমন্ত্রণটি পর্য্যন্ত আদায় করলেন ; তথাপি দিদিমা অথবা তাঁর কন্যাদের হৃদয় জয় করা যে অতিশয় কঠিন কাজ এ তাঁকে স্বীকার করতেই হল।

পুরুষমানুষদের নিন্দা করে করে আসলে কিন্তু দিদিমা অন্তরে অন্তরে ক্লান্ত হয়ে এসেছিলেন। মেয়েটা কি শেষ পর্য্যন্ত ওল্ড্ মেড্ হয়ে থাকবে নাকি? সেই জন্য সেজমাসিমা যেদিন চায়ের টেবিলে হঠাৎ বলে বসলেন "উঃ, মা, যাদের রোজ খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজায়, যারা দুর্গন্ধ পাইপ না টেনে থাকতে পারে না, যারা নিজেদের অপরাধের সময় ভাবী ক্ষমাশীল, কিন্তু মেয়েদের অন্যায়—" এই অবধি বলতেই দিদিমা অপ্রত্যাশিত রকম কর্কশ কণ্ঠে বললেন, "এবার থাম তো নলিনী। যাদের নইলে চলে না তাদের বিষয় এরকম নেমকহারামি শোভা পায় না।"

সেজমাসিমাও ছেড়ে দেবার পাত্রী নন, সসম্মানে বি-এ পাশ করেছেন, কাউকে কেয়ার করবেন কেন? তিনি বললেন, "কাকে নইলে চলে না?" "কেন, ধর না তোমার বাবাকে। এবং তার পরে যার ঘাড়ে চাপ্‌বে তাকে।"

এমন বিশ্বাসঘাতকতার কথা শুনে সেজমাসিমা রেগে কেঁদে ঘর থেকে চলে গিয়েছিলেন। পেয়ালা ভরা চা বৃথাই ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল।

দিদিমারও মাথায় রাগ চড়ে গেছিল, তিনিও সেজমাসিমার ঘরের ভিতর প্রবেশ করে, তেমনি কঠিন কণ্ঠে বলে এলেন—"কথায় কথায় অত রাগ দেখানো মেয়েমানুষের শোভা পায় না, নলিনী। এরপরে কি করবে ভেবেছ কখনো? বাপ কারো চিরদিন থাকে না। রতন চৌধুরী শিক্ষিত, আধুনিক এবং বড়লোকের ছেলে। তাকে তুমি যখন তখন রেগুলার অপমান কর।" এখানে সেজমাসিমা আপত্তি করতে উদ্যত হলে, দিদিমা দ্বিগুণ জোরে বললেন, —"হ্যাঁ, কর। সে ঘরে এলেই উঠে যাওয়াটা তাকে অপমান করা নয় ত·

কী? এর জন্য তোমাকে অনুতাপ করতে হবে বলে রাখলাম। বাইশ বছর তো বয়স হ তে চলল; দুদিন বাদে গিয়ে বুড়োদের দলে ভিড়তে হবে, তখন আর মৌমাছিরা চারপাশে গুন্-গুন্ করবে না। তারা তখন অন্য ফুলের চেষ্টা দেখবে, এও বোঝ না? নাকি অর্ডিনারি লোকদের মেয়েদের মতো কোনো স্কুলের মাষ্টারণী হবে? বিলেতে যেমন দোকনদার আর পাদ্রীদের মেয়েরা হয়।"

সেজমাসিমা রেগে কেঁদে বে-আইনী রকম উচ্চৈঃস্বরে বলেছিলেন, "বেশ, তাই হব। বেশ হবে।"

এতদূর পর্যন্ত মনে হচ্ছিল দাদামশাই দিদিমা বুঝি রতন চৌধুরীর সপক্ষে আর সেজমাসিমা এবং নিশ্চয় সলীলা সরকার তাঁর বিপক্ষে। পরদিন কিন্তু সমস্ত বিপরীত হয়ে গেল। সেদিন শনিবার, আড়াইটা তিনটার ডাকে সেজ-মাসিমার নামে একখানি পুরু গোলাপী রংএর খাম এল। সেখানি প্রতিদিনকার মতো অন্যান্য সব চিঠির সঙ্গে দাদামশায়ের প্লেটের পাশে আরেকখানি ছোট প্লেটে রক্ষিত থাকল। তারপর দাদামশাই মাখনলাগা ছুরি দিয়ে খামটি কেটে চিঠিটি বের করে পড়লেন। কারণ কুমারী মেয়েদের চিঠিপত্রের তত্ত্বাবধান করা বাপ মার কর্তব্য বই ত নয়। সেজমাসিমাও আপত্তির কোনো কারণ দেখলেন না।

দাদামশাই চিঠি পড়ে আঁৎকিয়ে লাফিয়ে উঠলেন। ধাক্কা লেগে তাঁর চেয়ারটা উল্টে পড়ে গেল। রাগে তাঁর ফর্সা মুখখানি পাকা আমের মতো টকটকে লাল হয়ে উঠল। "প্রিপষ্টেরাস্! স্কাউণ্ড্রেল্! ব্লা—" যাক সে সবের আর পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই। পুরুষমনুষের রাগের সব কথা। ছুঁড়ে চিঠিটা দিদিমাকে দিলেন। দিদিমা জোরে জোরে পড়লেন; চিঠিতে ইংরিজিতে লেখা :—

"প্রিয়তমা নলিনী, তুমি শীতের দেশের শীতের শেষের প্রথম ড্যাফোডিল ফুলটির মতো সুন্দর। তোমাকে আমি ভালোবাসি। একথা যদি বুঝে থাক, আমাকে বিবাহ করতে সম্মত হও। আর যদি না বুঝে থাক, কস্মিন্ কালেও তোমার বুদ্ধি হবার আশা নেই। অতএব তোমার চুলের মুঠি ধরে তোমাকে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। ইতি।

তোমার প্রেমাবদ্ধ রতন চৌধুরী।

শুনে সকলে বাক্যাহত হয়ে গেল। এত বড় আস্পর্দ্ধা যে একজন ভালো ফ্যামিলির মেয়েকে রতন চৌধুরী এরকম চিঠি লেখে।

ঠিক সেই সময়ে বাট্‌ন্‌হোলে একটি সাদা গোলাপ লাগিয়ে, রতন চৌধুরী নিজে এসে, চিঠির উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়াল। শেষ কথাগুলি তার কানে যাওয়াতে, টেবিলের প্রতি একবার দৃষ্টিপাতেই পরিস্থিতিটা সে অনুমান করে

নিল। আস্তে আস্তে তা'র কর্ণমূল পর্যন্ত রক্তিম হ'য়ে উঠল, সর্বদা হাসিতে ভরা ঠোঁট দুখানি একটি ঋজু রেখা হয়ে গেল।

ঠিক এই সময় সেজমাসিমা অবাক্ হয়ে অনুভব করলেন যে তাঁর হৃদয় দুটি স্পষ্ট বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত হয়ে গেল। এক দিকটা রতন চৌধুরীর নিভৃতে লেখা প্রেমপত্র প্রকাশ্যে পাঠ করার জন্য মার উপর রাগে অন্ধ হয়ে গেল। অপর দিকটা তাঁর অমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিকে সন্দেহ করার জন্য রতন চৌধুরীর উপর রাগে জ্ঞানশূন্য হয়ে উঠল।

কিন্তু একবার রতন চৌধুরীর আরক্ত মুখখানির দিকে দৃষ্টিপাত করেই, উঁচু গোড়ালীর জুতো পায়ে দিয়ে যতখানি সম্ভব দ্রুত পদে তার কাছে গিয়ে, সর্বজনসমক্ষে সেজমাসিমা তার কনুই ধরে মৃদু একটা ঝাঁকানি দিয়ে কম্পিত কণ্ঠে বললেন, "মোটেই যত বোকা ভেবেছে, ততটা নই।" বলেই, কোত্থেকে যেন ছয় ইঞ্চি চারকোণা একটা লেসের পাড় দেওয়া রুমাল বের করে, সকলের সামনেই ভেউ ভেউ ক'রে কেঁদে ফেললেন।

আর কিইবা বাকী রইল? ঐ তো শত শত বাধা সত্ত্বেও পঞ্চাশ বছর আগেকার লোকেরাও কেমন কত সহজে প্রেমের পথ খুঁজে বের করে নিল। আসল কথা হল, বাধা পেলেই ভালোবাসার পথ পরিস্কার হয়ে যায়। সেকালেও যেত, এখনো যায়।

দিবাকরের বিবাহ

আমার সেজমামার ছেলে দিবাকরের আর কিছুতেই বিয়ে হয় না। ছেলে কিছু মন্দ নয়, বরং অনেক দিক দিয়ে দস্তুরমতো ভালো। দিব্যি পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি লম্বা, ফর্সা না হলেও খুব কালো বলা চলে না। আর চোস্ত দাড়ি গোঁফ কামিয়ে, টেরি কেটে, হাওয়াই সার্ট পরে দাঁড়ালে দস্তুরমতো সুদর্শন বলা চলে। লেখাপড়াতেও কম নয়, আমার নিজের মামাতো ভাই, কম হবেই বা কেন, বিলেত থেকে কি সব এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে এসে, ভালো কাজ পেয়েছে। বাপের অবস্থাও কিছু ফেলনা নয়। ঐ একটি ছেলে, আর একটি মেয়ে, তার আবার বেশ ভালোই বিয়ে হয়েছে। বাপ সারাজীবন ডাক্তারি করে দুপয়সা জমিয়েছে বলেতো আমার বাপের বাড়ির সকলে সন্দেহ করেন। আর কথাবার্তা, চাল-চলন দিব্যি হাল ফ্যাসানের কায়দা দুরস্ত।

অথচ এ হেন দিবাকরের কিছুতেই বিয়ে হয় না।

দিবাকরের নিজের যে বিয়েতে খুব আপত্তি আছে, তাও নয়। বরং আমাদের বিশ্বাস মনে মনে বেশ একটু আগ্রহই আছে। তবু কেন যে বিয়ে হয় না, তার প্রধান কারণ পছন্দমতো মেয়েই নাকি পাওয়া যায় না।

শুনে আমাদের সকলেরই একটু হাসিও পায়, আবাব একটু রাগও হয়। পৃথিবীসুদ্ধ সকলের যুগ্যি কনে পাওয়া যায়, আর দিবাকরই বা কি এমন কাত্তিক ঠাকুর যে ওর বেলা পাওয়া যাবে না।

দিবাকরের বড় বোন হৈমন্তী শেষ পর্যন্ত একদিন বলে বসল—"কি বাবা তুই এমন সাত রাজার ধন এক মাণিক হয়েছিস যে তোর বৌ পাওয়া যায় না? আমাদের ওনাদের সব টপাটপ বিয়ে হয়ে গেল আর তোর হয় নাই বা কেন?"

দিবাকর কাষ্ঠ-হাসি হেসে বললে—"কিসে আর কিসে! তোমাদের ওনাদের কথা আর বল না। ভাগ্যিস তোমবা জন্মেছিলে নইলে সব ওনাদের কি দশা হত বল তো"?

হৈমন্তী রেগে টং; সত্যি কথা বলতে কি আমি নিজেও কথাটা শুনে খুব খুসি হই নি। আমার মেজমামীমা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, বললেন—"আহা! ঠগ বাছতে গাঁ উজোড়।' সেজবৌয়ের সব তাতেই বাড়াবাড়ি, মেয়ের বিয়ের সময়ে শুনতাম ছেলে পাওয়া যায় না, ছেলের বিয়ের সময়ে শুনি মেয়ে পাওয়া যায় না। এর কোনো মানে হয়? বাংলা দেশে কি কারো বিয়ে হয় না? আমার ভাইঝি রাধারাণী কি মন্দ ছিল?"

সেজমামীমা বললেন,—"কি যে বল মেজদি, তোমাদের রাধারাণীর নাকের ডগাটা কি রকম মোটা দেখতে, ওর সঙ্গে যে কি করে বিয়ের কথা পাড়তে পারলে, এই আমি ভাবি।"

হৈমন্তী বললে,—"আমার পিস্‌তুত ননদ মীনাক্ষীর নাকের ডগা তো আর মোটা নয়, তাকে কেন পছন্দ হল না শুনি?"

সেজমামীমা বিরক্ত হয়ে বললেন,—"তুই থাম তো, হিমি। ঐ মীনাক্ষী রেগে গেলে তোত্‌লামি করে, ওকে বিয়ে করলে আমার দিবাকর সুখী হত না।"

হৈমন্তী রেগে বললে,—"তোমার দিবাকরটি অসুখী হত, না মীনাক্ষী অসুখী হত সেই হল কথা। আমার মতে মীনাক্ষী ভারী বেঁচে গেছে। দিবাকরের চেয়ে কত ভালো বরের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়েছে, ভালোই হয়েছে।"

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, দিবাকরের বিয়ে হচ্ছে না বলে বাড়ির সুখশান্তি নষ্ট হবার জোগাড়। সেজমামা সংসারের ব্যাপারে বড় একটা নাক ঢোকান না, কিন্তু দিবাকরের বিবাহ ব্যাপার নিয়ে সেজমামী তাঁকে এমনি অতিষ্ঠ করে তুললেন যে, শেষ পর্যন্ত তিনি বাধ্য হয়ে পাড়ার তাস খেলার ক্লাবে নাম লিখিয়ে রোজ রাত এগারোটার সময়ে বাড়ী ফিরতে সুরু করলেন।

ব্যাপার দেখে, ভাইয়ের মঙ্গলের জন্য আমার ভালো মানুষ মা পর্যন্ত চিন্তিত হয়ে উঠলেন। দিবাকরের একটা বিয়ে না দিলেই নয়। মা বললেন,—"দিবাকরের বিয়ে হয় না মানে? মেয়ে পাওয়া যায় না, একটা কথা হল নাকি? মাঝখান থেকে আমার ভাই বেচারা, এক রকম বাধ্য হয়ে গোল্লায় যেতে সুরু করেছে। আজ তাসের আড্‌ডা, কাল গাঁজার আড্‌ডা, এর শেষ যে কোথায় হবে কে জানে। এর ফল ভালো হবে না বলে দিলাম, সেজবৌ। আমি এখুনি পাঁচ সাতটা ভালো মেয়ের সন্ধান দিচ্ছি, ভালো চাও তো এর থেকে একটা ঠিক করে ফেল।"

সেজমামীমা ননদের বকুনি খেয়ে রেগে কেঁদে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন, কিন্তু দিবাকর নিজে এসে বললে,—"কে পাঁচ সাতজন ভালো মেয়ে শুনি, পিসিমা।" আমরা একটু মুচ্‌কি হাসলাম।

মা বললেন,—"কেন, ছেলেদের স্কুলের হেডমাষ্টারের বড় মেয়ে কুন্তী।"

দিবাকর বললে,—"সে বড় খাটো করে কাপড় পরে, ও চলবে না।"

মা বললেন,—"হেডমাষ্টারের মেজমেয়ে মন্দাকিনী।"

দিবাকর বললে,—"ও বাবা! সে ডাকসাইটে ঝগড়াটে।"

মা উত্তেজিত হয়ে বললেন,—"আমার ভাসুরঝির মেয়ে ইরা।"

দিবাকর বললে,—"ওরে বাপ্‌রে? হাতী বিশেষ।"

মা আরও উত্তেজিত হয়ে বললেন—"খেঁদির ননদ বিনু।"

দিবাকর বললে,—"বডড রোগা।"

আমি এগিয়ে এসে বললাম,—"পাশের বাড়ির গোপা।"

দিবাকর বললে,—"ও রকম সাহেব বাড়ির মেয়ে মনে ধরলে তো আমি বিলেত থেকে আদি-অকৃত্রিম মেম সাহেবই আনতাম।"

আমি বললাম,—"আমার মেজখুড়ির বোনঝি ইন্দ্রাণী।"

দিবাকর বললে,—"বড্ড হিন্দু প্যাটার্নের।"

আমরা তখন বাড়িশুদ্ধ সবাই রেগেমেগে বললাম,—"যা, তোর বিয়েই হবে না। তুই আইবুড়ো থাকবি। যা না কোনও মিশন টিসনে নাম লেখা।"

মাঝে মাঝে এমনও হয় যে বিয়ে প্রায় ঠিক হয়ে গেল বলে। আবার শেষ মুহূর্তে কোথা থেকে এক ফ্যাকড়া জুটে সব পণ্ড করে দেয়। সেজমামীমা এই সব অবস্থার জন্য প্রমাণ সাইজের একজোড়া জড়োয়া বালা গড়িয়ে রেখে-ছিলেন। দিব্যি মকর মুখ দেওয়া, লাল সবুজ নানান রঙের পাথর বসানো খাসা বালা জোড়া।

বালা জোড়ার আবার প্রয়োজন অনুসারে নানান অদল বদল হতে থাকে। যেমন যখন সেজমামীমার সইয়ের মেয়ে ডলির সঙ্গে বিয়ে প্রায় ঠিক হয়ে এল, বালার মুখে দুটি ছোট ছোট ঘুণ্টি লাগানো হল, কারণ ডলি যে কেবল সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা তা নয়, ইয়া জাঁদরেল গড়নের।

তারপর যখন সইয়ের সঙ্গে কি একটা ছোট কথা নিয়ে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গেল, বিয়ের কথাও বন্ধ হয়ে গেল, তখন সইয়ের বড় জার মেয়ে নেলির সঙ্গে বিয়ে প্রায় হয় হয় বলে। এবার ঘুণ্টি কেটে ফেলে মকর মুখটাকে টেনে ছোট করা হল। কারণ নেলি লম্বায় পাঁচ ফুটেরও কম। গড়নে বেড়াল বাচ্চা। কিন্তু নেলির সঙ্গে কেন জানি হল না।

ক্রমে যেমন দিন যেতে লাগল সেজমামীমা মরিয়া হয়ে কেবল বালা কেন শাড়িও কিনে ফেললেন। শাড়ি কেনার পর জামা, সেমিজ, পেটিকোটও করিয়ে রাখলেন। দর্জিকে বলে সেলাইয়ের জোড়ায় জোড়ায় দু ইঞ্চি করে কাপড় রাখলেন, যাতে ইচ্ছামতো ছোট-বড় করা যায়।

মোট কথা সবই হল কনে পছন্দ ছাড়া। সেজমামীমা একজোড়া জরীর কাজ করা দিল্লীর স্যাণ্ডেলও কিনে ফেলছিলেন, শেষ মুহূর্তে দিবাকরই বাধা দিল।

শেষ অবধি এমন হয়ে দাঁড়াল যে, আত্মীয়স্বজন সকলেই হাল ছেড়ে দিয়ে যে যার নিজের কাজে মন দিলেন। সেজমামীমার খুড়শাশুড়ী, আমার ছোট দিদিমা বলে বসলেন, "আমার কথা শোন সেজ-বৌমা, দিবুর বিয়ে যদি দিতে

চাও, একটা পূজো-আচ্ছার ব্যবস্থা কর। আমি বলছি বিধুদেব ওর পাছু নিয়েছেন। আর তোমরা তো কী খাই, কী খাই, কী পরি, করে জীবনটাই কাটিয়ে দিচ্ছ।"

এই সময়ে দিবাকরের বন্ধু শঙ্কর এক দিন আমাকে বললে "কি দিদি, তোমরা কি দিবাকরকে ব্রহ্মচারী করে রাখবে স্থির করেছ নাকি?" শুনে আমার ত' রাগ হবারই কথা। বললাম, "রেখে দাও তোমার দিবাকরের বিবাহ। আমরা আত্মীয়-স্বজনরা কম করে একশ একষট্টিবার বিয়ের প্রস্তাব এনেছি, এবং প্রত্যেকটা হয় দিবাকরের মা, নয় দিবাকর নিজে ভেস্তে দিয়েছে। ওর আর বিয়ে টিয়ে হবে না, ওর যুগ্যি মেয়ে আজকাল তৈরীই হয় না।"

শঙ্কর বললে—"তোমরা আসল ব্যাপারটা কিছুই বোঝ নি। দিবাকরের এদিকে জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, আমাদের ব্রীজ ক্লাবে আজকাল তাস না খেলে কেবল দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে। এইজন্য কি ও বিলেতে সারি সারি বিড়ালাক্ষী সুন্দরীদের প্রত্যাখ্যান করে এসেছে? তাদের সব নাকি দুধে আলতায় গায়ের রং, রেশমের মত চুল, মুক্তোর মত দাঁত। যেমনি তারা দেখতে সুন্দর, তেমনি তারা কাজে পটু। আমাদের বাঙ্গালী মেয়েদের মতো নয় যে, একবেলা রাঁধবে তো ঝুলকালী মেখে একাকার। আহা। তাদের হাতে তৈরী সেইসব চপ্ কাট্‌লেট্ ডেভিল ওমলেট যেন কোন বিগত জীবনের স্মৃতি বলে মনে হয়। তাদের —" বাধা দিয়ে আমি বললাম, "এই সমস্ত কথা নিশ্চয় দিবাকর তোমায় শিখিয়ে দিয়েছে। দিবাকরকে বল এত বক্তৃতা করতে শিখেছে আর নিজের একটা বৌ জোগাড় করতে পারে না। ওর চেয়ে আমাদের চাকর ঘনশ্যাম ঢের ভালো, সে তিন বছরে দুটো দুটো বিয়ে করে ফেলেছে। বল দিবাকরকে।"

শঙ্কর ব্যস্ত হয়ে বলল,—"আহা, চট কেন দিদি, আমি বলছিলাম কি, ঐ রকম সময় ঠিক করে সাজিয়ে গুজিয়ে মেয়ে দেখালে, কোন জন্মে ওর পছন্দ হবে না। ও একটু রোম্যাণ্টিক্ কি না, একটু কবি কবি ধরণের, একটা ভালো পরিস্থিতি তৈরী করে, তবে মেয়ে দেখাতে হয়।"

আমি বললাম "আমার খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, শঙ্কর, দিবাকরের জন্য এখন পরিস্থিতি রচনা করি আর কি।"

শঙ্কর ভাবিত হয়ে সেদিনকার মত বিদায় নিল।

এই ঘটনার দিন পনেরো বাদে দিবাকর দিন দশেকের ছুটি পেয়ে শঙ্করদের সঙ্গে হাজারিবাগ বেড়াতে গিয়েছিল। আমি আবার যাবার সময় শঙ্করকে ঠাট্টা করে বলেছিলাম—"এবার রোম্যাণ্টিক পরিস্থিতি রচনার ঢের সুযোগ পাবে, শঙ্কর।"

সেজমামীমার মন খুঁৎখুৎ করছিল, পারলে উনিও সঙ্গে যান, কিন্তু শঙ্কররা

কেউ সে কথা উত্থাপন না করাতে, দিবাকর অনেক কষ্টে তাঁকে ঠেকাল।

দিবাকরের স্যুটকেস গুছিয়ে দিতে দিতে বারবার তাকে সেজমামীমা সাবধান করে দিলেন—"দেখিস বাবা চারিদিকে চোখ রাখিস। লোকের কথায় আবার যেন ভুলে না যাস। সুন্দর মুখ দেখলেই আবার ভেড়ু বনে যাস না। আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে কোনো বিষয়ে মন স্থির করবি না। শঙ্কররা ভালো লোক হতে পারে, কিন্তু দেখছিসই তো, আমার যাওয়ার কথা একবারও বলল না। অথচ ওদের সঙ্গে আমার আজ পঁচিশ বছরের জানাশোনা। কীই বা অসুবিধা হত আমি গেলে। দুবেলা দুমুঠো না হয় খেতাম, এক কোণায় পড়ে থাকতাম, কিছু এসে যেত না ওদের মত লোকের। তা একবার বললও না। আমার বাপু, একটা আত্মসম্মান আছে, আমি কেন বলতে যাব। নিশ্চয় ওদের কোন মৎলব আছে। খুব সাবধানে থাকবি।"

দিবাকর বিরক্ত হয়ে বলল—"আচ্ছা মা, বিলেতে তো তুমি আমার সঙ্গে যাওনি, সেখানে কে আমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করত বল দিকিনি। সেখান থেকে যখন অক্ষত শরীরে ও অবিবাহিত অবস্থায় ফিরেছি, তখন হাজারিবাগ থেকেও ফেরাটা আশ্চর্য নয়।"

হাজারিবাগ গিয়ে কিন্তু দিবাকর একটু অসতর্ক হয়ে পড়েছিল, সম্ভবতঃ দীর্ঘকাল সাবধানে থাকার ফলে একটু ক্লান্ত হয়ে গিয়ে থাকবে। বহু দূরে দূরে একা একা বেড়াতে চলে যেত। বাড়ী ফিরতে বেশ রাত হযে যেত। শঙ্কর এতে কোনো আপত্তি করত না, বরং খুসিই হত। কারণ দিবাকরের বিবাহ নিয়ে সকলে বিব্রত, শঙ্করের কথা অতটা কারো মনে হয় নি। সে বেচারার বিয়ে ঠিক করে দেবার জন্যে কারো বিশেষ আগ্রহও দেখা যায় নি। অবস্থা বুঝে শঙ্কর নিজেই নিজের একটা ব্যবস্থা করে ফেলেছিল। দিব্যি খাসা একটি মেয়ে আবিষ্কার করে বিয়ের কথা পাকাপাকি কবে ফেলেছিল। ঐ মেয়ের বাবার সুন্দর বাড়ি আছে হাজারিবাগে, সেখানে রোজ বিকেলে শঙ্করের চায়ের নেমতন্ন থাকে। প্রথম দু একদিন শঙ্কর দিবাকরকে সঙ্গে নিয়ে গেল। কিন্তু দিবাকর গিয়ে দেখল সেখানে দিবাকরের চেয়ে শঙ্করের আদর বেশী। আস্তে আস্তে দিবাকর সরে দাঁড়াল। লম্বা লম্বা বেড়াতে যাওয়া ধরল। রাত করে বাড়ি ফেরা ধরল।

এমনি একদিন বেড়াতে গেছে, বাড়ি ফিরছে বেশ রাতে, ফুটফুটে চাঁদের আলো, কি একটা বুনো ফুলের মিষ্টি গন্ধ। হঠাৎ দিবাকর থমকে দাঁড়াল। মনে হল নারীর ক্রন্দন শুনতে পাচ্ছে। বাতাসের সঙ্গে উঠছে পড়ছে। স্পষ্ট শুনতে পেল কোনো একটি মেয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদচে। দিবাকর ব্যস্ত হয়ে পড়ল। উদ্বিগ্নভাবে এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করতে লাগল। অবশেষে

কান্নার শব্দ অনুসরণ করে এক গাছতলায় উপনীত হল। সেখানে দেখতে পেল একটি রূপসী মেয়ে পা ছড়িয়ে বসে হাপুস নয়নে কাঁদছে।

মেয়েটির বয়স মনে হল সতেরো আঠারো হবে। একরাশি কালো কোঁকড়া চুল আলগোছে বাঁধা। পরনে তার বাসন্তী রঙ্গের শাড়ি, কপালে একটি কুমকুমের টিপ। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে দিয়ে টুকরো টুকরো চাঁদের আলো তার সর্বাঙ্গে এসে পড়েছে।

দিবাকর মহা বিপদে পড়ে গেল। কি যে করবে ভেবে না পেয়ে বার বার ঢোক গিলে গিলে তাব পেট ঢাক হয়ে এল। মেয়েটি এক মুহূর্তেব জন্য কান্না থামিয়ে, বেশ ভালো কবে তার মুখখানা দেখে নিয়ে, আবাব নিবিষ্ট মনে কাঁদতে লাগল। তখন দিবাকব ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কি হয়েছে, ব্যাপার খুলেই বল না, মিছিমিছি অত চেঁচাচ্ছ কেন ?"

মেয়েটি এবার সত্যি সত্যি কান্না থামিয়ে একটু যেন রেগেই বলল—"মোটেই মিছিমিছি নয়, যথেষ্ট কাবণ আছে।"

দিবাকর বললে—"যথেষ্ট কারণ আবার কি ?"

তখন মেয়েটি ডুকবে কেঁদে বললে—"তোমাব মামা যদি ভুঁড়িওয়ালা সোনা তালুকদারের সঙ্গে তোমার বিয়ে ঠিক করত, তাহলে তুমিও এর চাইতে ঢের জোরে চেঁচাতে।"

শুনে দিবাকরের ভারী দয়া হল, একটু বাগও হল, বলল,—"আমি যদি এক বছরে একশ সাতান্নটা বিয়ের সম্বন্ধ পণ্ড করে দিতে পারি, তুমি ঐ সামান্য একটা ভুঁড়িওয়ালা সোনা তালুকদারকে মেরে তাড়াতে পার না ?"

মেয়েটি তাই শুনে মাথা নেড়ে বললে,—"সোনা তালুকদার যে মামাবাবুর ছোট বেলাকার বন্ধু, তাকে মেরে তাড়ালে সে কি মনে কববে ?"

দিবাকর বললে,—"তাহলে পষ্টাপষ্টি বলে দাও ও সব হবে না।"

"সেই না বলতে গিয়েই তো মুস্কিল হল। আমার নিজের বলতে লজ্জা করল বলে আমাদের ছোকরা চাকরকে দিয়ে বলে পাঠালাম। তাই নিয়ে বাড়িশুদ্ধ সে কি হৈ চৈ! ওঁরা নিজেরা ওকে দিয়ে কত কাজ করিয়ে নেন্, তার বেলা কিছু হয় না, আর আমি একটু দরকাবী কথা বলে পাঠিয়েছি, অতে মামাবাবু মামীমা সব রেগেমেগে, আমাকে বকেটকে ঘরে বন্ধ করে রেখে দিলেন। সারাদিন আমি ঘরে বন্ধ ছিলাম, তারপর বিকেল বেলা জানলা দিয়ে বেরিয়ে পালিয়ে গেলাম। আর আমি ও বাড়িতে ফিরব না। শুধু যে জোর করে বুড়োর সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চায় তা নয়, আমি একটু আচার খেলে সবাই রাগ করে।"

নিজের দুঃখের কথা বলতে বলতে মেয়েটি আবার কাঁদতে লাগল। দিবাকর ভাবলে এত চোখের জল রাখে কোথায়? ব্যস্ত হয়ে বললে,—

"আহা, আর কেঁদনা, আর কেঁদনা, এখানে যে একটি ছোটখাট দামোদর রচনা করে ফেলছ। এখন কি করতে চাও তাই আমাকে বল।"

মেয়েটি বল্লে,—"কিছু করতে চাই না, পালিয়ে যেতে চাই, যেদিকে দু চোখ যায় সেদিকে চলে যেতে চাই। আমার পা ব্যথা করছে ব'লে একটু বিশ্রাম করছি।"

বলে সে উঠে পড়ে। দিবাকর উদ্বিগ্ন হয়ে বলে—"এই সন্ধ্যেবেলা এই বন-জঙ্গলে কোথায় যাবে? তার চেয়ে বরং এক কাজ কর, আমার সঙ্গে আমাদের বাড়িতে চল। সেখানে গিয়ে সবাই মিলে পরামর্শ করা যাবে তুমি কোথায় যাবে। ঐ ভুঁড়িওয়ালা সোনা তালুক-দারের সঙ্গে যে তোমার বিয়ে হতে পারে না, এটা নিশ্চিত। এখন চল তো।"

অগত্যা মেয়েটি রাজী হল। দিবাকর তাকে শঙ্করদের বাড়ি এনে তুলল। তার করুণ কাহিনী শুনে শঙ্করের মন গলে যাওয়া তো স্বাভাবিকই। শঙ্করের মাও তাকে আদর করে থাকবার যায়গা দিলেন। দিবাকর বারবাব বলতে লাগল যে, পাঁচ দিন পবে কলকাতায় গিয়ে সে যা হয় একটা ব্যবস্থা করে দেবে।

মেয়েটির নাম মিনু, চমৎকার রাঁধে, বেড়ে গানের গলা, শরীরে কোথাও একটু রাগ নেই, বেশ মেয়ে।

মনে মনে দিবাকরের ভীষণ সাহস বেড়ে গেল। ভাবল, কলকাতায় নিয়ে গেলে মা যদি খেঁচাখেঁচি কবেন তো মাকে বলব—"কি বলছ। জান, আমার প্রায় ছাব্বিশ বছর বয়স, আমি সাড়ে পাঁচশ টাকা মাইনের চাকরি করি, আমাদের আপিসের লোকরা আমাকে কত খাতির করে, দেখলেই সেলাম করে, আর তুমি আমাকে এই রকম তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কর, ও সব চলবে না।"

আবার ভাবে, নাঃ একটা সাপোর্ট দরকার, পাশে একটা লোক চাই। ভেবে আমাকে এক লম্বা চিঠি দেয়, তাইতেই তো আমি এত কথা জানতে পারলাম। লিখলাম, মিনুকে আমার কাছে নিয়ে আসিস, আমাদের পাড়ার গার্লস্ স্কুলের হেডমিস্ট্রেস্ করে দেব, নয়তো মেয়ে পুলিসে ঢুকিয়ে দেব, নিদেন পাটনায় আমার জানা খুব ভালো ভালো চাকরি আছে, তার একটা জুটিয়ে দেব। তুই নির্ভয়ে নিয়ে আয়।

আমার বাড়ীর লোকেরা তো ভীষণ আপত্তি করতে লাগল। ঐ দিবাকরের ব্যাপারে নাক ঢুকিয়ো না বলছি, শেষটা তোমাকে পস্তাতে হবেই। তখন আমাদের টেন না।

আমার চিঠি পাবার দু একদিন বাদেই দিবাকর এসে উপস্থিত। যেন একটু চিন্তিত মনে হল। বললাম—"এনেছিস্?"

"কী এনেছি? কিছু আনবার কথা তো বল নি।"

"ন্যাকা! আরে সেই মিনুকে এনেছিস্? ডিব্রুগড়ে একটা খুব ভালো চাকরি খালি আছে।"

দিবাকর বললে,—"তোমার কাছে দুদিন রাখতে যদি তোমার এতই অসুবিধা হয় যে, দিল্লী লাহোরে চাকরি খুঁজে বেড়াতে হচ্ছে, তা হলে সে কথা স্পষ্টই বললে হয়।"

আমি তো অবাক্। "সে কি রে! দিবাকর, রেগে যাচ্ছিস মনে হচ্ছে? তুই তাকে আন তো, তারপর যা হয়।"

দিবাকর চিন্তিত ভাবে বাড়ি চলে গেল।

তারপর বহুদিন দিবাকরের দেখা নেই। একদিন সন্ধ্যেবেলা সেজমামীমা এসে কেঁদে পড়লেন—"দিবু আমার বাঁচবে না। খাওয়া-দাওয়া, সিনেমা দেখা ছেড়ে দিয়েছে। সারাক্ষণ ভ্রূকুটি করে বসে থাকে। ঐ শঙ্করদের বাড়িতে মিনু বলে কাকে দেখে এসেছে। বেশ বাবা, সেখানেই বিয়ে হক, ঘরে বৌ এলেই আমি খুসি। শঙ্করকে একবাব জিজ্ঞাসা করিস মেয়েটির সাইজটা কি রকমের, বালাটাকে আবার কেটে—"

বলতে বলতে শঙ্কর সশরীরে এসে উপস্থিত,—"কি দিদি, কি খবর? আরে মাসিমা যে? দিবাকর কেমন আছে? এবার যে বাড়িতে রসুনচৌকী বসাবার দরকার হবে মনে হচ্ছে!"

দিবাকর নাকি তাকে লম্বা চিঠি লিখেছে, এখন সেজমামীমা মত করলেই হল। মেয়ে খুব ভালো, চমৎকার পরিবার, মাসিমার নিশ্চয়ই পছন্দ হবে, এ কথা শঙ্কর জোর ক'রে বলতে পারে।

সেজমামীমা চোখ মুছে এক গাল হেসে বললেন,—"তা হলেই ভালো। দিবাকরের যে পছন্দ হল এই আশ্চর্য।"

"আশ্চর্য? আশ্চর্য আবার কিসে? সাক্ষাৎ আমার আপন মাসির মেয়ে! শিখিয়ে পড়িয়ে তাকে হাজারিবাগ নিয়ে যাওয়া! দিবাকরের পছন্দ হবে না মানে? ওব বাবার পর্যন্ত —যাক্ গে মাসিমা, বালাটা কাটাতে হবে না, মেয়ে প্রমাণ সাইজের।"

বিড়ম্বনা

পঞ্চান্ন বছর আগেকার মানুষদের চিত্তবৃত্তির সঙ্গে বর্তমানকালের মানুষদের চিত্তবৃত্তির যে বিন্দুমাত্র প্রভেদ নেই তার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সেই সময় আমার মায়ের রমেশদাদা বিলেত থেকে চিকিৎসা-শাস্ত্রের উচ্চ উপাধি এবং উদার ভিক্টোরীয় মতামত নিয়ে দেশের মাটিতে পদার্পণ করবামাত্র তাঁর নেশার ঘোর ছুটে গিয়েছিল। বন্দরে তাঁর পূজনীয় পিতৃদেব ও অন্যান্য সুহৃদ্‌বর্গ উপযুক্তভাবে চোগাচাপ্‌কান পরিহিত হয়ে, তার দিয়ে গাঁথা খোঁচা খোঁচা ফুলের মালা হাতে আগ্রহে অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। প্রথমেই আত্মীয়-স্বজনদের ঘোরতর কৃষ্ণ বর্ণ রমেশ দাদার হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশে গিয়ে আঘাত করল। আত্মীয়-স্বজনের রূপের গর্ব কোনও দিনই ছিল না বটে, কিন্তু তাঁদের সৌন্দর্যের এমন নিদারুণ অভাব আগে কখনো রমেশদাদার দৃষ্টিগোচর হয় নি। তার উপর বড়কাকা মেজকাকার গাল-ভরা পান থেকে আনন্দের আতিশয্যে খানিকটা করে রস বেরিয়ে কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। রমেশদাদা শিউরে উঠে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

কলকাতায় ফিরে এসে নিজের ঘরে নব-নির্মিত দেয়াল-আলমারিতে বিচিত্র রকমের ছুঁক্‌কাটা সরু সরু পা-ওয়ালা পেণ্টেলুনগুলিকে ঝুলিয়ে রাখতে রাখতে রমেশদাদা নিজেকে বারংবার ধিক্কার দিতে লাগলেন। ভিক্টোরীয়-যুগের উদারপন্থীরা গুণের আদর জানেন না তাঁর আচরণ দর্শনে এ অপবাদ যেন কেউ না দেয়; আর রমেশদাদার বাপ-জ্যাঠারা ঘোরতর নেটিভভাবাপন্ন হলেও, সকলেই উচ্চশিক্ষিত ও উপার্জনক্ষম এ-কথা তাঁর মনে রাখা উচিত। এমন কি তাদের বাড়ির মেয়েরা পর্যন্ত বেথুন কলেজের কৃতী ছাত্রী।

কিন্তু তাদের কোমরে কাপড় জড়িয়ে, রান্নাঘরের সামনের বারান্দায়, সারি সারি বসে, থালা থালা ভাত খাওয়া দেখে অবধি রমেশদাদার চিত্ত বিরূপ হয়ে উঠেছিল। কিবা তাদের উচ্চহাস্য, কিবা তাদের রঙ্গ-রসিকতার ছিরি! বিরক্ত হয়ে প্রস্থানোদ্যত রমেশদাদা বললেন—"বিয়ে ছাড়া কি তোদের কোনো চিন্তা নেই? লেখাপড়া শিখিস কেন? জানিস বিলেতের মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলে? এলিজাবেথ ফ্রাইএর নাম শুনেছিস কখনো? ছিঃ, কতকগুলো বই গিললে কি হবে, যে অন্ধকারে ছিলি সেই অন্ধকারেই আছিস।" তাই শুনে মেয়েরা হেসেই আকুল, আর রমেশদাদার রক্তিমমুখে স্থানত্যাগ।

পরে মেজকাকার মেয়ে ঠুলি গিয়ে খানিকটা তর্ক করে এল। আমরা না হয় সাজতে-গুজতে পারি না, একটু হিঁদু-প্যাটার্নের, তাই বলে যে আমাদের দেশেও স্মার্ট মেয়ে নেই, এ-কথা স্বপ্নেও ভেব না। আমাদের নেলি ডে কে দেখলে তোমার চক্ষু ছানাবড়া হয়ে যাবে। কোথায় লাগবে তোমার বিড়ালাক্ষী ল্যাণ্ডলেডির মেয়ে! নেলি মেমদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়, পিয়ানো বাজানো শেখে মিস্ ক্রুর আছে; রোজ রাত্রে হাজার ক্লান্ত হলেও তিনকোণা সব কাগজের টুকরো দিয়ে সমস্ত চুলগুলোকে পাকিয়ে পাকিয়ে তবে শোয়, সকালে তাই আঙ্গুরের গোছার মতো দেখতে হয়। ওর বাবা মস্ত ব্যারিষ্টার, সব রকম আদব-কায়দা জানে ওরা, শনিবারের পার্টিতে দেখ, মুণ্ডু গুলিয়ে যাবে।

কিন্তু শনিবার নেলিদের বাড়ির গার্ডেনপার্টি থেকে প্রত্যাগত রমেশদাদা, কান অবধি উঁচু, পীজবোর্ডের মতো শক্ত, বরফের মতো সাদা কলারখানির সামনের বোতাম ঢিলে করতে করতে নাসিকা উত্তোলন করে বললেন—"রেখে দে তোদের নেলি ডে। দেখতে চলনসই হতে পারে, কিন্তু একেবারে ওয়ার্থলেস! ক্রোকে খেলবে কি, পাছে পায়ের কব্জি অবধি কাপড় উঠে গিয়ে কালো মোজার একটুখানি দেখা যায়, তাই লজ্জাতেই উনি মরে গেলেন। উঃ, কি ন্যাকা এ দেশের মেয়েরা হতে পারে! জানিস, ওখানে ঐ নেলির চেয়েও বড় বড় মেয়েরা কালো মোজা পায়ে দিয়ে হাঁটুর নীচে আঁটা নেভিব্লু ব্লুমার পরে, পুরুষদের সঙ্গে সাইকেল চড়ে বেড়াচ্ছে। জানিস, দু জনে একসঙ্গে চড়বার সাইকেল পাওয়া যায়, সেই নিয়ে সব সুন্দর সুন্দর গান পর্যন্ত রচনা হয়েছে - - - -"

ঠুলি অবাক্ হয়ে বলল—"ব্লু ব্লু-মার কি জিনিষ?" রমেশদাদা কোনো উত্তর না দিয়ে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে প্রস্থান করলেন। এ দেশের মেয়েদের মূর্খতার তল পাওয়া দায়।

বলা বাহুল্য অনতিবিলম্বে সরকারী হাসপাতালে রমেশদাদা উচ্চপদ তো লাভ করলেনই, উপরন্তু প্রাইভেট প্র্যাক্টিসেও তাঁর সুনাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই, কারণ ডাক্তারীতে যশ লাভ করবার জন্য যে সকল গুণাবলীর প্রথম প্রয়োজন, প্রকৃতিদেবী তার কোনটা থেকেই রমেশদাদাকে বঞ্চিত করেন নি। যথা দীর্ঘ দোহারা গড়ন, ঘন পল্লবিত চক্ষুদ্বয়, কোমল স্পর্শ ও সুগভীর কণ্ঠ।

দেখতে দেখতে সে-কালের অতি আধুনিক নারী-সমাজে রমেশদাদার প্রতিপত্তি এমন বেড়ে গেল যে, শীঘ্রই তিনি অবিবাহিত পুরুষ জাতির চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়ালেন। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করতে হলে এটুকুরও প্রয়োজন হয়, নতুবা নিরবু কৃতকার্যতার ফলে এমন একটা আত্মপ্রসাদ জন্মাবার

আশঙ্কা থাকে, যাতে ইংরিজিতে যাকে বলে "মোরাল" (শোনা যায় নেটিভদের সেটা থাকে না বলে তার উপযুক্ত বাংলা খুঁজে পাওয়া দায়।) সেটা নষ্ট হবার সম্ভাবনা হয়। বিধাতার আশীর্বাদে রমেশদাদা এ ফাঁড়াটাও নিজের অজ্ঞাতসারেই কাটিয়ে উঠলেন।

আমার পূজনীয়া মাতৃদেবীর মুখে বহুবার শুনেছি যে এই সাফল্য কিন্তু অনাত্মীয়া এবং বয়স্কা আত্মীয়দের মধ্যে যেরূপ দৃঢ়মূল হয়েছিল, তরুণী আত্মীয়াদের মধ্যে তেমন হয় নি। তার কারণও অবশ্য ছিল।

দিশী নারীদের প্রতি ক্রমবর্ধিষ্ণু ঘৃণা বাইরে গোপন করতে সক্ষম হলেও, বাড়ির মধ্যে পদে পদে সেটা প্রকাশ পেত। বহির্জগতে কিন্তু তিনি যেখানেই বিচরণ করতেন নবীনাদের হৃদয়ে নিদারুণ একটা শিহরণ সঞ্চার করতে থাকতেন, আর সেই শিহরণ সম্বন্ধে নিজে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন বলেই দুর্লভ মরকত মণির মতোই তাদের কাছে পরম কাম্যবস্তু হয়ে উঠেছিলেন।

সেকালের ফ্যাসানেবল্ সমাজের সুশিক্ষিতা নারীকুল তাঁকে দর্শনমাত্রেই প্রজাপতির মত চঞ্চলা হয়ে উঠতেন, বয়স্কারা কন্যাদের ভবিষ্যতের সুখের দিকে দৃষ্টি রেখে আত্মসম্মান বিস্মৃত হয়ে নানাবিধ চাটুবাদে তাঁর কান ঝালাপালা করে তুলতেন, আর বহু তরুণী রুগিণী, রমেশদাদা তাঁদের হাতের নাড়ী স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গেই একটি-মাত্র চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, নানা রকম অতি প্রশংসনীয় সুললিত ভঙ্গিমাসহকারে, ভির্মী যেতেন। আশ্চর্যের বিষয়, এতে ঘৃণা প্রকাশ দূরে থাকুক, অতিশয় সহানুভূতিপূর্ণ সুগম্ভীর নিম্নকণ্ঠে তাঁদের কপালে ভিনিগারমিশ্রিত জল দেবার ও নাকের সামনে পাখির পালক পোড়াবার নির্দেশ এবং পরদিন পুনরায় আগমন করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, সলজ্জভাবে দর্শনীর টাকাগুলিকে পকেটস্থ করে ধীর পদক্ষেপে রমেশদাদা গিয়ে তাঁর দুটি বাদামী রংএর টাট্টু ঘোড়ায় টানা, উজ্জ্বল হলুদে চাকাবিশিষ্ট ব্রুহাম গাড়িতে চড়ে যথাস্থানে গমন করতেন।

যদিও তরুণী আত্মীয়ারা মহামান্য গোল্ডস্মিথের ও লর্ড টেনিসনের গ্রন্থাদি মনোযোগ দিয়ে পাঠ করার ফলে পুরুষ জাতের বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রবঞ্চনা-পরায়ণতা সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল না, তবু রমেশদাদার এই দৈনিক প্রতাবণাটা ক্রমশঃ তাদের কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। বিশেষ করে নৈশ-ভোজনের পর, ঘড়ির দিকে এক চোখ নিবদ্ধ করে যখন রমেশদাদা দিশী মেয়েদের অসারতা নিয়ে নানারকম বিদ্রূপ করতেন।

"এঁরা নাকি আধুনিকা হয়েছেন! আরে, সেখানে মেয়েরা রাজ্যশাসন করে, মিষ্টার গ্ল্যাডষ্টোনের মত তেজী পুরুষকে পোষ মানায়, জেলে গিয়ে দেখে আসে কোথায় কি অত্যাচার হচ্ছে, যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে নিজের হাতে আহতের সেবা করে, ভোট আদায় করবার জন্য পুলিশ

ঠ্যাঙায়, ঢিল ছোঁড়ে! একশ বছর তাদের চরণামৃত খেয়ে দেখ, যদি তোদের কিছু হয়!" এর উত্তরে মৈত্রেয়ী-গার্গীর নাম করতে গেলে, রমেশ দাদা এমন কাষ্ঠ-হাসি হাসতেন যে, শেষ পর্যন্ত সে সকল পন্থা ছেড়ে দিতে হয়েছিল।

এমন সময় রমেশদাদার সহকর্মিণীরূপে ডাক্তারী পাশকরা এক মহিলা নিযুক্ত হলেন। খবর পাবামাত্র ক্রুদ্ধ হয়ে রমেশদাদা সরকারের কাছে অনেক লেখালেখি করলেন, কিন্তু এ বিষয়ও সে কালের সঙ্গে এ কালের সুগভীর সাদৃশ্য থাকায়, উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা সেই সব চিঠিপত্র না পড়েই টেবিলের তলাকার তারের তৈরী বাজে কাগজের টুকরিতে নিক্ষেপ করে একযোগে সময় সংক্ষেপ ও মানসিক শান্তিরক্ষা সাধন করলেন। এবং যথাকালে সৌদামিনী সরকার লম্বা-হাতা ও উঁচু গলাযুক্ত সাদা জ্যাকেট্ ও সাদা লেসের পাড়যুক্ত সাদা-সাড়িতে আঁটসাঁট করে লম্বা একটা সোনার সেফটিপিন লাগিয়ে, কালো মোজা ও মাঝারি গোড়ালির কালো জুতো পরে, কালো ব্যাগ হাতে রমেশদাদার সঙ্গ নিলেন।

তাঁকে দর্শনমাত্রেই যে রমেশ দাদার পিত্তি জ্বলে যাবে, সেটা অনিবার্য। সৌদামিনী সুন্দরী না অসুন্দরী, বুদ্ধিমতী না ইডিয়ট্, উগ্র প্রকৃতির না কোমল-স্বভাবা, সে সব কিছুই রমেশ দাদার নজরে পড়ল না, কারণ কলকাতা থেকে সদ্য পাশ করা একজন শ্যামাঙ্গী মেয়ের পক্ষে তাঁর মত উজ্জ্বল রত্নের সহকর্মিনী-রূপে নিযুক্ত হওয়ার ধৃষ্টতা তিনি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছিলেন না। একটা ছোট নমস্কার করেই খাতাপত্রের মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে পড়তে চাইছিলেন, কিন্তু মেয়েটি সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকাতে চোখ তুলে চাইতে হল। সে ঘন-ছায়ায় ঘেরা জলভরা পুষ্করিণীর মত চোখ দিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে, নীরস কণ্ঠে বললে—"এই ডিপার্টমেণ্টে বড্ড অপব্যয় হয় বলে রিপোর্ট আছে। আমাকে অবসর সময়ে সে বিষয়ও তদন্ত করবার ভার দেওয়া হয়েছে।"

রাগে রমেশদাদার মুখমণ্ডল রাঙ্গা হয়ে উঠল, কি একটা উচিত কথা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সৌদামিনী ক্ষণমাত্র অপেক্ষা না করে পাশের ঘরের দু তিনটে অনাবশ্যক গ্যাস্ জেট্ নিবিয়ে দিয়ে, আলমারীর যন্ত্রপাতির সঙ্গে নিজের হাতের তালিকা মিলিয়ে দেখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

সেদিন থেকে হাসপাতালের কাজের সব সুখ বিদায় নিল। মহিলা একদিনও কামাই করেন না, কাজের কখনও ত্রুটি হয় না, নতুন পাশ-করা বিদ্যার কখনও ভুল হয় না, দেহে কোনও কোমলতা বা ক্লান্তি প্রকাশ পায় না, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাক্যব্যয়ও করেন না। মনের শান্তির জন্য একটু ধূমপান করাও অসম্ভব, কারণ মহামতি ভিক্টোরিয়ার রাজ্যে কোনো নারীর সামনে যারা ধূমপান করে

তাদের মতো উচ্ছৃঙ্খল পুরুষ-মানুষ সমাজে অচল এ-কথা সকলেই জানে।

তার উপর কাজকর্ম নিয়ে নিয়ত ছোটখাট খিটিমিটিও লেগেই থাকত। রমেশদাদা চটে গিয়ে উচ্চকণ্ঠে কথা বললেও সৌদামিনী গলাও তুলত না, কিন্তু পরাজয়ও স্বীকার করত না। বলা বাহুল্য, রমেশ দাদার অব্যবস্থার জন্যই এরূপ পরিস্থিতি হত।

বাড়িতেও যে এ বিষয়ে আলোচনা করে মনটা লঘু কবে নেবেন তার উপায় ছিল না। কারণ প্রথম দিনই ঠুলি সম্প্রদায় খুসি হয়ে বলেছিল—— "এঁ্যা! লেডি-ডাক্তার। ঠিক হয়েছে, এবার উচিত সাজা হয়েছে। আমাদের দেশের মেয়েরা না কাজের হয় না! এবার দেখ।"

বাস্তবিক সৌদামিনীর মধ্যে নারীসুলভ কোনও লালিত্যই ছিল না, একাকিনী ঠিকা গাড়ি করে নির্ভয়ে যাতায়াত করত। রাত্রে কেস্ থাকলেও, ব্যাগ হাতে, যথাসময়ে হাজির থাকত। মাঝে মাঝেই বাইরেও কেস্ থাকত, তখন নিজেই সেখানে উপস্থিত হত, রমেশ দাদার সাহচর্য প্রার্থনা করত না। সৌদামিনীর এই স্বাবলম্বী স্বভাব দেখে খুসি হওয়া দূরে থাকুক, রমেশদাদার যুক্তিবিহীন রাগ হত।

বিলেতেও বহুবার একথা শুনেছিলেন যে যথাযোগ্য হিসাবমত স্বাধীনতা ভালো জিনিষ হলেও, অতিশয় স্বাধীনতাপ্রিয়তা আবার উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দেয়। তাছাড়া নারীজীবনে উচ্চ আদর্শ থাকা বাঞ্ছনীয়। বিদ্যা-শিক্ষা করা ভালো, কিন্তু তাই বলে চাকরিবাকরি করা অর্থাৎ অর্থের বিনিময়ে নিজের বিদ্যা বিলিয়ে দেওয়ার মধ্যে এমন একটা মলিন ভাব আছে, যার সঙ্গে কেবলমাত্র------নাঃ, আবার সঙ্কীর্ণমনা হয়ে যাবার আশঙ্কাও আছে।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে মানুষের মন, বিশেষ করে পুরুষ মানুষের মন বাতাসে নড়ে। বৃহৎ বৃহৎ সঙ্কল্প চুল পরিমাণ কারণে অভাবনীয়রূপে পরিবর্তিত হয়। কাজে কাজেই যতই রমেশদাদা সৌদামিনীকে দেখেন ততই তাঁর চিত্ত নেলি ডে ও তার সখীদের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকল। তাঁকে ঘিরে ফিরে লোকমত গুঞ্জন করতে থাকল। ঠুলিরা মহাখুসি।

বুদ্ধি করে এই সময়ে নেলি ডেকে কি এক রহস্যজনক দুরারোগ্য ব্যামোয় ধরল। তার চোখের কোলের নীল ছায়া গভীরতর হয়ে উঠতে লাগল, আহারে বিহারে অরুচি দেখা দিল, কপালের উপর চূর্ণ কুন্তলগুলি রাতে সত্যি সত্যি, ঠুলি যেমন বলেছিল, তিন কোণা কাগজের টুকরোয় আবদ্ধ থাকত কি না জানা গেল না, কিন্তু দিবাভাগে তারা যে ঈষৎ লালচে আভা ধারণ করে বারংবার বাতাসে আকুলি বিকুলি করত তার সাক্ষ্য স্বয়ং ডাক্তার সাহেব দিতে পারতেন।

তখন তার নীলাভ শিরার রেখাঙ্কিত সোনার বরণ হাতখানি ধরে বহু সহস্র মাইল দূরে অবস্থিতা পিঙ্গলনয়নাদের ভুলে যাওয়াও এমন কিছু কঠিন ব্যাপার বলে বোধ হত না।

সেকালে এই রোগকে "ডিক্লাইন্" বলত, এবং এর ফলে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হত কিনা জানি না, তবে অবোধ্য কারণে যে আক্রান্ত হত এবং অস্ফুট কারণে পুনরায় সুস্থতা লাভ করত এটা নিঃসন্দেহ। সকলেই নেলি ডের উপস্থিত বুদ্ধির অপর্যাপ্ত প্রশংসা করতে এবং তিক্ত চিত্তে সুখবরের প্রত্যাশা করতে লাগল।

মাঝে মাঝে রমেশদাদা অতিশয় ব্যস্ত থাকলে সৌদামিনীকে নেলি ডের পরিচর্যার জন্য পাঠিয়ে দিতেন। ইতঃপূর্বে নেলি কখনও কালো লেডি ডাক্তার চোখে দেখেনি, তাই বিস্ময় বিস্ফারিত লোচনে তার দিকে চেয়ে রইল। তারপর সুগঠিত নাসাখানি ঈষৎ কুঞ্চিত করে জিজ্ঞাসা করল "যেখানেই আপনাকে ডাকে, ঠিকা গাড়ী চেপে সেখানেই আপনাকে যেতে হয়?" মৃদু হাস্য করে সৌদামিনী নেলির বগলে থার্মমিটার গুঁজে বললে—"তা যেতে হয় বৈকি। বরং না ডাকলেই মুস্কিল।"

নেলি বলল—"আচ্ছা, সকলের কাছ থেকে টাকা নিতে একজন 'লেডির' লজ্জা করে না?" সৌদামিনী পুনরায় হেসে বললে—"আহা, যারা টাকা নেয় তারা 'লেডি' হ'তে যাবে কেন?"

অধিকতর বিস্মিত হয়ে নেলি শুধোল—"লেডি না, তবে তারা কী?" সৌদামিনী বলল—"তারা অর্ডিনারি নারী।"

ঠাট্টা করছে কি না দেখবার জন্য নেলি একবার সৌদামিনীর মুখের দিকে চেয়ে দেখল, চোখের কোণে একটু মৃদু কৌতুক ছাড়া কিছু দেখতে পেল না।

তাই নিয়ে অনেক কথাও হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অসামাজিক আচরণের জন্য রমেশদাদা সৌদামিনীকে অল্প একটু ভর্ৎসনাও করেছিলেন, বলেছিলেন—"ওরকম কোমলস্বভাবা মেয়েদের প্রতি রূঢ় ভাষা প্রয়োগ করলে আর প্রাইভেট্ প্র্যাক্টিস্ জমান যায় না, তুমি কি এতই অনভিজ্ঞা যে তাও বুঝতে পার না? টাকাপয়সার মত বৈষয়িক জিনিষ নিয়ে ওদের কোনও কারবারই নেই।" সৌদামিনী বিরক্ত হয়ে বললে—"টাকা পয়সা দিয়ে যেসব জিনিষ কেনা যায়, তার সঙ্গে তো যথেষ্ট কারবার আছে দেখলাম। নীল স্যাটিন দিয়ে বাঁধানো কৌচে শুয়ে, নীল স্যাটিনের গোল গদির উপর পা রেখেছে দেখলাম।" রমেশদাদা চোখ তুলে বললেন, "গোল গদি আবার কি? ওকে "পুফে" বলে, সব কায়দাদুরস্ত লোকদের ড্রইংরুমেই আছে।" সৌদামিনী সহসা হাতের গেলাসটি এমন জোরে নামিয়ে রাখল যে সেটি তৎক্ষণাৎ ভেঙ্গে চৌচীর হয়ে গেল। রমেশদাদা অল্প একটু হেসে পুনরায় কাজে মন দিলেন।

ততদিনে বৎসরাধিক কেটে গেছে। রমেশদাদার বাবা পুত্রকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে স্পষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করলেন সে কোনো ইংরেজ কন্যার সঙ্গে প্রণয়াবদ্ধ কি না। রমেশদাদা অস্বীকার করলেন।

কথাটা ঠুলিদের কানে গেলে, তারা ক্রুদ্ধ হয়ে বললে "তবে আবার অত পুরু পুরু নীল খামে ঘন ঘন চিঠি আসে কেন?" রমেশদাদা বললেন "তোদের আর কী বলব। তোরা স্ত্রীপুরুষের মধ্যে ঐ একটা সম্বন্ধ ছাড়া কিছু ভাবতেই পারিস না।" ঠুলির বড় বোন দুলি বললে" "কী একটা সম্বন্ধ? তোমারও যা বুদ্ধি! আমাদের হাজার রকম সম্বন্ধ আছে, দেওর, নন্দাই, ভাসুরপো, তাঐ মশায়"—রমেশদাদা বললেন—"আহা, সম্পর্কের কথা বলছি না, ব্যক্তিগত সম্বন্ধের কথা হচ্ছিল, যাকে বলে নিষ্কাম বন্ধুত্ব। সে সব তোমরা বুঝবে না। হাজার লেখাপড়া শেখ।" ঠুলি ডেকে বলল—"আর বেচারী নেলি ডেও কি ঐ নিষ্কাম বন্ধুত্বের কথা জানে না কি?"

এই সময় নেলি ডে ভুগে ভুগে স্বর্ণলতাটির মত হয়ে সহসা একদিন সেরে উঠতে আরম্ভ করল। নিন্দুকরা বলতে ছাড়ল না যে রমেশদাদার স্থানে সৌদামিনীর ঘন ঘন আগমনই তার সুস্থ হওয়ার একমাত্র কারণ।

এদিকে বছর ঘুরে বসন্তকাল এসেছে। কৃষ্ণচূড়া গাছে ফুল ধরেছে, আমগাছে বোল ধরেছে, কোথা থেকে সব কোকিলরা এসে মহা মাতামাতি লাগিয়েছে, এমন সমম একদিন কালো ব্যাগ হাতে সৌদামিনী গিয়ে বাগানে আসীনা নেলি ডের কৌচের পাশে উপবিষ্টা হল। হাতে একছড়া সাদা ফুল নিয়ে নেলি ফিকে নীল জাপানী রেশমের সাড়ি পরে আলগোছে শুয়ে ছিল।

সে অবাক হয়ে সৌদামিনীর মধ্যে কি একটা অস্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করল, মনে হল যেন কানের কাছে কতকগুলি চুল অসংযত হয়ে উঠেছে, চোখের দৃষ্টিতেও বাচ্চা ঘোড়ার মত একটা উদ্‌ভ্রান্ত অবাধ্য ভাব। নেলির অমনি বুক টিপ টিপ করে উঠল, সে চারিদিকে অসহায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগল। হায়, ফুল বাগানের এই নিভৃত কোণে, আমগাছের ছায়ায়, আর কেহ নেই।

সৌদামিনী ব্যাগ খুলে থার্মোমিটার বের করে কঠিন কণ্ঠে বলল—"আর কতদিন চালাবেন? আপনি খুব ভাল করেই জানেন আপনার কিছু হয় নি।" নেলির অস্ফুট আর্তনাদ শুনে তার মা ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলেন—"কী হয়েছে, নেলি? মিস্ সরকার, কী হয়েছে?" সৌদামিনী বললে—"কিছুই হয় নি, সেই কথাই বলছিলাম। আপনার মেয়ের আমার চেয়েও ভাল স্বাস্থ্য।"

তাই শুনে মিসেস ডে'র মুখখানি কঠিন হয়ে উঠল, "কিসে আর কিসে বাছা।

চাকরি করে খাও, এরকম উদ্ধত আচরণ তো শোভা পায় না। যাও, এখন যাও, ডক্টর চৌধুরীকে বল এবার থেকে যেন তিনি নিজেই আসেন। তোমার মতো অভদ্র মেয়েমানুষকে এবাড়িতে মানায় না।" নেলিও রেগে, উঠে এসে, সৌদামিনীর গালে ঠাস করে এক চড় কষিয়ে দিল। সৌদামিনীও উলটিয়ে নেলির গালে সজোরে চপেটাঘাত করেই, সামনে চেয়ে দেখে রমেশদাদাও কখন এসে দাঁড়িয়েছেন।

"আহা নেলি, অত উত্তেজিত হ'লে চলবে কেন? মিসেস্ ডে, আপনিও যদি ওরকম করেন তা'হলে আপনার মেয়ের নিশ্চয়ই ফিট হবে। আসুন, এই স্মেলিং সল্টটা ওর নাকের সামনে ধরুন তো।"

সৌদামিনী তখন শূন্যে নাক তুলে কালো ব্যাগটা দৃঢ়ভাবে ধরে আস্তে আস্তে সেখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। দৃষ্টি একটু ঝাপসা হয়ে আসাতে কেউ তাকে লক্ষ্য করল কি না বুঝতে পারল না।

তার পরদিন সৌদামিনী কাজে অনুপস্থিত। তার পরের দিনও। তৃতীয় দিন, সন্ধ্যাবেলা, ঠিকানা খুঁজে খুঁজে গড়পারের কাছের একটা গলির মধ্যে রমেশদাদা সৌদামিনীর বাড়িতে উপস্থিত হলেন।

নিজেই দরজা খুলে দিয়ে শুষ্ক নেত্রে সৌদামিনী তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল। রমেশদাদা বললেন, "মিছিমিছি বাড়িতে বসে থেকে কি কোনো লাভ আছে? প্রাইভেট প্র্যাক্‌টিস্ যে তোমাকে দিয়ে হবে না, সে তো বহুবার বলেছি। তবে পলটনে বা পুলিশে চাকরি নাও না কেন?"

সৌদামিনী নিরুত্তর। শুধু দরজা থেকে একটু সরে গিয়ে বসবার কেদারা দেখিয়ে দিল। রমেশদাদা ঘরের মধ্যে এক পা এগিয়ে বললেন, "আপিসে তোমার ঠিকানা খোঁজ করলাম। ঐ বুড়ো কেরাণীবাবুটি বললেন তিন বছর ধরে তোমার মা পক্ষাঘাতগ্রস্তা, কোনও আত্মীয়ের বাড়িতে রেখে তুমি তাঁর চিকিৎসা করানোর ব্যবস্থা করেছ, সমস্ত খরচ দাও, এসব আমাকে বলনি কেন?"

সৌদামিনী কী একটা বল্‌তে চেষ্টা করে বিরত হল। রমেশদাদা আরেক পদ অগ্রসর হয়ে তার হাতখানি ধারণ করে বললেন, "আমাদের দেশের মেয়েরা হোপলেশ হয়। তাদের দিয়ে কোনো কাজ হয় না। তবে হ্যাঁ, একটা কাজ করেছ বটে, নেলি ডের রোগ একদম সারিয়ে দিয়েছ। মেয়েলী কায়দায় এক চাঁটি মেরেই।"

সৌদামিনী তবু কোনো উত্তর দেয় না দেখে, পুরোদস্তুর ভিক্টোরীয় রীতিতে রমেশদাদা তর্জনী দিয়ে তার চিবুক ধরে মুখখানি উঁচু করে দিলেন। দুটি অশ্রুবিন্দু ধীরে ধীরে, চোখের কোণা থেকে গড়িয়ে, অধরের কোণায় এসে, একটি বিন্দু টুক্ করে মাটিতে পড়ে গেল, আর একটি বিন্দু অধরের কোণাতেই

সংলগ্ন হয়ে বড় সাইজের মুক্তোর মত জলজল করতে লাগল। তখন রমেশ-দাদা ঠিক সেইখানটাতে কি বলে ইয়ে—পূর্বেই বলেছি না সেকালের মানুষদের আচরণের সঙ্গে এখনকার মানুষদের আচরণের খুব বেশী প্রভেদ নেই।

মহিলা সমিতি

আমি একশো বার বলব যে সত্যি যদি দেশের কাজ করতে চান তো আমাদের এই মহিলা সমিতিতে এসে যোগ দিন। উপন্যাসের পাতার মতো আপনার দিনের পর দিন কেটে যাবে। আজ একজন বিশেষ ব্যক্তি সরকারের পক্ষ থেকে সমিতির কাজ দেখতে আসবেন কি না তাই আপনাকে ধরে আনলাম। এবার থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিন। দুপুরে একটু তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সেরে, ধরুন সাড়ে বারোটা থেকে দুটো অবধি জিরিয়ে, আড়াইটার সময় অবিনাশ ডাক্তারের বাড়িতে আমাদের সমিতির ঘরে আসবেন। তাও রোজ নয়, সপ্তাহে তিন দিন, সোম, বুধ, আর শুক্র। দেড় ঘণ্টা থাকবেন, আবার সাড়ে চারটার মধ্যে বাড়ি ফিরে গিয়ে চা জলখাবারের সময় তদারক করতে পারবেন। বিশ্বাস করুন, ঐ দেড়টি ঘণ্টায় আপনার মনের সমস্ত জমানো গ্লানি কেটে গিয়ে মনটা পরিষ্কার ঝরঝরে হয়ে যাবে। উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করে থাকবেন কবে আবার সোমবার আসবে।

তবে চিরকাল এ রকম ছিল না। সেও এক দিন গেছে। এত অশান্তির মধ্যে দিয়ে দিন কেটেছে যে এখন ভাবলে আশ্চর্য লাগে। গোড়াতে আমাদের অবিনাশ ডাক্তারের স্ত্রী সতু বৌদি আর মণি-পিসিমার আগ্রহেই সমিতিটা গড়ে উঠেছিল। পরে ওঁরা অন্যদের সঙ্গে যে রকম ব্যবহারই করুন না কেন, গোড়ায় যে প্রাণ দিয়ে খেটেছিলেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে কি জানেন, ক্ষমতা বড় সাংঘাতিক জিনিষ, যার হাতে একবার আসে অমনি তাকে এমন পেয়ে বসে যে সে আর কিছুতেই এক কণাও ছাড়তে চায় না। সতুবৌদি আর মণিপিসিরও খানিকটা হয়েছিল।

তার ওপর তখনকার কাজের ধরণই ছিল আলাদা, এখন আমাদের সমিতির কর্মপদ্ধতি দেখে আপনি সে সব দিনের কথা কল্পনাও করতে পারবেন না। ঐ যে কোণার টেবিলে লম্বা বিধবা মেয়েটিকে দেখছেন, কাপড় মেপে কেটে দিচ্ছে, ও এখন আমাদের কর্মীদের পাণ্ডা বললেই হয়, ও কি আর চিরকাল ঐ রকম ছিল ভেবেছেন? তখন যদি ওকে দেখতেন। আনকোরা বাঙাল দেশের পাড়াগাঁ থেকে এসেছিল, না জানত কাপড় পরতে, না জানত কথা কইতে। ওদিকে বিদ্যেবুদ্ধি তো গড়ের মাঠ কিন্তু কথার যা বহর। এখন দেখুন মুখ বুঁজে মেসিনের মত কাজ করছে।

দেখুন, যাদের আমরা আগে ছোটলোক বলতাম, বলাটা অবিশ্যি খুবই

অন্যায় হত,, এই যেমন ধোপা নাপিতের মেয়েরা, ওদের সঙ্গে দিব্যি কাজ করা যায়, ওদের একটা কেমন স্বাভাবিক ভদ্রতা থাকে, কিন্তু এই সব যাকে বলে দুঃস্থ ভদ্রলোকের পরিবার, এদের ব্যাপারই আলাদা। ঐ মেয়েটিকে এখন দেখছেন তো কেমন মুখ বুঁজে কাজ করে যাচ্ছে। তখন ওর ক্যান্ করুমের জ্বালায় সবাই পাগল হয়ে যাবার জোগাড় হয়েছিল। ওর মুখ বন্ধ করবার জন্য একটা গোটা ডিপার্টমেন্ট ওর হাতে ছেড়ে দিতে হল।

ওই কি আর তখন একা ছিল মনে করেছেন? ওর মতো আর আড়াই শো জন এসে দিন রাত কেবল খাই খাই, কাপড় দ্যান, ওষুধ দ্যান, কাজ দ্যান করে করে কান ঝালপালা করে তুলেছিল। সরকারী টাকা অবিশ্যি অঢেল পাওয়া যেত, কিন্তু তাই বলে তো আর দেশের টাকা যা ইচ্ছে তাই খরচ করা যেত না। সেদিক দিয়ে মস্ত একটা দায়িত্বও ছিল আমাদের। কি করতাম জানেন? যাদের নেহাৎ না হলেই নয় তাদেরি আগে দিতাম।

সেও একটি কাণ্ড। মণিপিসিমার টেবিল ঘিরে সে এক তাণ্ডব নৃত্য শুরু হয়ে যেত। মেয়েরা যে কত আন্‌ডিগ্‌নিফাইড্ হতে পারে সে না দেখলে আপনি বিশ্বাস করবেন না। যে পারে ঠেলেঠুলে সব চেয়ে আগে এসে দাঁড়াবে, আর সে যা সাজ আর সে যা চেহারা, এখনো ভাবলে গা শিউরে ওঠে। শেষটা কতকটা প্রাণের দায়েই বলতে হবে, ওঁরা একজন মাইনে করা মেয়ে কেরাণী রাখলেন। সেও এক ব্যাপার। অমন জাঁদরেল মেয়েমানুষ আমি জন্মে দেখি নি। একটিও নারীসুলভ গুণ যদি তার ছিল। যেমনি গায়ে জোর, তেমনি মনে সাহস। আর গলার যা হাঁকখানি।

ওদিকে ন্যাকাও ছিল না কম। ওদের দুঃখ দেখে একেবারে গলে গিয়ে বাপু বাছা করে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিব্যি সারি সারি বসিয়ে দিত। খোসামোদ আর কাকে বলে। দেখুন, সত্যিকারের বড়লোক যদি হয় তার খোসামোদ বরং সহ্য হয়, কিন্তু ঐ গরীবদের খোসামোদের মধ্যে এমন একটা হীন ভাব আছে যা আমি বরদাস্ত করতে পারি না। তা ছাড়া ওদেরো তাতে এমনি ঘাড় বেড়ে যায়, যে একথা স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে যে ওদের সঙ্গে ঐ অতিরিক্ত সহানুভূতিই হল পৃথিবীর তিন ভাগ অশান্তির মূলে।

সুখের বিষয় যে সে সময়টা কেটে গিয়েছে। বলতে ভুলে গিয়েছিলাম ঐ মেয়েটির নাম হরিমতি। নাম শুনেই তো বুঝতে পারছেন কি করম ধরণের মেয়ে ও। বাল বিধবা, মা বাপ অপঘাতে মরেছিল, একেবারে নিরাশ্রয় হয়েই বসেছিল। মুখ্যু ছিল না মোটেই, ম্যাট্রিক পাশ করেছিল, ট্রেণিংও পাশ করেছিল, ভগবান জানে কেমন করে। তারপর জানেনই তো ভাই, গরীব বলে সরকারের মাথা কিনে নিয়েছে। মণিপিসিরা সরকারী সাহায্য চাইতেই, টাকা না দিয়ে ওঁরা ওকেই পাঠিয়ে দিলেন।

তারপর ওর দাপট দেখে কে! আমাদের মাইনে খায় না, অতএব আমাদের তোয়াক্কা রাখে না! অথচ জানেনই ত, সতুবৌদির কত বড় একটা পোজিসান্ আছে, শুনেছি অবিনাশ ডাক্তার নাকি মাসে মাসে তিন হাজার টাকা কামান। অবিশ্যি কিপেটও আছেন কম না। জানেন, এই ঘরের জন্য আজকাল চল্লিশ টাকা করে ভাড়া নেন, তাও নিত্যি উঠিয়ে দেব উঠিয়ে দেব করেন। নেহাৎ রেণ্ট কণ্ট্রোলারের তাড়া খেয়ে চুপ করে আছেন! ওঁর ছেলেদের নাকি পড়বার জায়গা নেই। শুনলেন কথা? ওঁর ছেলেদের পড়াটাই হল বড় আর এই যে আমরা এসে প্রাণপাত করে হপ্তায় হপ্তায় তিন দিন দেড় ঘণ্টা করে মাগনা খেটে মরি, এটা যেন কিছুই নয়। মানুষের স্বার্থপরতা দেখে ভাই কাঁদতে ইচ্ছা করে।

যাই হক, দুঃখের কথা বলতে গিয়ে অনেকগুলি অবান্তর কথাও বলে ফেললাম। বুঝলেন গিয়ে, ঐ হরিমতি শেষটা মণিপিসি আর সতুবৌদির গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়াল। এত সর্দারিও করতে পারত। সব জানত। যে সব কথার উত্তর আমরা চিঠি লিখে লিখে হদ্দ হয়ে গিয়েও পেতাম না, ওকে জিজ্ঞাসা না করতেই নিজে এসে গায়ে পড়ে জানিয়ে দিয়ে যেত। সাত ঘাটে জল খেয়ে এসেছিল। কাঁহাতক পারব ওর সঙ্গে।

করত কি, এর সঙ্গে দেখা করে, ওর সঙ্গে দেখা করে, টাকাকড়ি আদায় করে দিত। আপিসের খরচের ওপর হাড়ে চটা ছিল, যে সব কাজ বরাবর আমরা ট্যাক্সি চড়ে দু তিন জনে মিলে দু তিন দিন যাওয়া আসা করে, তবে করে এসেছি, ও দিব্যি ট্রামে বাসে, নিদেন হেঁটে গিয়ে চার আনা পয়সা খরচ করে এক দিনে সেরে দিত। সমস্তটার মধ্যে এমন একটা ইতর ধরণের ভাব এনে দিত যে রাগে আমাদের গা জ্বলে যেত। অথচ কিছু করবারও উপায় ছিল না।

সরকারের মাইনে খায়, তাড়াতে পারি না। কি বললেন? শেষটা তাড়ালাম কেমন করে? সেও এক ব্যাপার। তবে তাড়ালাম সে এক চালাকি করে। ওকে না জানিয়ে সতুবৌদির মাসিমা, লেডি ঘোষ, আমাদের প্রেসিডেণ্ট, একজন উচ্চপদস্থ লোকের সঙ্গে দেখা করে,—তার নামটা আমি এ পর্যন্ত জানি না,—শেষ অবধি ষড়যন্ত্র করে গোটা কেন্দ্রটাকে এখান থেকে সরিয়ে সহরের বাইরে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন।

ব্যস এক কোপে সব সাবাড়। ঐ আড়াই শো দুঃস্থ ভদ্রমহিলা, আর ঐ জাঁদরেল মেয়ে কেরাণী! হাওয়াটা হাল্কা হয়ে গেল। না, না, সমিতি রইল বইকি। তবে কি না, ঐ ধরণের কাজে হাত আর দিলাম না। এখন দেখছেন কেমন অনাবিল শান্তিতে ঐ মেয়েরা সেলাই করছে, ওরা লেখাপড়াও শেখে, ওদের স্বামীরা মুটে মজদুর, বুঝলেন, আমরা কুলী শব্দটা আদৌ ব্যবহার করি

না। সরকার থেকে যা সাহায্য পাই তাতেই চলে যায়। তবে চাঁদা তুলে বাড়িভাড়াটা দিতে হয়। মজা বুঝলেন, অবিনাশ ডাক্তারের বৌও বাড়িভাড়া বাবদ মাসে দু টাকা দেন। মণিপিসি বলেন তা, ওর স্বামী যখন সমিতির কাছ থেকে বাড়িভাড়া আদায় করেন, ওঁকেই বা ছাড়া হবে কেন। অবিশ্যি ওঁর সামনে বলেন না; শুনেছি নাকি, মণিপিসিদের বাড়িতে অবিনাশ ডাক্তার বিনি পয়সায় চিকিৎসা করেন, কাজেই আর ওঁদের চটাবার সাহস নেই। একেই বলে সংসার।

আজকাল একেবারেই কি আর গোলমাল হয় না? তা একটু আধটু হয় বই কি। আমাদের ডেপুটি গিন্নি রমলাদির সঙ্গে মণিপিসির আদৌ বনে না। অথচ দুজনেই খুব ভালোমানুষ। এই তো একটু আগেই এক চোট হয়ে গেল। রমলাদির আসতে খানিকটা দেরী হয়ে গেল, অথচ ওঁর কাছেই আলমারির চাবি। উনি এসে স্যাণ্ডেল জোড়া খুলে পাখার নিচে বসে পড়তেই মণিপিসি বললেন,

"কি গো ডেপুটি গিন্নি, দিবানিদ্রা শেষ হল?"

না বললেই পারতেন। রমলাদিও ফোঁস করে বললেন,

"আমার তো আর কারো মতো পঞ্চাশ বছর বয়সও হয় নি, আড়াই মন ওজনও হয় নি যে দুপুরে ঘুমুব। সংসারের চাহিদা মিটিয়ে আসতে হয় না? আর ভাই, আমাদের বাড়ির পুরুষ মানুষদের কথাই আলাদা। খাইয়ে দাইয়ে বিকেলের জলখাবারের ব্যবস্থা করে দিয়ে কোথায় একটু টুপ করে বেরিয়ে পড়ব, তার জো নেই, এটা কোথায় ওটা খুঁজে পাচ্ছি না, সেটা কে নিল। এত জিনিষও লাগে এদের, একটা জ্বালাতন আর কি! জিনিষ খুঁজে খুঁজে আমি যে সময় ও শক্তি নষ্ট করি তাই দিয়ে একটা বড় যুদ্ধ পরিচালনা করা যেত।"

মণিপিসিমা বললেন,

"তা সত্যি! নরেশের সব তাতে বাড়াবাড়ি, যেন কচি খোকাটি, নিজে কিছু করে নিতে পারে না!"

তাই শুনে রমলাদি আবার বললেন, "সবাই তো আর অতুল পিসেমশাইএর মত তোফা পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে গিন্নির রোজগার খায় না, পিসিমা। তাঁদের আপিসে খাটতে হয়।"

কি বলব, দেখতে দেখতে এই ছোট্ট ঘরখানিতে একটা খণ্ড প্রলয় ঘটে গেল। দুজনেই রেগে বাড়ি চলে যান আর কি। আমরা পাঁচজন গিয়ে কত সাধ্য সাধনা করে তবে থামাই।

কি বললেন, অবিনাশ ডাক্তারের স্ত্রী সতুবৌদি আসেন নি কেন? আরে সেই কথা বলবার জন্যই তো এত ভূমিকা করতে হল। আর সেইজন্যই তো

সকলের মন ভালো নেই, মেজাজ খারাপ। এই রে, ঐ যে সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিটি এসে পড়েছেন। ঐ যে, রমলাদি ওঁকে ফুলের তোড়া দিলেন, আর মণিপিসি ওঁর স্ত্রীকে মালা দিলেন। সাধু। সাধু। একটু নজর করে ভাই, স্ত্রীটিকে দেখবেন। উর্মিই আমাদের সেই পুরোনো বন্ধু হরিমতি। গালভরা হাসিখানি দেখেছেন, যেন আমাদের কতদিনের সুহৃদ্! ইস্, কালে কালে কতই হল। এই যে হরিমতিদি, এই উঁচু চেয়ারটা আপনার জন্য। আসুন ভাই, কি খুশি যে হয়েছি সবাই।

রাজযোটক

মুখ মুছবার জন্য মেজমামা পকেট থেকে রুমালটি টেনে বের করতেই কি একটা জিনিষ ঠুক করে মাটিতে পড়ে, দরজার চৌকাঠ অবধি গড়িয়ে গিয়ে, সেইখানেই জুল জুল করতে লাগল। দ্রাক্ষারসে রোদ পড়লে যেমন লালচে সোনালী বর্ণ ধারণ করে, অনেকটা সেই রকম রঙের গোল একটা পাথর না কাঁচ না কি যেন।

সবাই ছুটে গিয়ে তুলে এনে মেজমামাকে দিলাম। কি এটা ? মেজমামা একটু কাষ্ঠ হেসে পাথরটাকে একবার রুমালে মুছে আলোর কাছে তুলে ধরলেন, তার ফলকগুলো থেকে লাল নীল সবুজ বেগুনী আলো ঠিকরে বেরোতে লাগল।

"বিশ্বাস কর আর নাই কর এর দাম এক লক্ষ টাকা আর এর সঙ্গে একজন রূপসী নারীর হৃদয়ের কথা জড়ানো আছে।"

মেজমামা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন,

"এ জীবনে যা যা ঘটেছে বলে আমার যত দুঃখ হয়, তার চেয়ে ঢের বেশি দুঃখ হয় যা ঘটেনি তার জন্যে। তোরা তো আমার এই টাকটা আর ভুঁড়িটাই দেখতে পাস আমার মধ্যে যে রাজযোটক ছিল তা জানিস ? এ সব কথা প্রকাশ করা যায় না। আর বুকের মধ্যে চেপে রাখাও যায় না। এই গদাই, দেখ তো তোর মামিমা আশে পাশে কোথাও না থাকে তো চট করে আমার জন্য গোটা দু তিন পান নিয়ে আয় তো পেতলের বাক্স থেকে।"

গদাই পান আনল, সেই সঙ্গে চার দিকটা একবার ভালো করে ইন্সপেক্সনও করে এল, মামিমাকে দেখতে পেল না।

মেজমামা দুটো পানই এক সঙ্গে মুখে পূরে বললেন,

"এই সেরেছে, চুণ আনতে ভুলেছিস তো ?"

কে একজন তাড়াতাড়ি এক টিপ চূণ এগিয়ে দিল। মেজমামা খানিকক্ষণ চিবিয়ে আবার একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন।

"বুঝলি, দাক্ষিণাত্যে পুনালুর বলে একটা ষ্টেশন আছে, একেবারে পশ্চিমঘাটের ওপারে, পাহাড়ের কোল ঘেঁষে। খাসা ঝরঝরে ষ্টেশনটি, কিছু পাওয়া যায় না, তবু দূরে একটা কফিওয়ালা দেখে আমার নতুন চাকর রামদীনকে বললাম,

"এই, নামকে, এক ভাঁড় কফি লে আও।" কিন্তু রামদীন আর কিছুতেই নামে না।

"না, বাবু কফি খেয়ে কাজ নেই, এ জায়গাটা ভালো নয়।"

জায়গা ভালো না কি রে? খাসা জায়গা দেখতে পাচ্ছি।

রামদীনের মত চাকর চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। এই দাড়ি গোঁফ, এই পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি ছাতিখানা, ঘুঁষি দুটোতো কল্পনাই করা যায় না, আর এই হাতের পায়ের গুল। কিন্তু ব্যাটা কিছুতেই নামল না। শেষটা যখন শুনলাম গাড়ি ছাড়তে আরো মিনিট কুড়ি দেরী আছে, নিজেই নেমে পড়লাম।

কফির ভাঁড়ে চুমুক দিয়েই টের পেলাম আর আমি একা নেই, দু পাশে যমদূতের মত চেহারার দুটো লোক একেবারে আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। এমন অবাক হয়ে গেলাম যে খানিকটা গরম কফি ছলকে গিয়ে ওদের পায়ে টায়ে পড়ল। তারা হিন্দীতে বলল।

"বাবু সাহেব, আর কেন? এবাব ভালোয় ভালোয় বাড়ি চল। মা ঠাকরুণ আর কত কাল অপেক্ষা করবেন?"

আমাব তো চক্ষু চড়ক গাছ।

আরে তোমলোক কেয়া যা তা বোল্‌তা! মা ঠাকরুণ বাংলা মুলুকমে বহুৎ নিরাপদে হ্যায় আর হামরা ভি প্রাণমে বহুৎ শান্তি হ্যায়। জরুর লোক ভুল করতা।"

কিন্তু তারা খালি একটু হেসে মাথা নাড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গে দুটো বিবাশী শিক্কা ওজনের হাত আমার দুই কাঁধে পড়ল।

দেখ, ভয় পাই নি, ভয় পেয়েছিলাম এ কথা কেউ মনে কর না, কিন্তু ট্রেণটা যদি ছেড়ে দেয়, এই ভেবে রামদীনকে চেঁচিয়ে ডাকতে যাব, অমনি তারা অম্বুরী তামাকের গন্ধ-ওয়ালা দু হাত দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরে এক নিমিষের মধ্যে আমাকে একটা রবার গাছের আড়ালে টেনে নিয়ে গেল।

আমার জিনিষপত্র, ক্যাম্বিসের বেডিং, নতুন টিফিন-ক্যারিয়ার, চাকর রামদীন, সব নিয়ে হুস্‌ হুস্‌ করে ট্রেণটা চলে গেল টের পেলাম।

লোক দুটো হাত জোড় করে মাপ চাইল, আমার চোখ মুখ খুঁটিয়ে দেখল, হাতের নখ দেখল, কপালের কাটা দাগটা দেখে একেবারে উল্লসিত হয়ে উঠল। হিন্দী ভাষা তাদের ঠিক আমি বলতে পারব না, তবু কতকটা আঁচ দিচ্ছি।

আমার কপালের দাগ দেখিয়ে বললে,

"আরে, অস্বীকার করে কেয়া লাভ হোগা বাবু, পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মুমে রাজ চিহ্ন"

বাধা দিয়ে বললাম "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটা রাজচিহ্ন নয়, চানের ঘরে পড়ে গিয়ে কেটে গেছিল, তার দাগ।"

তারা কানই দিল না, বলে যেতে লাগল হুবহু সব মিলে যাচ্ছে, কানের উপর চুলের গুছি, গাল পট্টিতে আঁচিল,

"আরে গাল পট্টিতে কি যার তার আঁচিল হয় রে বাবা যে বড় অস্বীকার করছিস।"

সব চিহ্ন মিলিয়ে খুসি হয়ে বললে,

"কোথায় বাড়ি যাবেন বলে আনন্দ করবেন, তা নয়, খালি মিছে কথা! এতগুলো রাজচিহ্ন কি উড়িয়ে দেবার জিনিষ? এই তো আঙ্গুলের ডগায় সব চক্র পর্যন্ত রয়েছে। না, বাবুজী এবার চলুন, টিকটিকিবাবু মটর গাড়িতে বৈঠিয়ে আছেন। ওনার কাছেই চিহ্নটিহ্ন সব শুনা হ্যায়।"

আমি বেগতিক দেখে, হঠাৎ হাত পা ছুঁড়ে একটা কাণ্ড বাধালাম। কিন্তু তাদের সঙ্গে পারব কেন? এক নিমিষে আমার দুটো হাত পিঠমোড়া করে ধরে চিবিয়ে চিবিয়ে বললে,

"ভালো চান তো ভালোয় ভালোয় চলুন বাবুজী, নইলে মাঠাকরুণের হুকুম আছে ঝুণ্টি ধরে লিয়ে যাব।"

শেষটা যেতেই হল। কাছে পিঠে একটাও লোক দেখলাম না যে চেঁচিয়ে ডাকব। এদিকে সন্ধ্যাও হয়ে আসছে।

কতকগুলো ঝোপের পিছনে একটা রং-চটা পুরোন ডজ্ গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। তার কাছে পৌঁছে অবাক হয়ে দেখি রামদীন আমার বাক্স প্যাঁটরা নিয়ে বসে আছে। লোক দুটো তাকে বললে,

"এই যে টিকটিকি বাবু, ধরে নিয়ে এসেছি। ভাগ্যিস দেখিয়ে দিলেন"।

আমি ভীষণ রেগে গাড়ির পা দানির উপর চড়ে রামদীনের গালে ঠাস ঠাস করে দুই চড় লাগিয়ে দিলাম। বিশ্বাসঘাতক প্রবঞ্চক কোথাকার!

রামদীন পকেট থেকে একটা নোট বুক বের করে তার মধ্যে স্পষ্ট বাংলায় লিখল, মার খাওন বাবদ ৫৲ গালিমন্দ বাবদ ১৷০। হেসে বললে,

"স্যার, আমি কিছুই মাইণ্ড করি না, ডিটেক্‌টিভ মানুষ, এ সব আমাদের গা সওয়া। এবার চলুন তা হলে ভালো মানুষটির মত পরিবারের কাছে।"

রামদীনের ব্যবহারে মানব জাতের উপর আমার ঘেন্না জন্মে গেছিল। মাদ্রাজে সে নিজে এসে, আমার কাছ থেকে যেচে চাকরের কাজ নিয়েছিল। রাঁধতও খাসা। ঐ একটা দুঃখ আমার আজো থেকে গেল।"

মেজমামা আরেকটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন,

"যমদূত দুটোর একটা গাড়ি চালাতে লাগল, তার পাশে রামদীন বসল। পিছনের সীটে আমি বসলাম, আমার কনুইয়ের উপরটা কষে

চেপে ধরে বসল ২নং যমদূত। রামদীন পিছন ফিরে এক গাল হেসে বললে,

"দেখুন বাবুজী, সব ভালো যার শেষ ভালো। আমারো চাকর সাজা সার্থক হল। মাদ্রাজ ষ্টেশনেই আমি আপনাকে চিনেছি, আমার চোখে ধূলো দেবে যে শালা সে এখনো জন্মায় নি। মাঠাকরুণের লোক দুটোকে তখুনি তার করে দিয়েছিলাম, এখানে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করতে। আমার তীরের মত বুদ্ধি, পারবেন আপনি আমার সঙ্গে?"

বলে রামদীন আনন্দের চোটে নিজের বুকে গুম গুম করে দুচারটে কীল মেরে নিল। আমি ঘৃণায় নাসা কুঞ্চিত করলাম।

ড্রাইভারটা তখন মুখ ফিরিয়ে খইনি খাওয়া দাঁত বের করে বললে,

"উনিও কম ধড়িবাজ নন। সাক্ষাৎ বিয়ে করা ইস্ত্রীকে ফেলে আবার বাংলা মুলুকে গিয়ে আরেকটা সাদি করেছেন জোর গলায় বললেন!"

দ্বিতীয় লোকটা আমার হাত না ছেড়েই শিউরে উঠল।

"উঃ কি পাষণ্ড! আজ পঁদ্র শাল ধরে মাঠাকরুণ কত না হাহুতাশ করেছেন, কত না মাদুলি পরেছেন, ব্রাহ্মণ খিলিয়েছেন, পূজো দিয়েছেন, টিক্‌টিকি লাগিযেছেন। এমনি চালাক যে কোথায় গা ঢাকা দিয়ে থাকল তা কাক পক্ষীও জানতে পারল না! এবাব চলুন, মজাটা বুঝবেন গিয়ে। এ আপনাদের বাংলা দেশের নরম মেয়ে নয়। বাবা, তার উপর পঁদ্র শাল দুঃখে দুঃখে কাটিয়ে কলজে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছে আর মেজাজ মর্জিও—থাক আর কথায় কথা বাড়িযে কাজ নেই।"

একটু নার্ভাস লাগছিল। ভয় নয়, মাইণ্ড ইউ, কোনো মেয়েমানুষকে আমি ভয় করি না–এই গদা ভালো করে দেখে এসেছিলি তো তোর মামি কোথায়?

–যাই হোক, ঘণ্টা খানেক বাদে যখন দিব্যি চারিদিক অন্ধকাব হয়ে গেছে, এক বিরাট বাড়ির সামনে গাড়ি থামল।

রামদীন চট করে নেমে বোঁ কবে কোথায় ঢুকে পড়ল। আমরা গাড়িতেই বসে রইলাম। দু চাব মিনিটের মধ্যেই চার দিক থেকে দুড়দাড় করে চাকর দাসীরা ছুটে এসে গন্ধ প্রদীপ জ্বেলে, ফুল ছড়িয়ে, উলু দিয়ে এক কাণ্ড লাগাল! লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছিল। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক রামদীনের লজ্জা সরম নেই, একটু বাদেই ফিবে এসে আমাকে ডেকে ভিতরে নিয়ে গেল। এতক্ষণে যমদূত নং ২ আমার হাত ছাড়ল। আমি সেই জায়গাটা ঘষতে ঘষতে রামদীনের সঙ্গে ভিতরে গেলাম।

কি আর বলব, এই অর্ডিনারি বাড়িতে থাকিস তোবা, ঝোল ভাত খাস, তোরা সে সব কল্পনাও করতে পারবি না। স্নানের ঘরেও জাজিম পাতা। শ্বেত পাথরের চৌবাচ্চা, তাতে গোলাপ গন্ধ দেওয়া জল, গোলাপের পাপড়ি

ভাসছে। সিল্কের তোয়ালে। সেসব তোরা চোখেও দেখিস নি। তিনটে খাস চাকর আমার সেবা যত্ন করতে লাগল। স্নানের পর যে সব মখমল কিংখাবের জাব্বাজোব্বা পরলাম, গলায় যে গজমতির মালা দুলোলাম তা দেখলে চোখ ঠিকরে বেরিয় আসত। তারপর ডান কানের পেছনে একটা লাল গোলাপ গুঁজে খেতে গেলাম।

ঝাড়লণ্ঠন দেওয়া ঘরে, গালচের উপর পা মেলে দিয়ে, মিনে করা টেবিল চেয়ারে, সোনারূপোর বাসনে পোলাও কোর্মা যে সব খেলাম, আহা ভেবেও মনটা হু হু করে। রামদীনের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম, হঠাৎ মুখ তুলে দেখলাম হাঁড়িপানা মুখটি করে সে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। বোধ হয় আমার সৌভাগ্য দেখে হিংসায় জ্বলে যাচ্ছে। আমি কিন্তু অকৃতজ্ঞ নই আর যাই হই না কেন, একটি মাংসের টুকরোতে একটা কামড় দিয়ে পাশের চাকরটাকে ডেকে হিন্দীতে বললাম "ঐ টিকটিকিকো বোলো কাঁইকু মিছিমিছি মন খারাপ করতা, হাম উস্কো বেয়ালুম ক্ষমা কর দিয়া।" লোকটা বোধ হয় হিন্দী ভালো বোঝে না কারণ রামদীনকে গিয়ে কি যেন বলতেই রামদীন আরো বিরক্ত হয়ে সেখান থেকে চলে গেল।

আতর জলে মুখ ধুলাম। সোনার কৌটো থেকে মিঠে মাদ্রাজী পান খেলাম।

তারপর একজন আধাবয়সী কিন্তু রূপসী দাসী এসে আমাকে তাদের মাঠাকরুণের সমীপে নিয়ে গেল। সে কি বলব তোদের! এই, পদাটা সরিয়ে একবার চার দিকটা ভালো করে দেখ না। আচ্ছা, তাবপর শোন, লাল গালচে পাতা ঘর, তার উপর সোনালী কৌচে বসে রয়েছে লাল মাদ্রাজী সাড়ি পরা কি সুন্দরী একজন মহিলা। বয়স আর খুব কম হবে কি করে, তাকে ত্যাগই করেছি পনেরো বছর, কিন্তু আমিই বা কি এমন কচিটি তোরাই বল না। আমাকে দেখেই ঝড়ের মত সে ছুটে এল, দুচোখ দিয়ে বিদ্যুৎ ছুটতে লাগল, বর্ষা নামল, একেবারে প্রকাণ্ড এক তোড়া গোলাপ ফুলের মত আমার পায়ে এসে পড়ল। এঁ্যা। করে কি, করে কি! ওঠ, ওঠ। অমন চোখে জলটি যা মানিয়েছে।

সে উঠে আমাকে একদৃষ্টে চেয়ে দেখল তারপর বাংলায় বললে,

"তুমি কত বদলে গেছ, আরো কত সুন্দর হয়ে গেছ, চোখে মুখে কত বিদ্যেবুদ্ধির চিহ্ন" এমন ধারা কত কি। জানিসই তো পনেরো বছর পরে দেখা হলে মেয়েরা কি কাণ্ড করে। আমারো মনটা কেমন করছিল, আহা এমন সুন্দরীকে এমন করে কখনো কষ্ট দিতে হয়? আমার গলা থেকে গজমতির মালাটি খুলে তার গলায় পরিয়ে দিলাম—এই গদা। ঠিক দেখেছিলিতো? আর সে তখুনি

তার পদ্মফুলের মতো হাত থেকে আংটি খুলে আমার হাতে পরিয়ে দিল। তারপর কত গান বাজনা হল সে আর কি বলব।

রাত্রে নিজের ঘরে গেছি সাজ পোষাক ছাড়তে, দেখি সেখানে চোখ লাল করে, ঘুঁষি পাকিয়ে রামদীন বসে আছে। আমাকে দেখেই গলা টিপে ধরল, আমি যাই আর কি!

"ছিঃ, লজ্জা করে না, ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে নিজের অমন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর প্রতিমা স্ত্রী থাকতে—বুঝলি তোরা, তোদের মামিকে বললে কি না লক্ষ্মীর প্রতিমা—পরের বাড়িতে জোচ্চুরি করে ঢোকা বের করছি, ভণ্ড কোথাকার।"

দেখলি তো একবার অন্যায়টা। নিজেরাই আমাকে ধরপাকড় করে এনে, এখন উলটো কথা! উত্তেজনাব চোটে সে আমার গলা ছেড়ে দিয়েছিল। বললাম,

"আমিতো আসতে চাই নি।"

"তবে এক্ষুনি চলে যাও, খিড়কি দরজার বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, তোমার জিনিষ পত্রও বোঝাই আছে, কিছু টিফিনও দিয়ে দিয়েছি. ঐ সব সাজপোষাক ছেড়ে এক্ষনি চলে যাও। নইলে তোমাকে মেরে একেবারে তালগোল পাকিয়ে দেব।"

খুব যে যেতে ইচ্ছা কবছিল তা নয়, তবু ভদ্রতা বলে একটা জিনিষ আছেতো, বাস্তবিকই, পরের বাড়িতে অমন করে থাকাটাতো সত্যিই ভালো নয়। উঠে পড়লাম, কাপড় চোপড় ছেড়ে রেডি হলাম। সে আমাকে বাথরুমের দরজা দিযে বের করে দিয়ে, উঠোন পার হয়ে,খিড়কির বাইরে গাড়ি অবধি পৌছে দিল। যমদূত নং ১ চাকা ধরে বসে আছে; আমাকে দেখে একটু হাসল।

গাড়ি ছাড়বার আগে কৌতূহল চাপতে না পেরে রামদীনকে বললাম,

"তুমি যাবে না?"

রামদীন হো হো কবে হেসে বললে,

"আমি যাব কি? বুঝছ না আমিই হলাম সেই পনেরো বছরের হারানো স্বামী। আমি রোজ রাত্রে যখন কাব্য রচনা করে শোনাতাম আমার স্ত্রী নাক ডাকাতেন, তাই নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি করে রাগমাগ করে পনেরো বছর আগে একদিন গভীর রাত্রে পালিয়ে গিয়েছিলাম। দিল্লী গিয়ে নাম বদলে ডিটেক্টিভ আপিশ খুলে বেশ দু পয়সা কামাচ্ছিলাম। এরা আমায় চিঠি লিখে হারানো স্বামী খুঁজে দিতে বললেন। সত্যি কথা বলব কি দুহাজার টাকাও যখন দিলেন, তখন খুঁজে দেব নাই বা কেন? কিন্তু এখানে এসে দেখছি ও স্বাধীনতা টাধীনতা কিছু নয়। বাঙ্গালীর ছেলে হয়ে বিয়ের সময় যে মাদ্রাজী মেয়ের

সঙ্গে গাঁট ছড়া বেঁধেছিলাম সেই হল সব। তা ছাড়া তোফা আরামে আছেও এরা, এসব ভুলেই গেছিলাম। এই, আমার বৌয়ের আংটি নিয়ে যে বড় চলে যাচ্ছ?"

বলে আংটিটা ছিনিয়ে নিলে। কিন্তু টানা হ্যাঁচড়াতে এই পাথরটা খুলে আমার পায়ের কাছে গড়িয়ে পড়ল, রামদীন অতটা লক্ষ্য করল না।

মেজমামা পাথরটা তুলে ধরে কি যেন দেখতে লাগলেন আর তার লাল নীল সবুজ আলোতে আমাদের চোখ ঝলসে যেতে লাগল।

এমন সময়ে ঝড়ের মত মামিমা ঘরে ঢুকে মেজমামার হাত থেকে পাথরটা কেড়ে নিয়ে বললেন—

"উঃ। দেখেছ কি ভীষণ লোক। এতদিনে বোঝা গেল আমার সুর্মার শিশির ছিপি কে ভেঙ্গেছে।"

মেজমামা রুমালটাকে পুনরায় পকেটে পুরে বললেন—

"যা চ্চলে।"

পারিবারিক ইতিহাসের এক অধ্যায়

দার্শনিকরা প্রেমের কারণ ও প্রকৃতি নিয়ে যতই না গবেষণা করুন, প্রেমের যে আসলে কোনো একটা যুক্তিযুক্ত ভিত্তি নেই এর বহুল প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন অকারণে প্রেম জন্মগ্রহণ করে, আবার তেমনি সহস্র কারণ থাকা সত্ত্বেও প্রেমের কোনো লক্ষণই দৃষ্ট হয় না। পাত্র পাত্রীর পরস্পরের প্রতি যোগ্যতা আছে কি নেই, এ অতিশয় নগণ্য প্রশ্ন। সহস্র ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পাত্র বা পাত্রী যতই অযোগ্য হয়, প্রেম ততই গভীর হয়। আসল কথা হল, প্রেমের চক্ষু নেই, যোগ্যতা বা অযোগ্যতা বিচার করবার ক্ষমতা নেই। এমন কি অযোগ্যকে লাভ করে, তাকেই যোগ্য মনে করে সারা জীবন কাটিয়ে দেওয়াও কিছুই অসম্ভব নয়। যাদের পরস্পরকে ভালোবাসা উচিত, তারা কদাচই প্রেমে পড়ে, আবার যাদের পরস্পরকে ভালোবাসবার কোন মানেই হয় না তারা আজীবন প্রেমের পাশে আবদ্ধ থাকে। আসল কথা হল, প্রেমের ব্যাপার একমাত্র পরিবেশের উপর নির্ভর করে। বাইবেলে অবশ্য স্পষ্টই লিখিত আছে যে নর-নারী প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হলে তাদের বুঝে ওঠা দায় হয়। আমাদের পারিবারিক ইতিহাসের এক অধ্যায় থেকে উদাহরণ দিইঃ

পুর্বেই বলেছি আমার দাদামশায় ও দিদিমা অতিশয় প্রগতিশীল বলে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। এমন কি পর পর পাঁচটি কন্যাবত্ন লাভ করা সত্ত্বেও, তাঁদের বারংবার প্রকাশ্যভাবে একথা বলতে শোনা যেত যে পুত্রই বল আর কন্যাই বল, উত্তমরূপে শিক্ষা দিলে দুই-ই সমান। অবশ্য তাঁদের দুটি পুত্রও বর্তমান ছিল। সেকালে যে শিক্ষিত ও সাধু ব্যক্তিমাত্রেরই উদার চরিত্র ও বিশাল পরিবার থাকত, স্বয়ং মহারাণী ভিক্টোরিয়া থেকে আরম্ভ করে তার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তও পাওয়া যেত। শুনেছি বাইবেলে ঐরূপই নির্দেশ দেওয়া আছে।

এঁরা আমার নিকট আত্মীয়া হলেও সত্যের খাতিরে আমাকে বলতেই হবে যে ঐ পাঁচটি কন্যার মধ্যে কেউই রূপে গুণে কিছু কম ছিলেন না। হয়তো তাঁদের মধ্যে ছোট মাসিমারই রংটা সামান্য একটু শামলা, আর গড়নটা অল্প একটু খর্ব ছিল, কিন্তু সেও এতই সামান্য যে সহজে লক্ষ্যই হয় না। তা ছাড়া ছোট মাসিমার বিবাহের উপযুক্ত বয়স হতে, বড় মাসিমা, মেজ মাসিমা ও আমার মায়ের বিবাহ হয়ে পুরোনো হয়ে যাওয়াতে পরস্পরের মধ্যে কোনো তুলনার কথাই উঠত না।

অপর পক্ষে, বিদ্যা বুদ্ধি ও তেজে ছোট মাসিমা সকলকে

অতি সহজেই অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। দিদিরা এতে অবশ্যই কিঞ্চিৎ গর্ববোধ করতেন, কিন্তু বিনয়রূপ ভূষণ নারী চরিত্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ একথা জেনে, পিত্রালয়ে পদার্পণ করবার পর মুহূর্ত থেকেই তাঁরা কনিষ্ঠা ভগ্নীকে নানারূপ সারগর্ভ উপদেশ দিতে আরম্ভ করতেন।

বলা বাহুল্য, এই উপলক্ষে ছোট মাসিমার সঙ্গে তাঁরা সর্বদাই ছোট বড় নানারূপ তর্কেও জড়িত হয়ে পড়তেন। বিলেতে তখনকার প্রগতিশীল মহিলারা স্ত্রীস্বাধীনতা নিয়ে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন। ছোট মাসিমা সকালে চায়ের টেব্‌লে বসে মিসেস্ প্যাংক্‌হার্স্টের সখীদের পুলিশ ঠ্যাঙানোর ও পরিণামে পুলিস কর্তৃক ধৃত হওয়ার বিবরণী পাঠ করে যুগপৎ রাগে ও গর্বে আকুল হয়ে যেতেন। তাই দেখে বড় দিদি গম্ভীর কন্ঠে উপদেশ দিলেন, "ছি, মলিনা, নারীধর্ম-বিরোধী অসামাজিক আচরণকে প্রগতি বলে না। অসভ্যতা আর নির্ভীকতার মধ্যে একটা প্রভেদ আছে। উনি বলেন—"

মলিনা একগাল রুটি মাখন মুখে নিয়ে বলে,

"তোমার উনিটির কথা ছেড়ে দিয়ে নিজের মতামতটাই প্রকাশ কর না, অবিশ্যি যদি কিছু থাকে।"

একথা শুনে বড়-মাসিমার গৌর মুখমণ্ডল রক্তিমাভা ধারণ করে।

দিদিমা ব্যস্ত হয়ে বলেন,

"আঃ মলিনা, কতবার বলেছি শিক্ষিতা মেয়েরা মুখে খাবার নিয়ে কথা বলে না। আর বয়োজ্যেষ্ঠাদের মুখোমুখি উত্তর দেওয়াটাও শীলতাবিরুদ্ধ।"

ছোট মাসিমা বললেন, "বড় দিদি মাঝে মাঝে নিজের কথা বলেন না কেন? শুনেছি তোমাদের আদর্শ মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁর অ্যালবার্টটিকে আজীবন এমনি কড়া শাসনে রেখে দিয়েছিলেন যে সে বেচারা মুখটি খুলতে সাহস পেতেন না। ভদ্রলোক নাকি অকালে মরে বেঁচেছিলেন।"

দাদামশায় এতক্ষণ আলোচনায় যোগ দেন নি, এবার খবরের কাগজখানি নামিয়ে প্রচুর দাড়ি ও জুলপীর আড়াল থেকে জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, "রুমা তার স্বামীর শূন্যগর্ভ কথাগুলোর পুনরুক্তি করে মানুষের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটায় বটে, কিন্তু তুমিও যেন নিজের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের গর্বে মহারাণীর মত আদর্শ নারীকে খাটো করতে চেষ্টা কর না। তুমি জানো যে অ্যালবার্ট চোখ বুঁজবার পর থেকে, এত ঐশ্বর্যের মালিক হয়েও আর কখনো তিনি বিধবার বেশ ছাড়েন নি।"

নিম্ন কণ্ঠে ছোট মাসিমা বললেন,

"তোমরাই তো বল বাইরের বৈধব্য পালন হল কুসংস্কার। থান পরা

একাদশী করা কুসংস্কার, আর কালো জোব্বা আর টিয়ে পাখি টুপি পরা কুসংস্কার নয় ?"

বলে অমার্জনীয় ভাবে সশব্দে চেয়ার সরিয়ে গুরুজনরা গাত্রোত্থান করবার আগেই ঝড়ের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

ইতিপূর্বে চায়ের টেবলে মেজ মাসিমা সেজ মাসিমাকে কেন্দ্র করেও অনেক নাটকীয় ঘটনা ঘটে গেছে, কিন্তু আজ দাদামশায় সহসা কাগজটা মাটিতে নিক্ষেপ করে বললেন,

"রমলা, মলিনার বাইশ বছর বয়স হয়েছে, স্বভাবের মধ্যে ঝাল এসে যাচ্ছে। ফরাসী মদও ঘরে বেশী দিন রেখে দিলে ঝাঁঝিয়ে টকে একেবারে ভিনিগার হয়ে যায়। আমাদের কোর্টের সেই ছোক্‌রা ব্যারিষ্টার, ঐ যে পমেলো না কি যেন নাম, দুদিন আগে ঘন ঘন আসত যেত, তার কি হল ?"

দিদিমা বললেন,

"মলিনা বলেছে তাকে বিয়ে করার কথা সে ভাবতেও পারে না। তার ইংরিজি উচ্চারণ ভালো নয়।"

দাদামশায় কাষ্ঠ হেসে বললেন,

"মলিনা জন্মাবার সময় তোমার সেই লেডি ডাক্তার সই প্রিয়বালা তার ছেলের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ করেছিল না ? তখন দিয়ে দিলেই ল্যাঠা চুকে যেত। রোজ রোজ এই অশান্তি ভালো লাগে না। যা হয় একটা কর।"

দিদিমা বললেন,

"প্রিপষ্টেরাস। তারা হল গিয়ে মিড্‌ল্‌ ক্লাশ, আমাদের সঙ্গে মিশবে কেন ?"

"যা হয় একটা কর"—হল গিয়ে ঠিক পুরুষ মানুষের উপযুক্ত কথা, সম্ভব অসম্ভবের সঙ্গে ওর কোনো সম্বন্ধ নেই। দিদিমা কন্যাদের সঙ্গে কমিটি করলেন।

মেজ-দিদি বললেন,

"আমার ঐ খুড়তুতো দেওরটিকে একবার চায়ে বল, মা। বেশ পাশ-টাশ করেছে, অবস্থাও মন্দ না, বাবা তো ইচ্ছা করলেই স্যার বেন্‌থ্যামকে বলে হাইকোর্টে ঢুকিয়ে দিতে পারেন।"

দিদিমা বললেন,

"কি যে বলিস, ওরকম বাঙ্গালী ঘরে মলিনা কি করে সুখী হবে ? ওরা অন্যমনস্ক হলেই পা নাচায়। আর মেয়েরা কি ভীষণ চেঁচিয়ে কথাবার্তা বলে। ভারি আন্‌কাল্‌চার্ড। তোদের চারজনার কেমন ভালো ভালো বিয়ে হয়ে গেল, আর ও বেচারীর—"

মেজ দিদি বিরক্ত হয়ে বললেন,

"দেখ মা, তোমার ঐ অহঙ্কারী কালো মেয়েকে পার করতে হলে, খাঁইটা একটু নামাও। ওঁদের মত পাত্র তো আর গাছে হয় না।"

মেজদিদির কথা মলিনার কানে উঠতে দেরি হল না, সে মেজদিদির বাড়ি গিয়ে এক প্রস্থ ঝগড়া করে এল—

"আমার বিয়ে নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না, মেজদি। আমি তোমাদের চেয়ে বেশি লেখাপড়া শিখেছি, একজন অযোগ্য পুরুষ মানুষের ঘাড়ে চাপবার আমার অত প্রয়োজন নেই। আমি বেথুন কলেজে প্রফেসারি করব।"

মেজমাসিমার স্বামী কপালে ভুরু তুলে বললেন,

"বল কি কনিষ্ঠা? তোমার অত কষ্ট করে শেখা বিদ্যাগুলো টাকা দিয়ে বেচে দেবে?"

ছোটমাসিমা বললেন, "কেন দেব না, আপনি তো দিচ্ছেন।"

"আহা আমি যে পুরুষমানুষ আর তুমি—"

"দেখুন, আপনাদের প্রগতি-ট্রগতি শুধু মুখে মুখেই চলে। কাজের বেলায় এতটুকু সৎসাহস নেই।"

আমার নিজের মাও কম চেষ্টা করেন নি, তবে ভালো মানুষ, নিজে একটু তফাতে থেকে বড় জায়ের ছোট ভাইএর সঙ্গে সম্বন্ধ পাঠালেন। দিদিমা অনুমতি করলেই একদিন নেমতন্ন করা যায়। ছোট মাসিমা বললেন,

"মোটা বা বেঁটে বা তোতলা বা লাজুক বা কালো বা আনাড়িরা সব বাতিল। গোঁড়ারা বা বোকারা, সেকেলে বা ব্যবসাদার বা ন্যাকা বা গায়েপড়া চলবে না। মাষ্টারমশাই বা গাইয়ে বাজিয়ে বা উকীল বা পুলিশের লোক দিয়ে হবে না।"

দাদামশায় ব্রিজ্‌পার্টি থেকে বাড়ি ফিরে সরুমুখো জুতো খুলতে খুলতে বললেন,

"তা হলে কাকে ও বিয়ে করবে তাই শুনি? তোমার ঐ লেডি ডাক্তার সই প্রিয়বালার ছেলেটি কি করে?"

দিদিমা বললেন, "সেও ডাক্তার হয়েছে, প্র্যাক্‌টিস্ করে, বিলেত যায় নি, নাকি দেশপ্রেমিক। বললাম না, ভারি মিডল্ ক্লাস্। বাবুর্চি রাখে না, বামুন ঠাকুরে রাঁধে!"

এই সময়ে তোলা পুরোনো এল্‌বামে গ্রুপ ফোটো দেখেছি, দাদামশায় দিদিমা মাঝখানে আরাম কেদারায়, এপাশে দুটি কন্যা, ওপাশে দুটি কন্যা বসে, স্ব স্ব পত্নীর পশ্চাতে মেসোমশায়রা দাঁড়িয়ে, দাদামশায় দিদিমার পিছনে তাঁদের পুত্ররা, আর পদতলে গালচের উপর একটু বঙ্কিম ভাবে আধ-শোয়া আধ-বসা ছোট মাসিমা। সকলের পোষাক পরিচ্ছদ নিখুঁৎ, মুখমণ্ডল অতি

গম্ভীর আর ছোট মাসিমার মাথাঘষা চুল ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে রেশমী ফিতে দিয়ে আলগোছে বাঁধা, আব শুধু মুখমণ্ডলে নয় সর্বাঙ্গে অসীম বিরক্তি। শেষ পর্যন্ত যে আদৌ বিয়ে হল এই আশ্চর্য।

ছোট মাসিমা পিয়ানো বাজিয়ে দিব্যি গান গাইতে পারতেন, রবি ঠাকুরের রচিত "ও আমার গোলাপ সুন্দরী" গাইতেন, লোকে ভারি তারিফ করত। মখমলের উপর রঙ্গীন সুতো দিয়ে কি চমৎকার সব নক্সা তুলতেন, সেগুলি হয় বাঁধিয়ে দেয়ালে টাঙানো হত, নয় চেয়ারের ঢাকনি তৈরী হত। বড় বড় ঝিনুকেব ভিতর রং তুলি দিয়ে ফুলেব তোড়া আঁকতেন, যে দেখত সেই মুগ্ধ হত। ফরাসী ভাষায় গড়গড় করে আবৃত্তি করতেন, কি বা তার উচ্চারণের বিশুদ্ধি। কিন্তু হায়, যে পুষ্প আঘ্রাণ কববার মানুষ জোটে না, তাব কি বা মূল্য? ছোট মাসিমা শাখাতেই শুকিয়ে যেতে লাগলেন। লোকে বলত, আবেকটু কম গুণী হলে হযতো বা পাত্র জুটত।

এই সময় আমাব সেজ মাসিমা ও তাঁব স্বামী বোম্বাই থেকে কলকাতায় এলেন। তাব অল্পকাল পবেই একদিন দিদিমা কনিষ্ঠা কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে ইডেন গার্ডেনে পুষ্প প্রদর্শনী দেখতে গিযেছেন। তখনকার দিনের লোকেরা ফুল দেখে খুসি হত। সস্তা সিনেমাব অভাবে বিন্দুমাত্র কাতর না হয়ে নাকি দলে দলে ফুল দেখতে যেত। অবশ্য এ সকলই শোনা কথা।

মাযেব উপবোধে ছোট মাসিমা মিহি লেসেব পাড় দেওয়া ফিকে গোলাপি জ্যাকেট পবেছেন। গলায় এক ছড়া ছোট ছোট মুক্তোব মালা। মাথায় আড়ভাবে ধবেছেন বোদনিবাবণী গোলাপি ছাতা। তার সূক্ষ্ম আবরণ ভেদ কবে রৌদ্রকিরণ গোলাপি বং ধাবণ করে ছোট মাসিমার মুখেব উপর এসে পড়েছে। মুখখানিকে কেমন একটু কোমল দেখাচ্ছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে, সরু লেসেব পাড় দেওয়া রুমাল দিয়ে ঘন ঘন মুছে ফেলতে হচ্ছে।

চাবিদিকে ছোট বড চন্দ্রাতপের নিচে কত যে ফুলের বাহার সে আর কি বলব। দিশী ফুল, বিলিতী ফুল, বারোমেসে ফুল, মরসুমী ফল, মোমের মত লিলি ফুল, ম্যাগ্নোলিয়া ফুল, অবাস্তব অর্কিড ফুল। ছোট মাসিমা কখন যেন দিদিমাব আশ্রয় থেকে অসংলগ্ন হযে পড়েছেন সে বিষয় তাঁব কিছুমাত্র লক্ষ্য নেই। মুগ্ধ হযে দেখছেন ত দেখছেনই। বহু দীর্ঘ দিন পরে মনেব মাঝে এত গভীব শান্তি উপলব্ধি কবেছেন; এমন সময় কে যেন গলার মালা ধবে সজোরে টান দিল। মালার সোনাব বাঁধন মুক্ত হল, কে যেন টেনে নিল।

ছোটমাসিমা ছোট একখানি হাত তুলে, হঠাৎ ফিবে দাঁড়াতেই, ভিড়ের মধ্যে একটা ধর ধর রব উঠল। মুহূর্তের মধ্যে চোরেব হাত থেকে মালা উদ্ধাব কবে এনে দিয়ে একজন বলিষ্ঠ যুবাপুরুষ ছোট মাসিমাকে দারুণ তিরস্কার করতে লাগল।

—"আসল অপরাধী আপনারা। এমন স্থানে এত মূল্যবান অলঙ্কার কখনো পরা উচিত নয়।"

ছোটমাসিমাও কি একটা উপযুক্ত প্রত্যুত্তর করবেন বলে চোখ ফেরাতেই, চারি চক্ষুর মিলন হল। দেখে দেখে ছোট মাসিমা আর চোখ ফেরাতে পারেন না। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁর হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হয়ে, বিশাল মহীরুহে পরিণত হল। ঠিক সেই সময়ে দিদিমাও চঞ্চল পদে সেখানে পৌঁছলেন।

"এ কি, প্রকাশ না? তোমার মা কেমন আছেন? মলিনা, এ হল আমার সেই লেডিডাক্তার সই প্রিয়বালার ছেলে, প্রকাশ।"

মলিনা বোধ হয় শুনতেই পেল না।

পরে দিদিমা অন্য কন্যাদের কাছে মন্তব্য করেছিলেন যে মলিনা ও প্রকাশ উভয়েই নাকি কেমন অভদ্র ও অন্যমনস্ক আচরণ করেছিল। সেজ মাসিমাকে দিদিমা বারংবার ধন্যবাদ দিতে লাগলেন। বলিহারি বুদ্ধি তোর! মাথায় এত বুদ্ধিও খেলে! সেজ মাসিমা একটু সলজ্জ হেসে বললেন,

"আমার বুদ্ধি না মা, উনিই সব প্ল্যান্ করেছেন। মালাচোরও উনিই। প্রকাশ তো দস্তুরমত ঘাবড়েই গিয়েছিল। যাক, এখন তুমি খুসি তো?"

সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় যে এবাড়ির সব কথার মতো এ কথাও যখন ছোট মাসিমার কানে গেল, রাগ করা দূরে থাকুক, বাম করের চতুর্থ আঙ্গুলে শোভমান ছোট হীরের আংটির দিকে দৃষ্টিপাত করে তিনি একটু মৃদু হাস্য করলেন মাত্র।

বড়মাসিমা, মেজমাসিমা ও মা বাক্যহত হয়ে একবার প্রকাশের প্রতি একবার মলিনার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন, কারণ প্রকাশের রং শ্যামল, মাথায় বেশি উঁচু নয়, একটু লাজুক প্রকৃতির এবং লজ্জা পেলেই তোতলামি এসে যায়।

বাস্তবিক, কত বুদ্ধি করেই না সেকালের মানুষেরা প্রেমের দেবতাকে একজন অন্ধ অপোগণ্ড শিশু বলে কল্পনা করেছিলেন।

মেজপিসেমশায়

অতিশয় কর্তব্যপরায়ণ হলে যে কি দারুণ সর্বনাশ হয় যেই আমার মেজ-পিসেমশায়ের জীবন-কাহিনী ঘেঁটে দেখবে তাব আর বুঝতে বাকি থাকবে না। আমার মেজপিসেমশায় আধা-বয়সী মোটা সোটা হাসিখুসি মানুষটি, মাথায় অল্প অল্প টাক পড়েছে, গায়ের রংটা শামলাই বলতে হবে, স্বাস্থ্যটি ভালোই, সাংসারিক অবস্থাও মন্দ নয়, মোট কথা সুখী হতে হলে যা যা দরকার তার কোনোটারই বিশেষ অভাব নেই। ছেলেমেয়েরা বেশ লেখাপড়া করছে, বড় মেয়েব ভালো বিয়ে হয়েছে, আমাব মেজপিসিটিও মাটির মানুষ। তবু ঐ অতিরিক্ত কর্তব্যপ্রিয়তার ফলে মেজপিসেমশায়ের জীবনের সঙ্গে একটা বিষের ভাঁড়ের একেবারে কোনো প্রভেদ নেই।

কথাটা বোধ হয় একটু খুলে বলা উচিত। আমাদের আব পাঁচজনেব মতো মেজপিসেমশায়ও ছোটবেলা থেকে কর্তব্যপালন করা সম্বন্ধে নানান পরামর্শ পেয়ে এসেছেন। বরং একটু বেশিই পেয়েছেন, কারণ নিন্দুকরা বলে যে তাঁর বাবা নাকি আপিসে মাইনে পেতেন সাড়ে তিন শো টাকা, অথচ খরচ খরচা বাদ দিয়ে ব্যাঙ্কে জমাতেন সাড়ে চাব শো টাকা। যাই হক ছোটবেলা থেকেই মেজপিসেমশাইয়ের মনে কোনো সন্দেহ ছিল না যে যা কিছু ভালো লাগে সে সমস্তই অ-কর্তব্য, আব যা কিছু খারাপ লাগে সে সবই কর্তব্যের খাতিরে করতে হয। ছোটবেলা থেকেই তাই তিনি বিনাবাক্যব্যয়ে চিরতা খেয়ে, নামতা মুখস্থ করে, বড়দের কথা শুনে, বায়োস্কোপ থিয়েটার না দেখে, বিড়ি না খেয়ে বেশ বিয়ের বয়সে পৌঁছে গেলেন।

বাপের একমাত্র ছেলে, মেয়ে দেখে দেখে বাপ মা তো দেশ উজাড় করে ফেললেন। বয়স কম, কলেজে টলেজে পড়েছেন, মেজপিসেমশায নিশ্চয় মনে মনে একজন আয়তলোচনা, শ্বেত পদ্মবর্ণা পিককণ্ঠী ষোড়শীর বিষয় নানান জল্পনা কল্পনা করতেন। কিন্তু তাঁর বাবা যখন এসে একদিন বললেন— "শম্ভূ, আমার বন্ধু গোঁড়ার মেয়ে পুঁটির সঙ্গে তোমার বিবাহ স্থির করেছি, কথা পাকাপাকি হয়ে গেছে। কিন্তু আশীর্বাদের আগে তুমি আর তোমার পিসিমার ছেলে বটকেষ্ট গিয়ে মেয়ে দেখে আসবে। বড় হয়েছ, ওরকম না দেখে বিয়ে করাটা উচিত হবে না।"

সেকালের কর্তব্যপরায়ণ ছেলে, যথাসময়ে বটকেষ্টর সঙ্গে মেয়ে দেখতে গেলেন।

সে এক ব্যাপার, একঘর লাল নীল বেগনি সাড়ি পরা মেয়ে বসেছিল, মেজপিসেমশাই চিরকাল জানেন যে ভালো ছেলেরা মেয়েদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে না। আড়চোখে একটু দেখে টেখে নিলেন, তবে সত্যি কথা বলতে কি কোন মেয়েটি যে পাত্রী সেটা ঠিক ঠাওর করতে পারলেন না। বাকি সময়টা মাথা নিচু করে জলখাবার খেয়েটেয়ে তো বাড়ি চলে এলেন।

বটকেষ্টটা কোনো দিনই বিশেষ সুবিধার ছেলে ছিল না। সে আবার ঘর থেকে বেরিয়েই বলে কি না।

—"ছোঃ কি যে রূপ একেকটির। খবরদার বলছি শম্ভু, মত দিবি না। কলকাতা সহরে সুন্দরী মেয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে, আর মামাও বেশ লোক বলতে হবে, কোথা থেকে খুঁজে পেতে যে এতগুলো কালোপ্যাঁচা বের করেছেন। খবরদার বলছি ওদের তুই বিয়ে করতে পাবি না। তার চেয়ে চল একটা ভালো বায়োস্কোপ দেখা যাক, বিয়েব জন্য অত তাড়া কিসের!"

বলে বটকেষ্ট একটা কাঁচি সিগারেট ধরাল। আমার পিসিদের আমি খুব ভালোবাসি, আর আমার বাপের বাড়ির লোকদের সকলকেই ভারি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, তাদের সব চেহাবা দেখলে ভগবানের হাতের কাজ সম্বন্ধে একটু সন্দেহ হওয়াটা কিছু অস্বাভাবিক নয়।

কাজেই গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মেজপিসেমশায় মাথা নাড়লেন, আর কর্তব্যজ্ঞানশূণ্য বটকেষ্টটা চার পয়সার ছাঁচি পান কিনে, পকেটে পূরে হাসতে হাসতে সিনেমা দেখতে চলে গেল। খানিকটা গিয়ে আবাব ফিরেও এল—"দেখ শম্ভু, তোর বাবাটা একটা ইয়ে, ওর প্রতি তোর কোনো কর্তব্য নেই, আমি তোকে বলছি। আমার নিজেব মামা, আমি ওকে চিনি না? তুই বরং আজ আমার বন্ধু পানুর বাড়ি লুকিয়ে থাক, কাল আমি তোব জন্য চমৎকার পাত্রী খুঁজে দেব। তার হাঁটু পর্যন্ত কালো কোঁকড়া চুল, চিনে করমচার মত গোলাপি সাদা গায়ের রং, কান পর্যন্ত টানা পদ্মপলাশলোচন রে তার, দেখলে তোর মুণ্ড ঘুরে যাবে। আমাব কথা শোন, পানুর বাড়ি যা, আমি সিনেমাটা দেখেই আসছি।"

মেজপিসেমশাই শিউরে উঠে কানে হাত দিয়ে আর কালবিলম্ব না করে সেখান থেকে পিট্টান দিলেন। কর্তব্যের পথ যে কত কঠিন মনে মনে বেশ বুঝলেন।

অবশেষে একটা ভালো দিন দেখে, আমার মেজপিসির সঙ্গে তো পিসেমশায়ের বিয়ে হয়ে গেল। শুভদৃষ্টির সময় কনের রূপ দেখে পিসে-

মশায়ের চক্ষুস্থির। আর ঐ বটকেষ্টটা তার অল্প দিন পরে সাক্ষাৎ একটি ডানাকাটা পরী বিয়ে করে আনলে। তার বাবার আবার মেলা টাকা পয়সা। তাঁরি আপিসে বটকেষ্টর ভালো চাকরি হল। সে এখন তোফা আছে। তাকে দেখে মেজপিসেমশায়ের নিশ্চয়ই ভাগ্যদেবীর এইরকম পার্সেলিটির জন্য অভিমান হয়!

আমার নিজের ছোটবেলায় মনে পড়ে মেজপিসিমারা এলে বাড়িময় একটা সোরগোল পড়ে যেত। কারণ অতিশয় কর্তব্যপরায়ণ লোকরা নিজেরা তো জ্ঞাতসারে কোনো অন্যায় করেই না, আবার অন্যলোকদেরো কোনো অন্যায় করতে দেয় না। যে কটা দিন ওঁরা থাকতেন আমাদের তো অবস্থা কাহিল। বলতেন যে দেশের এমন দুরবস্থা সে দেশের ছেলেমেয়েদের কর্তব্য সব রকম আমোদ-প্রমোদ বিলাসিতা পরিহার করা। আরো বলতেন যে ছেলেপিলেদের সর্বদা বিনাবাক্যব্যয়ে বড়দের আজ্ঞা পালন করা কর্তব্য। তাঁর কথায় মনে হত যারা কর্তব্যপরায়ণ হয় তারা কোনো ভালো জিনিষ খায় না, পরে না, সিনেমা থিয়েটার দেখে না, রসিকতা ঠাট্টা করে না, সুন্দর দেখতে কাউকে বিয়ে করে না—এমনি ধারা কত কি!

আমাদের মধ্যে গুপির সাহস ছিল সবচেয়ে বেশি সে জিজ্ঞাসা করে বসল—"কেন, কর্তব্য পালন করে কি লাভ হয়? বরং যারা কর্তব্য পালন করে না, তারা ঢের বেশি সুখে থাকে। খায় দায় ঘুরে বেড়ায়, যখন যা ইচ্ছে করে, কারো জন্য তোয়াক্কা রাখে না, কারো ভাবনা ভাবে না—কর্তব্যটর্তব্য কোনো কাজের কথা নয়।"

রাগ করা কর্তব্য নয় বলে পিসেমশায় রাগ করেন নি, অনেকক্ষণ ধরে ইহলোকের ভোগবিলাসের অসারতা সম্বন্ধে বোঝালেন, দুঃখের বিষয় গুপি তখুনি সরে পড়ল, তার আর কিছু শোনা হল না।

মেজপিসেমশাই নাকি জীবনে কখনো কোনো অন্যায় করেন নি। কি সাংঘাতিক লোক একবার ভেবে দেখুন! উনি কাউকে হিংসা করেন নি, কারো ক্ষতি করেন নি, কোনো জিনিষ দেখে লোভ করেন নি, মিথ্যা কথা বলেন নি, ঘুষ খান নি, ঠকান নি, সাজেন নি, গোজেন নি, আমোদ আহ্লাদ করেন নি,—এসব নিজেও করেন নি আর যতটা পেরেছেন অন্যদেরো করতে দেন নি। এইরকম ভালো আমার মেজপিসেমশাই। অথচ তাঁকেই কি না শেষটা মেয়ে পুলিশে ধরল!

সে ভাবা যায় না। মাত্র গত বছরের কথা। মেজপিসেমশায়ের ছেলে বদ্যিনাথ আর ঐ যে বটকেষ্ট তার ছেলে ন্যাপলা দুজনেই দিব্যি ডাক্তারি পাশ করে বেরিয়েছে, ভালো ভালো চাকরিও পেয়ে গেছে। বাড়িতে আর আনন্দ ধরে না, মেয়ের বাড়ি থেকে সারি সারি লোক আসে বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে।

কর্তব্যপরায়ণ মেজপিসেমশাই তাদের সকলকে সান্ত্বনা দিয়ে ফিরিয়ে দেন। অনেক সময় তাদের সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে অন্য সব ভালো পাত্রের সন্ধান পর্যন্ত বলে দেন। নিজেদের ছেলেদের প্রতিও তাঁর কর্তব্য আছে, তাদেরো তো যার তার সঙ্গে বিয়ে দিতে পারেন না।

এদিকে ছেলে দুটোও যেন কি রকম। কোথায় কোথায় যে ঘোরে তার ঠিক নেই, কর্তব্যের সঙ্গে তো আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই। যাই হোক, পাশটাশ করেছে, কাজকর্ম করছে, সব বিষয় অতিরিক্ত কড়া হওয়াটাও আর কর্তব্য নয়, তাই ওদের একটু ক্ষমা করেই চলতে হয়, তা ছাড়া মাঝে মাঝে ক্ষমা করাটাও তো একটা কর্তব্য।

এই সময় মেজপিসেমশাই একটা কানা ঘুষো শুনলেন যে তাঁর ছেলে বদ্যিনাথ নাকি কোথায় গিয়ে নিজের বিয়ে ঠিক করে বসে আছে। মেজ পিসে-মশায়ের তো চক্ষুস্থির। কারণ তাঁর কর্তব্যের পথ স্থির হয়েই আছে। কিছুদিন আগে দেশ থেকে হারাণবাবু এক দলিল নিয়ে উপস্থিত। মেজপিসেমশায়ের বাবা নাকি হারাণবাবুর বাবার কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা ধার করে, শোধ বোধ না করেই দিব্যি ড্যাং ড্যাং করে স্বর্গে চলে গেছেন। এতদিন টাকার দরকার হয়নি বলে হারাণবাবু কিছু বলেন নি, তা ছাড়া দলিলটাও খুঁজে পাচ্ছিলেন না। এখন গিন্নির গয়নার বাক্সের নিচের তলা থেকে দলিলও পাওয়া গেছে, আবার ওদিকে হারাণবাবুর মেয়েও বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠেছে। টাকা না পেলে মেয়ের বিয়ে হয় কি করে? এক যদি—মেজ পিসেমশায় কপালে চোখ তুলে বললেন—"এক যদি কি?"

"ইয়ে কি বলে, এক যদি আপনিই আমার মেয়েটির সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেন, তা হলে দলিল তখুনি ছিঁড়ে ফেলব। গ্যাটছড়া বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে দলিলও কুচি কুচি।"

পিসেমশায়ের কর্তব্যের পথ তখুনি পরিষ্কার হয়ে গেল। বাপের ঋণ পরিশোধ করাও যেমন কর্তব্য ছেলের ভবিষ্যৎ সম্পত্তির লোকসান করা তেমনি অকর্তব্য, কাজেই তিনি তখুনি হারাণবাবুকে কথা দিয়ে ফেললেন। তারপর এ কি গেরো!

ছেলের গোপনে বিয়ে ঠিক করার খবরটা এনে দিল ন্যাপলা। বলল—"খবরদার যেন সে টের না পায়, সে তো আর আপনার মত কর্তব্যপরায়ণ নয়, হয় তো আমাকে ফালা ফালা করে ছিঁড়েই ফেলবে।"

মেজপিসেমশাই কিছুতেই বিশ্বাস করেন না। নিজের ছেলেকে বিশ্বাস করা তাঁর কর্তব্য। শেষটা ন্যাপলা বলল—

"বিশ্বাস না করেন তো আমার কি। কিন্তু জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখুন, ঐ যে মেয়েটি ও ফুটপাথে গাছতলায় দাঁড়িয়ে মুচিকে দিয়ে চটি সেলাই

করাচ্ছে, ঐ হল সেই মেয়ে। বদ্যিনাথের জন্য অপেক্ষা করছে। কে জানে হয় তো আজই রেজিষ্টারি করে বিয়ে টিয়ে সারা হয়ে যাবে। আজ কালকার মেয়ে তো।"

পিসেমশাই অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখেন ও ফুটপাথে দাঁড়িয়ে একটি অপ্সরীর মত স্নুন্দরী মেয়ে চটি সেলাই করাচ্ছে। নিশ্চয় যাতে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যেতে পারে তাই চটিটা মেরামত করে নিচ্ছে। উঃ। কি সাংঘাতিক মেয়ে। ওর সঙ্গে কচি ছেলে বদ্যিনাথের বিয়ে।। পিসেমশায়ের গা দিয়ে ঘাম বেরোতে লাগল। তখুনি তিনিও চটি পায়ে দিয়ে চাদর গায়ে দিয়ে পথে গিয়ে দাঁড়ালেন। মেয়েটির ততক্ষণে চটি সেলাই হয়ে গেছে, মুচিকে পয়সা দিয়ে একবার এদিক ওদিক তাকালে। তাকিয়ে বোধ হয় পিসে-মশাইকে দেখেই হবে, সে রওনা দিল। কি ভীষণ মেয়ে, বদ্যিনাথের বাবাকে সুদ্ধ চিনে রেখেছে।

পিসেমশাই ছেড়ে দেবার পাত্র নন। ছেলেকে উদ্ধার করা তাঁর কর্তব্য তাই তিনিও তৎক্ষণাৎ তার পিছু নিলেন। তারপর সেই মেয়েটি তাঁকে এক ঘন্টা ধরে কি নাস্তানাবুদই যে কবল। এ গলির এ মুখ দিয়ে ঢুকে ও মুখ দিয়ে বেরোয়, আবার তখুনি পাশের গলির ওমুখ দিয়ে ঢুকে এ মুখ দিয়ে বেরোয়, ডাইনে মোড় নেয়, বাঁয়ে মোড় নেয, পিসেমশাই বেচারা গলদ্ঘর্ম। তারপর হঠাৎ একটি একতলা বাড়িতে ঢুকে পড়ল।

পিসেমশাই ধুতির খুঁট দিয়ে মুখের গলার ঘাম মুছে নিলেন। হঠাৎ মনে হল, কি সর্বনাশ এটাই বেজিষ্ট্রারেব বাড়ি নয়তো ? বদ্যিটাও তো দুপুর থেকে বাড়ি নেই। মেজপিসেমশাই আস্তে আস্তে জানলার ধারে গিয়ে, পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে ভর দিয়ে, জানলার শিক ধরে ঝুলে ঘরের মধ্যে দেখতে চেষ্টা করছেন, এমন সময় মেয়ে পুলিশে তাঁকে ধরল। লজ্জা করে না, মশাই, এদিকে তো ভদ্রলোকের মতো কাপড়চোপড় পরেছেন। তখন পিসেমশাই মহা বিপদে পড়লেন, ডাকাডাকি করলেও বাড়ি থেকে বেজিষ্ট্রারও বেরোন না, বদ্যিনাথও না, বেরোল সেই স্নুন্দরী মেয়েটি। পিসেমশাইকে দেখে কপালে দু চোখ তুলে শিউরে উঠে বলল—

"বাবাগো, এখনো এখানে আছে, সেই কোথা থেকে পিছন পিছন আসছে, ভয়ে আমার গায়ে এখনো কাঁটা দিচ্ছে, ভাই।"

পিসেমশাই হাতজোড় করে কত তাদের বোঝালেন, কিন্তু কে শোনে। মেয়ে পুলিশ তাঁকে থানায় নিয়ে যাবেই। তার চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরোতে লাগল।

"আপনাকে জেলে দেওয়া উচিত। ফাঁসি দেওয়া উচিত।"

স্নুন্দবী মেয়েটাও কম্পিত কণ্ঠে বললে—"তার আগে ওর রেসনকার্ডটা কেড়ে নেওয়া উচিত।"

পিসেমশাই তখন মরীয়া হয়ে বদ্যিনাথকে ফোন্ করিয়ে আনালেন-রাস্তায় ভিড় জমে গেছে। দুষ্ট লোককে মেয়ে পুলিসে ধরে নিয়ে যাচ্ছে—লোকে দেখবে না।

শেষটা বদ্যিনাথই এসে তাঁকে উদ্ধার করল। বলল—

"বাবা! আমি তো একমাত্র উপায় দেখছি, পুলিশটিকে বিয়ে করে ফেলা, তা হলে সে তো আর সাক্ষাৎ শ্বশুরকে থানায় নিয়ে যেতে পারবে না।"

মেয়ে পুলিশ তখন লালটাল হয়ে মুখ ফিরিয়ে বললে—"যাঃ!"

বদ্যিনাথের তখন সাহস বাড়ল, "বাবা, তোমাব মত আছে তো? থানায গিয়ে চৌধুরী পরিবারের নাম ডোবানো তোমার কর্তব্য হবে না।"

পিসেমশায় ঢোক গিললেন, মেয়ে পুলিশ প্যাণ্টের বকলশ খুঁটতে লাগল, বদ্যিনাথ তাড়া দিয়ে বলল—"কিছু বলছ না যে?"

পিসেমশাই বললেন—"না, আমাব খুব মত আছে।"

তখন কোথা থেকে যেন সুড়ুৎ করে ন্যাপলা এসে উপস্থিত হয়ে বলল—"তা হলে ঠিক? বেচাবী সুন্দবী মেযেব বিযে হবে না? একে আমিই বিয়ে কবে ফেলি—নেলি, মামাকে প্রণাম কব। মামা, এ হল হাবাণবাবুব মেয়ে নেলি। বদ্যি যখন পুলিশ বিয়ে করছে, একে আমিই বিয়ে কবে ফেলি। কি বলেন?"

পিসেমশায়েব কর্তব্যবোধ বলল, ভবিতব্যের সঙ্গে বৃথা যুদ্ধ করে লাভ নেই, তিনি তখন হাসিমুখে মত দিয়ে ফেললেন। বাড়ি এসে বদ্যিনাথকে বল্লেন—"দুটো বিযেতেই আমাব মত আছে। কিন্তু ব্যাপাবটা ঠিক বুঝতে পারছি না।"—

ন্যাপলা বাধা দিয়ে বলল—"ব্যাপার তো খুব সোজা, বদ্যি ঐ মেয়ে পুলিশকে বিযে কবতে চায, আমি হারাণবাবুর মেয়ে নেলিকে বিয়ে কবতে চাই। অথচ আপনি নেলিব সঙ্গে বদ্যির বিয়ে ঠিক করেছেন। ভাগ্যিস দৈবাৎ এই যোগাযোগটা হল, অবিশ্যি"—

বলে ন্যাপলা যাব কোনো কর্তব্যজ্ঞান কোনো দিনও ছিল না, একটু সলজ্জ হেসে বলল—

"অবিশ্যি দৈবাৎ কে মাঝে মাঝে একটু সাহায্য করা আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করি।"

পিসেমশাই একটু চিন্তিতভাবে বললেন,

"আর আর—বাবাব সেই দলিলটা—"

"ওঃ, ওটা? ও নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। ওটা আসলে সত্যিকার দলিলই নয়।"

কলহ

যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কখনো দাম্পত্য-কলহ ঘটে নি, তাবা যে প্রেমের অতল গভীরতাকে সম্পূর্ণ ধারণা করতে পাবে না এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। বাস্তবিক প্রেমের রণডঙ্কা যাঁদেব কানে কখনো ধ্বনিত হয় নি তাঁদের বিবাহিত জীবন অন্ততঃ কিযদংশে অসাব। সমুদ্র-মন্থনেব তিক্ত গবলের আস্বাদ হযতো বা তাঁবা নাও পেয়ে থাকতে পাবেন, কিন্তু হরিণ-নয়না পদ্মাসনাকেও কভু বক্ষে ধারণ করেন নি।

শুধু ভূয়ো কথার লঘুত্ব উপলব্ধি কবে আমাদের পারিবারিক ইতিহাস থেকে এবাব এর একটা স্থূল উদাহবণ দিয়ে, আমার কথাটার যাথার্থ্য প্রমাণ কববার চেষ্টা করছি।

আপনারা কেউই নিশ্চয়ই এ বিষয অবগত নন যে আরেকটু হলেই শুধু আমি কেন, আমাব পূজনীয় পিতৃদেব সুদ্ধ নাও জন্মাতে পারতাম। এমনি ভাবে এক একটা চুল পবিমাণ কাবণের উপব পাঁচ-সাতটা অমব আত্মার গতিবিধি নির্ভর কবে। সব কথা গোড়া থেকেই তাহলে বিবৃত করতে হয়।

দুই পুরুষ আগেও আমার পিতৃকুলেব সকলেই অসম্ভব বকমের ফর্সা ছিলেন; তাব কারণ হল যে গোটা বাংলা দেশ চুঁড়ে চুঁড়ে যেখানে যত গৌরবর্ণা মেয়ে ছিল সকলকে সংগ্রহ করে এনে আমার পিতৃপুরুষদের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হত। গোড়ায যতই না পার্থক্য থাকুক কিছুদিন আমাদের পৈত্রিক বাড়িতে বসবাস করবার পর তাঁরা সকলেই নাকি আকৃতি প্রকৃতিতে এমনই এক ধবণের হযে যেতেন যে আলাদা করে আর তাঁদের চেনা কঠিন হয়ে দাঁড়াত। সকলেবি ফর্সা বং, গোলগাল গড়ন, পরণে এক গা মোটা মোটা সোনার গহনা ও কস্তাপাড়েব কাপড়, সকলেবি কপালে বড় কবে সিন্দুর-বিন্দু, অধরে পানের রক্তিমা আব সকলেই সমান মুখ্যু। পুরুষানুক্রমে এই বকমই চলে আসছিল, এর যে কোনো ব্যতিক্রম ঘটতে পারে, সে কথা কারো কখনো মনে হয় নি।

পুরুষরা সকলেই শিক্ষানুরাগী হলেও, কিঞ্চিৎ প্রাচীন-পন্থী ছিলেন। সমাজে পাঁচজনার সঙ্গে মিশতেন বটে, কিন্তু বিবাহাদিব সময় সেই মান্ধাতার আমল থেকে যেমন চলে আসছিল, কুল দেখে, ঠিকুজি মিলিয়ে, যুক্তিসঙ্গত দানপত্র স্থির করে, গায়ের রং যাচাই কবে তবে পাত্রী নির্বাচন করা হত।

কিন্তু আমার স্বর্গীয় পিতামহের বেলা এ সকল প্রাচীন পদ্ধতি পাল্টে গেল।

শোনা যায় তার একমাত্র কারণ হল যে আঁতুড় ঘরে আমার প্রপিতামহী অনবধানতাবশতঃ দক্ষিণ দিকে চরণ দিয়ে শুয়ে ছিলেন। যে জন্যই হক, ফল তার ভালো হয় নি। আঁটকুড়ের দিনই পাড়াপ্রতিবেশীরা ঠাকুরদার কানের ঈষৎ নীলাভ বর্ণ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, এবং যত দিন যেতে লাগল স্তম্ভিত আত্মীয়স্বজনকে ক্রমশঃ স্বীকার করে নিতে হল প্রকৃতির নিয়মের কোথাও কোনো সাংঘাতিক ব্যতিক্রম ঘটেছে। হুবহু নিজের পিতাঠাকুরের মুখাবয়ব পেলেও, ছেলের রংটি হয়েছে দস্তুর মতো কালো। তাই নিয়ে প্রপিতামহীকে গোপনে অশ্রুবিসর্জন করতে দেখে তাঁর শ্বশ্রূমাতা তাঁকে তিরস্কার করে বলেছিলেন, "তোমার যত আদিখ্যেতা বৌমা। ছেলের অত রং দিয়ে কি হবে? সোনার আংটির আবার তেড়াবেঁকা!!"

কিন্তু আরো কয়েক বছর কাটলে বোঝা গেল যে কোনো অজ্ঞাত পাপের ফলে ঘরে তাঁদের কালাপাহাড় এসে জন্মগ্রহণ করেছে। ঠাকুর ঘরে সযত্নে রক্ষিত কুলদেবতাদের শিশুকাল থেকেই সে নানানভাবে তাচ্ছিল্য প্রকাশ তো করতই, উপরন্তু ভেংচি কেটে, কলা দেখিয়ে, ঢিল ছুঁড়ে নির্যাতন করতেও পিছুপাও হত না। ছেলের নিষ্ঠাবতী মায়ের ক্ষোভের আর সীমানা ছিল না, এবং তারপর পাঁচ বছরের মধ্যে যদি পরপর আবো তিনটি গোঁড়া হিন্দু পুত্র জন্মগ্রহণ না করত, শেষ পর্যন্ত যে কিসের থেকে কিসে দাঁড়াত বলা কঠিন।

উপরন্তু যখন প্রথম পুত্রের কুষ্ঠি করানো হল, মর্মাহত প্রপিতামহ দেখলেন তার মধ্যে লিখিত রয়েছে, "পিতৃধর্ম-বিদ্বেষী নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসকের কন্যার পাণিগ্রহণ" অমনি কম্পিত হস্তে সেটিকে তিনি লোহার সিন্দুকে বন্ধ করে ফেললেন, যাতে কারো চোখে না পড়ে।

এই সকল কারণে যখন পাবিবারিক নিয়ম মতে পুত্রের একুশ বৎসর বয়সে তাঁদের কুলগুরু তাঁর বিবাহের সম্বন্ধ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, বুদ্ধিমান প্রপিতামহ বহুকষ্টে তাঁকে নিবৃত্ত করলেন। অবিশ্যি তাঁর যদি বা মত হত, ছেলের কখনই হত না।

শেষ পর্যন্ত সম্মানের সহিত পাঠাদি সমাপন করে উচ্চ সরকারী পদে বহাল হয়ে পিতামহ বোম্বাই যাত্রা করলেন, এবং অনতিবিলম্বে প্রতিবেশী নব্যপন্থী ডাক্তার হেমচন্দ্র সেহানবিশের বি-এ পাশ কন্যার সঙ্গে প্রেমপাশে আবদ্ধ হয়ে, তিন আইন অনুসারে তাঁকে বিবাহ করে বসলেন। সে সংবাদ কলকাতায় পৌঁছুলে পিতা সাতদিন কারো সঙ্গে বাক্যালাপ করলেন না, মাতা শয্যাগ্রহণ করলেন। শেষ পর্যন্ত জ্যেষ্ঠ পুত্রকে একেবারে ত্যাগ করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হল। তবে বধূর সকল সংশ্রব যথাসম্ভব তাঁরা পরিহার করে চলতেন।

যতদিন বোম্বাইবাসী ছিলেন ততদিন এ সকলে বিশেষ কিছু এসে যেত

না, কিন্তু পাঁচ বছর পরে যখন পিতামহ বদলী হয়ে কলকাতায় ফিরে এসে, বাসাবাড়ি ভাড়া করে, সেখানে পত্নী ও দুটি অতি ক্ষুদ্র এবং অতিশয় সুশ্রী কন্যাকে অধিষ্ঠিত করলেন, তখন থেকে নানান বিপর্যয় সুরু হল।

আসল কথা হল, যদিও এতদিনে বাবা মা ছেলে বৌকে ক্ষমা করতে অনেকখানি প্রস্তুত ছিলেন, এত দীর্ঘকালের অনাদরের ফলে ততদিনে মল্লিকার মন মেজাজ বিগড়ে গেছিল। এখন উদ্বিগ্ন স্বামীর ব্যাকুল অনুনয়েও বিশেষ ফল হয় না।

মা তাঁর মেজবৌমা ও সেজবৌমাকে সঙ্গে করে এতদিনের অদেখা বড়-বৌমাকে নিজের গলাব মুক্তার মালা দিয়ে আশীর্বাদ করতে এলেন। সরবৎ ও মিষ্টান্নাদি গ্রহণেব অনুবোধ প্রত্যাখ্যান করে একগলা ঘোমটা দেওয়া বউ দুটিকে নিয়ে আলগোছে ভূমিতে আসন গ্রহণ কবলেন। বড় বৌমা দূর থেকে প্রণাম করল কিন্তু মালা নিতে হাত বাড়াল না। শেষ পর্যন্ত ঠাকুরদা উঠে এসে মালাখানি পরিয়ে দিলেন। ঘবের হাওয়া যেন জমে বরফ হয়ে গেল, মোহর দিযে নাতনীদের মুখ দেখে গম্ভীর মুখে মা বিদায় নিলে, বিয়ের পর এই প্রথম নবেন্দ্র মল্লিকার উপব রাগ প্রকাশ কবলেন।

"ছি, ছি, তোমার কি একটু সামান্য শীলতা জ্ঞানও নেই? তোমার লেখাপড়া শেখাই বৃথা হযেছে। আমাব মার হাত থেকে মালাটা নিতেও তোমার অপমান বোধ হল? জানো, ঐ মালাটা হল আমাব মাকে দেওয়া আমার বাবাব প্রথম উপহার? ছি, তোমার এত ছোট মন?"

মল্লিকা গলা থেকে মালা খুলে স্বামীর হাতে দিযে বললে, "তা হলে এত মূল্যবান জিনিষ আমার মত ম্লেচ্ছেব গলায থেকে যদি অশুদ্ধ হয়ে যায়? বরং এটাকে লোহার সিন্দুকে তুলে বেখে দাও।"

বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে নরেন্দ্র তাঁর কোমল হৃদয়া মল্লিকার দিকে চেয়ে বইলেন।

কঠিন কণ্ঠে মল্লিকা বললে—"কেউ একটা মিষ্টিও হাত দিয়ে ছুঁল না, আমাদের একটা আসনে বসল না, আমার মেয়েদেব আলগোছেও একটু আদর করল না, দূব থেকে মোহর দিয়ে কর্তব্য পালন কবল। তুমি স্নেহের কথা আর বল না।"

মল্লিকার চোখে জল দেখে, ব্যস্ত হয়ে নবেন্দ্র বললেন, "কেন বোঝ না মল্লিকা, ওসব করলে যে ওঁদের জাত যাবে। ওরা যে সবে খেয়ে উঠেছিল।"

"নিজের নাতনীদের ছুঁলে ওঁর জাত যাবে? কেন, ওরা, তো হাত মুখ ধুয়ে এসেছিল। ওসব কোনো কাজের কথা নয়। আমি জানি ছেলে হলে কোলে নিতেন, মেয়ে বলেই এত অবহেলা।"

মল্লিকা কিছুতেই বোঝে না, কেঁদেকেটে শয্যা গ্রহণ করে, ওঠেও না,

রাত্রে জলস্পর্শও করে না। এই পাঁচ বছরের মধ্যে এমনধারা কখনো হয়নি। নরেন্দ্র উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন।

মেজবৌ সেজবৌ বাড়ি গিয়ে তিলকে তাল করে বিরাট এক উপাখ্যান ফেঁদে বসে।

"মাগো, কি কালো গো! আর তার উপর কি বাহারে কাপড় পরেছে, দেখে হেসে বাঁচিনে। তাও আবার কেমনধারা কাঁধের উপর দিয়ে এনে আবার প্রজাপতি দেওয়া সোনার সেপ্টিপিন এঁটেছে! মাথায় সিঁদুরের বালাই নেই, কোমরে আবার একটা এইটুকুন রেশমী রোমাল গুঁজেছে! আমরা তো ভাই দেখে হকচকিয়ে গেলাম। বটঠাকুর রয়েছেন, কিছু বলবার জো নেই। আর ও কিনা দিব্যি মাথার কাপড় নামিয়ে দিয়ে, মখমলের চটিজোড়া খুলে রেখে তাঁর একেবারে সামনে বসে পড়ল।

শাশুড়ীও বললেন "ঘেন্নার কথা আর কাকে বলে। আর দেমাক কত! মাগো, কবে থেকে ঐ মুক্তোর মালাগাছি পুষে পুষে রেখেছি, বড় বৌমার জন্য। সে বেটি কিন্তু হাতটি বাড়িয়ে জিনিষটা নিলে না পর্যন্ত। আর শেষটা কিনা ছেলে নিজে সেটি নিয়ে বৌয়ের গলায় পরিয়ে দিলেন। একেবারে সকলের সুমুখেই। লজ্জায় মরে যাই। তা ব্যাটাছেলে অত কি বোঝে।"

এমনি করে একদিনে দুদিনে নয়, তিলে তিলে পলে পলে পাঁচজনের সাহায্যে দাম্পত্য কলহটি পাকিয়ে উঠল।

মার জন্য তাঁর পাঁচ বছর উপবাসী নিদারুণ স্নেহকে ঠাকুরদা স্ত্রীর সামনে যথাসাধ্য গোপন করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু হলে হবে কি। সে প্রবল ভালোবাসার বন্যা এদিক দিয়ে ওদিক দিয়ে উপচিয়ে পড়ে, মল্লিকারো চোখে পড়ে যায়।

"তোমার খাতায় ও কিসের হিসাব বল দিকিনি? গরদের সাড়ি কার জন্য কিনলে?"

"এই মার বড় সখ ছিল, ইয়ে, পূজোর সময়—"

"পূজো? পূজোর সঙ্গে আমাদের কি গা? তা কিনে দেবেই যদি তো লুকিয়ে কেন? মাকে একখানা কাপড় তোমার টাকা দিয়ে তুমি দেবে, তা সে কি আমি জোর করে বন্ধ করব?"

শেষটা নরেন্দ্ররও মাথা ঠিক থাকে না। অস্বাভাবিক উচ্চ কণ্ঠে বলেন,

"আমার যেমন করে খুসি মাকে দেব। তোমার তাতে কি এসে যায়? জানতো শুধু নিজেকে, নিজের স্বামীটিকে আর মেয়ে দুটিকে। মায়ের তুমি কি বোঝ? একটা মা পর্যন্ত নেই তোমার। জন্ম জন্ম মাথায় করে রাখলেও যথেষ্ট হয় না, তুমি তার কি বোঝ?"

মল্লিকার চোখের সামনে বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে ভেসে ওঠে কোঁকড়া চুলে ঘেরা হাসিমাখা একখানি শ্যামল সুন্দর মুখ। বুকের ভিতরটা কেমন হয়ে যায়। মনে পড়ে আরেক দিনের কথা। শিকল দিয়ে মার ঘরের দরজা বাইরে থেকে আঁটা। ওমা, মা, মাগো, মামণি। বারে বারে লাফিয়েও শিকলে হাত পৌঁছায় না। কোথায় মল্লিকার মা?

ততক্ষণে নরেন্দ্র রাগ করে মার কাছে সান্ত্বনার জন্য চলে গেছে। মল্লিকা টেবলের উপরকার জিনিষগুলি গুছিয়ে রাখে, তার হাত দুখানি কাঁপতে থাকে।

এমনি করে তাদের সুখের আকাশে ঝড়ের মেঘ জমতে থাকে। মল্লিকার মেজ দেওরের ছেলের অন্নপ্রাশন হল। মল্লিকাকে যাবার কথা নরেন্দ্র একবারো বলে না, মেয়ে দুটিকে নিয়ে যায়। মল্লিকা তাঁর মুখ্যু মাকে যদি ঘৃণা করে, তাদের বাড়ির হিঁদুয়ানি কাণ্ড দেখে যদি নাক সিঁটকায়, আর যদি--আর যদি তারা নরেন্দ্রের মল্লিকাকে আদর না করে? যদি ম্লেচ্ছাচারী বলে উঠোনের ধারে খেতে দেয়? যদি তাকে নিজের পাত কুড়িয়ে আস্তাকুঁড়ে ফেলে আসতে বলে, সেই জেনানা মাষ্টারনী কাদম্বিনী দত্তকে যেমন দেবার বলেছিল?

রাত্রে ফিরে এসে দেখে মল্লিকা রাগ করে ভবানীপুরে মামাতো বোনের বাড়ি চলে গেছে, ঠিকা গাড়ি করে চাকরের সঙ্গে। নরেন্দ্র মেয়েদের কাপড় ছাড়িয়ে শুইয়ে দেয়। মল্লিকা নিজেকে কি ভাবে? পরদিন সকালে বোনকে সঙ্গে করে মল্লিকা বাড়ি ফিরল, যেন কিছুই হয় নি।

তারপর দিন থেকে নরেন্দ্রও রাত করে বাড়ি ফেরা ধরল। মল্লিকা জানে রোজ সে ওবাড়ি যায়, হয় তো বা তাকে নিয়ে আলোচনা করে, হয় তো মার সঙ্গে পরামর্শ হয় কেমন করে মল্লিকাকে বশ করা যায়। হয় তো তার কালো উদ্ধত বৌ নিয়ে পোড়াকপালের জন্য মা সান্ত্বনা দেন। আজ যদি মল্লিকা মরে যায়, সবাই নিশ্চয় খুব খুসি হয়। ফর্সা সুন্দরী দেখে গোঁড়া হিন্দু বাড়ি থেকে তাদের আদরের নরেন্দ্রের জন্য ছোট্ট একটি বারো বছরের কনে এনে দেয়। আর মল্লিকার মেয়েরা? খাটের কাছে গিয়ে মল্লিকা চেয়ে দেখে তারা পরস্পরের গলা জড়িয়ে বালিশের উপর কোঁকড়া চুলের রাশি ছড়িয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। নরেন্দ্র এসে সংক্ষেপে বলে,

"আমি খেয়ে এসেছি।"

আজকাল বাড়ি এসেও নরেন্দ্র রাত জেগে পড়াশুনো করে, আপিস থেকে কি সব কাজকর্ম নিয়ে আসে। পড়ার ঘরে নিজের খাট-পালঙ্ক নিয়ে গেল, মেয়েদের জ্বালায় নাকি রাতে ভাল ঘুম হয় না।

কোনো কোনো দিন রাত্রে ফিরতে বেশি দেরি হয়ে যায়। মল্লিকা নানান অঘটন কল্পনা করে ভয়ে আধ মরা হয়ে থাকে। কখনো কখনো আর সইতে

না পেরে সন্ধ্যা হবার অনেক আগেই গাড়ি ডেকে চাকর নিয়ে মামাতো বোনের বাড়িতেই বা দুদিন মেয়েদের নিয়ে থেকে এল। কিম্বা তাকেই আনিয়ে দু দিন কাছে ধরে রাখল।

এ সকলের মধ্যে নিয়ত মল্লিকা বুঝতে পারে তার হৃদয়ের শতদলটির পাপড়িগুলি একটি একটি করে মুদিত হয়ে যাচ্ছে। সে লেখাপড়া শিখেছে, এ রকম জীবনে তার অপমান লাগে। নরেন্দ্র যেন কোন অপরিচিত মানুষ। মল্লিকা তার গলগ্রহ। মল্লিকা ভাবে মেয়েদের নিয়ে বোম্বাই গিয়ে বাবার আশ্রয়ে উঠবে। কিন্তু বাবা কি মনে করবেন? এ বিয়েতে তো তাঁর খুব আগ্রহ ছিল না।

"ভেবে দেখো মল্লিকা, বিবাহের ভিৎটি শুধু ভালোবাসা দিয়ে হয় না, তার চেয়ে শক্ত করে গাঁথতে হয়, পরস্পরকে শ্রদ্ধা—"

কানে আসে দ্রুত পদ শব্দ। ও কি, আজ এত সকালে নরেন্দ্র! উদ্ভাসিত মুখে নরেন্দ্র এসে মল্লিকার হাত দুখানি ধরে বলে,

"আমাকে ক্ষমা কর, মল্লিকা। মা তোমাকে সত্যিই যথেষ্ট আদর করেন নি, ওরা সবাই তোমাকে অসম্মান করেছে, আর তুমি তবু নিজে থেকে তাঁর কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে এসেছ?. এ আমি ভাবতে পারিনি। আমি তোমার কত আযোগ্য। দেখো এখন থেকে আমি অন্য রকম হব।"

উজ্জ্বল নয়নে মল্লিকা বললে,

"কে বলেছে আমি মার কাছে গিয়েছিলাম?"

"মা নিজে বলেছেন। ভীষণ বকেছেন। আর বলেছেন আমি তোমার যোগ্য নই।"

ধীরে ধীরে মল্লিকা উঠে দাঁড়ায়। নরেন্দ্রের মা নিজের হাতে মল্লিকার স্বামীটিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। মা দিয়েছেন।

"কই না তো। মা তো আমাকে অসম্মান করেননি কখনো, অনাদরও করেননি, আমিই বুঝতে পারিনি।"

"চল, নিচে চল, মা নিজে থেকে এসে, জান, আমাদের চেয়ারে বসেছেন। তুমি না গেলে কিন্তু কক্ষণো বসতেন না।"

ইস্ পুরুষরা কি বোকা হয়।

বুদ্ধিমতী মল্লিকার নরেন্দ্রের মাকে বুঝে নিতে এক দণ্ডও বিলম্ব হল না। ছোট একটা মিথ্যা কথা বলে মা ঝগড়াটাকে মিটিয়ে দিলেন। আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে সে দৌড়ে নিচে গিয়ে সেই লজ্জিতা সঙ্কুচিতার পদতেলে পড়ে বললে—

"মা, আমাকে মা করুন। আমার মা কবে মারা গেছেন বলে আমি সব সময় বুঝতে পারি-না।"

ততক্ষণে নরেন্দ্রও এসে প্রবেশ করেছে। আমার প্রপিতামহী উঠে

দাঁড়িয়ে প্রসন্নবদনে ঠাকুমার নব কিশলয়ের মত শ্যামল মুখখানির দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে বললেন

"বা-ববা! সারাজীবন শুধু ফ্যাক্ ফ্যাকে ফর্সা দেখে দেখে ঘেন্না ধরে গেছে। কাছে আয়, একটু আদর করি।"

এমনি করে দাম্পত্য কলহের মধ্যে দিয়ে আমাদের পারিবারিক ইতিহাস কতবার ভালোবাসার আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তার আর লেখাজোখা নেই।

সেকালের কথা

গুপিদা বলল, হুগলিতে যে আমাদের একশো বছরের পুরোনো বাড়িটা দেখেছিস সেটা আগাগোড়া খুন রাহাজানি দিয়ে তৈরি। আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা ভীষণ সৌখীন লোক ছিলেন, পয়সাও ছিল দেদার, দুই হাতে খরচ করতেন। তাঁর সময়কার তৈরী।

তাঁর সাজ-পোষাক যদি দেখতিস চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসত। কত যে তাঁর কিংখাব মখমলের পোষাক ছিল, তার আর লেখাজোখা নেই। লাল নীল হলদে সবুজ, ফুল-তোলা, বুটি দেওয়া, মুক্তো বসানো সব পাগড়ি, কোমরবন্ধ ছিল। চুনি-পান্না বসানো এক একপাটি জুতোর দামই ছিল এক এক হাজার টাকা। সেকালের টাকা জানিস তো কুইন ভিক্টোরিয়ার বাপ-জ্যাঠার ছাপ দেওয়া, ইয়া বড়া বড়া, এক একটার দামই হবে দশ বিশ টাকার সমান।

সেই সব পরে সেজে-গুজে, কানের পেছনে আতর মাখা তুলো গুঁজে, হাতে একখানি সোনা বাঁধানো হাতির দাঁতের ছড়ি নিয়ে হুগলি থেকে পান্সি করে কোলকাতায় যেতেন, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সাহেবদের তাক লাগিয়ে দেবার জন্য। তাঁর ঐ সব সাজ-পোষাক দেখে তাদের এমনি হিংসা হত যে, তাঁর নামে সব মামলা মোকদ্দমা করে মোটা মোটা জরিমানার ব্যবস্থা করত।

এইসব কারণে তাঁর বেশ একটা নামডাক হয়েছিল, খাঁজাখাঁ উপাধি পেয়েছিলেন, আর বড়লোকদের যেমন হয় মেলা শত্রুও জুটেছিল।

এই সব শত্রুদের হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করবার জন্য ঠাকুরদার ঠাকুরমা তাঁর হাতে মেলা মাদুলী টাদুলী বেঁধে রাখতেন, ঠাকুর দেবতার মানত করতেন, কারণ ভগবান যার সহায় হন তার অনিষ্ট কেউ করতে পারে না। তাছাড়া বিশে বলে একটা ষণ্ডামার্কও চাকরও রেখে দিয়েছিলেন, সে সর্বদা ঠাকুরদার সঙ্গে সঙ্গে থাকত, তার হাতের গুলি আর বুকের ছাতি দেখে টপ করে বড একটা কেউ কাছে ঘেঁষতে সাহস পেত না।

বিশেকে সঙ্গে দিয়ে ঠাকুরমা পরম নিশ্চিন্ত ছিলেন, কিন্তু ঠাকুরদা অতটা নিশ্চিন্ত হতে পারতেন না। যেখানেই যাবেন বিশে সঙ্গে যাবে, যা খাবেন যা করবেন বিশে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে।

"আজ্ঞে, কর্তা, মা ঠাকরুণ এটা পছন্দ করবেন না। আজ্ঞে, কর্তা, মা ঠাকরুণের ওটাতে বারণ আছে।"

সত্যি কথা বলতে কি বিশের উপর ঠাকুরদার ঠাকুরদা হাড়ে চটা ছিলেন।

সেই সময় কলকাতায় ও তার আশে পাশের অঞ্চলে চুরি ডাকাতি ভীষণ বেড়ে গিয়েছিল। বন্ধু বান্ধবরা প্রায়ই ঠাকুরদাকে সাবধান করে দিতেন—ওরকম একা একা নৌকো চেপে, অত টাকার সাজপোষাক পরে কলকাতা যাওয়াটা ঠিক নয়, হরিহর। সাবধানের মার নেই।

কিন্তু সৎ পরামর্শ কেই বা কবে শুনেছে। আশ্চর্যের বিষয় হল যে সবার বাড়িতে ডাকাতি হত, সবার গয়না-গাঁটি চুরি যেত, ঠাকুরদার ঠাকুরদার কিছু হত না, সম্ভবতঃ ঐ বিশের ভয়ে। সবাই জানত যে, ছোটবেলায় বিশে একবার এক লাঠির বাড়ি দিয়ে একটা বুনো শুয়োর মেরে ফেলেছিল।

এমনি করে দিন যায়। একদিন সন্ধ্যেবেলা ঠাকুরদা আগাগোড়া সাদা মখমলের পোষাক পরেছেন, তাতে ছোট ছোট সাঁচ্চা মুক্তো দিয়ে কাজ করা, মায় জুতোতে পর্যন্ত। ঐসব পরে কলকাতায় সাহেবদের বাগানে গেছেন। হাতীর দাঁতের ছড়ি নিয়ে পা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছেন, মাঝে মাঝে গোলাপ ফুল-টুল শুঁকছেন। একটু তফাতে মালকোছা মেরে ধুতি পরা, ফতুয়া গায়ে, হাতে রূপার তাগা ও বাঁশের লাঠি, বিশে চলেছে, ঠাকুরদার উপর থেকে চোখ সরাচ্ছে না।

এমন সময় একজন রোগা লম্বা নোটা নোটা কানওয়ালা পর্তুগীজ সায়েব এসে খুব ভাব জমাল। ঠাকুবদাকে নস্যি টস্যি দিল কুশল প্রশ্ন করল, আর সাজ-পোষাকের এমনি প্রশংসা করল যে, ঠাকুবদা গলে একেবারে জল হয়ে গেলেন। ব্যাপার দেখে বিশে আব একটু কাছে ঘেঁষে এল।

সায়েব খুব খাতির টাতির দেখিয়ে ঠাকুরদাকে বলল,

"যদি মাপ করেন তো সাহস করে একটা কথা বলি। কিছুদিন ধরে এদিকে ভীষণ চুরি ডাকাতি হচ্ছে, আপনি একটু সাবধানে থাকবেন। আজই বিশেষ করে ভীষণ ভয় আছে কারণ লাটসাহেবের বৌয়ের গায়ের তিন লাখ টাকার গয়না-গাঁটি পালিশ হয়ে, গয়নার দোকান থেকে গোরুর গাড়ি করে লাট সাহেবের বাড়িতে যাবে, কাল মস্ত পার্টি আছে, মেম-সায়েব ঐসব পরবেন।"

ঠাকুরদা অবাক হয়ে বললেন—"এত খবর তুমি পাও কোথা থেকে?"

"বাঃ, আমি পাব না? আমি যে পুলিশের লোক, সাদাসিধা কোট প্যাণ্টেলুন পরে লোকের চোখে ধুলো দিয়ে ঘুরে বেড়াই। সত্যি বল তো আমাকে দেখে কি পুলিশের লোক বলে চোর ছ্যাঁচড়রা সন্দেহ করবে?"

ঠাকুরদা উৎসাহের সঙ্গে বললেন—"কখনই না, বরং পুলিশের লোকদের তোমাকে চোর ছ্যাঁচড় বলে সন্দেহ করার সম্ভাবনা।"

লোকটা ভারি খুসি হয়ে বললে,—"আচ্ছা, তুমি বলছ যে হুগলি থেকে বরাবর আসছ, কোথাও কোনো সন্দেহজনক লোকটোক দেখলে নাকি?"

ঠাকুরদা বিশের দিকে চোখ দিয়ে ইসারা করে বললেন—

"ঐ যে খাটো করে ধুতি পরা হাতে রূপোর বালা পরা মানুষটাকে দেখছ, ও অনেকক্ষণ ধরে আমার পাছু নিয়েছে। ইচ্ছে হয় তো ওর উপর পুলিশের নজর রাখতে পারো।"

এই বলে ঠাকুরদা একটা গন্ধরাজ ফুল শুঁকতে শুঁকতে হন হন করে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তাই দেখে অবাক হয়ে বিশেও যেই হন হন করে এগোতে আরম্ভ করেছে, সায়েব একটা ক্ষুদে বাঁশী বের করে তাতে ফুঁ দিয়েছে। অমনি ঝোপের আড়াল থেকে চারজন যমদূতের মত চেহারা ষণ্ডা গোছের লোক এসে বিশেকে ঘিরে ফেলেছে।

বিশে 'ও কর্তাবাবু ও গিন্নিমা' বলে বিস্তর হাঁকডাক ছাড়ল কিন্তু ঠাকুরদা ততক্ষণে সন্ধ্যার অন্ধকারে গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছেন।

এতকাল বাদে বিশের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গাছতলায় একটা লোহার বেঞ্চিতে পা ছড়িয়ে বসে পড়ে, ঠাকুরদা একটা আরামের নিশ্বাস ফেললেন। এমনি সময় একজন স্নুন্দরী মেমসাহেব এসে ঠাকুরদার পাশে বসল।

এত কাছ থেকে ঠাকুরদা কখনো মেমসাহেব দেখেন নি, সোনার মত তার চুল, গোলাপের মত গায়ের রং, নীল কাঁচের মত চোখ। ঠাকুরদা অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছেন এমন সময় মেম একটা ঝিনুকের তৈরী হাতলওয়ালা ছোট্ট পিস্তল বের করে ঠিক ঠাকুরদার কপালের মাঝখানটাকে লক্ষ্য করে বললে— 'ইজেরটা রাখতে পার, কিন্তু পোষাক, পাগড়ি, জুতো, কোমরবন্ধ, টাকার থলি, আংটি, বোতাম আর সোনা বাঁধানো ছড়ি, সব এইখানে বেঞ্চির উপর রেখে এখান থেকে চলে যাও। আমি কুড়ি অবধি গোনবার পর বন্দুকটা ছুটে যেতে পারে।"

মেম পনেরো পৌঁছতে না পৌঁছতে ঠাকুরদা শুধু গেঞ্জি আর ইজের পরে হাওয়া। গভীর রাত্রে বাড়ি পৌঁছে দেখেন ঠাকুরমা ভেবে ভেবে সারা হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। যাক, তবু একটা ফাঁড়া কাটল।

সকালে উঠে রাত্রের কথা মনে করে ভারি মেজাজ খারাপ বোধ হতে লাগল। তার উপর গিন্নি বিশের কথা জিজ্ঞাসা করলে কি উত্তর দেওয়া যাবে সেও একটা সমস্যা বটে।

ছি, ছি, কি লজ্জার কথা। হরিহর চৌধুরী, যার ভয়ে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায়, সাহেবরা যাকে হিংসা করে, সে কি না একজন মেম ডাকাতের হাতে জব্দ হল, কলকাতার গুণ্ডারা যার হাতের মুঠোর মধ্যে সেই হরিহর চৌধুরী! লাটের বৌয়ের লাখ লাখ টাকার গয়না-গাঁটি গোরুর গাড়ি করে পথ দিয়ে চলে গেল, আর কাপড় চোপড়ের অভাবে কিছু করা গেল না। এ দুঃখু কি করে ভোলা যায়। সবই তাঁরি ইচ্ছা। ঠাকুরদা বারবার জনার্দনকে

নমস্কার করলেন। তবে একটা ভাল হয়েছে, বিশেটাকে বিদেয় করা গেছে। ওকি আর সহজে পুলিশের হাত থেকে বেরোতে পারবে। কে জানে হয়তো ফাঁসিই দিয়ে দেবে।

ক্রমে ঠাকুরদার মনটা খুসি হয়ে উঠল। এমন সময় পুঁটলি হাতে একগাল হাসি মুখে বিশে এসে ঠাকুরদাকে প্রণাম করল।

"আজ্ঞে কর্তা, আপনার আশীর্বাদে কাল পুবোন বন্ধুদের সঙ্গে কতকাল পরে দেখা। এই সামান্য জিনিষ কটা আপনাকে নিতেই হবে। কাল লাট সাহেবের কৃপায় কিছু লাভ হয়ে গেছিল।"

এই বলে রাশি রাশি হীরে মতির গয়না ঠাকুরদার পায়ের উপর ঢেলে দিল।

"না বলবেন না কর্তা। বুকটা আমার ভরপুর হয়ে আছে। গোমেজ সাহেব আমাব কতদিনকার বন্ধু, দুজনে মিলে কত টাকাই কামিয়েছি। একটা বছর মা ঠাকরুণের চরণে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছি, সদাই প্রাণটা গোমেজের জন্য হু হু করত, কাল আপনার আশীর্বাদে আবার দেখা মিলল, দেন কর্তা আবার চাট্টি পায়ের ধুলো দেন।"

গুপিদা বললে "লাটের বৌয়ের ঐসব গয়না বেচে হুগলির ঐ বাড়ি তৈরী হয়েছিল। ওর প্রত্যেকটি ইট পাপ দিয়ে গাঁথা। কি মজা না রে?"

স্থলপদ্ম

আমার ছোড়দাদু যে সময়ে বিলেত থেকে ব্যারিষ্টারি পাশ করে, কলকাতায় এসে কায়েমী হয়ে বসলেন, সে সময় বেশি দিন বড় একটা কারো পক্ষে অবিবাহিত থাকা অসম্ভব ছিল। মেয়েদের প্রতি চাকুরির দরজা বন্ধ থাকাতে, বিবাহের একটা জনপ্রিয়তা তো ছিলই। তার উপর সেকালের মেয়েদের মাদের মধ্যে এমন একটা কর্মতৎপরতা দেখা যেত, যে যদি বা মেয়েদের দৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করা যেত, তাঁদের দৃষ্টি থেকে কদাচ নয়!

আসল কথা বিদেশের পিঙ্গলকেশী বিড়ালাক্ষী সুন্দরীদের ছোড়দাদুর মনে ধরেছিল, তাই দেশে ফিরে এসে আর কাকেও তেমন পছন্দ হচ্ছিল না। তবে শোনা যায় যে রূপের জ্বালাময়ী আকর্ষণের চেয়েও সান্নিধ্যের প্রভাব কার্যতঃ অনেক বেশি ফলবান হয়। সেই কারণে বেথুন কলেজ থেকে পাশ-করা বাছা বাছা জনাকতক আধাবয়সী বিদুষী কোনো মতেই নৈরাশ্যকে চিত্তে স্থান দিলেন না। এইরকম সব সদ্বংশজাত, সুশিক্ষিত, স্বচ্ছল ও সুদর্শন পাত্রকে হাতছাড়া হতে দেওয়া তাঁদের কর্তব্যবোধে আঘাত করতে থাকল। কিন্তু মেয়েগুলোও যেন কি! এতদিন ধরে ঘষে মেজে শিখিয়ে পড়িয়েও সামান্য একটা পুরুষ-মানুষকেই যদি করতলগত করতে না পারল, তবে আর কিই বা পারল?

শেষ পর্যন্ত দুটি মেয়ে বাকি ছিল। তাদের মধ্যে ললিতাও খাসা মেয়ে, নলিনীও খাসা মেয়ে। ললিতা কেমন বেতসলতার মত লম্বা, পাৎলা, ছিপ ছিপে, হাতীর দাঁতের মত গায়ের রং, রেশমের মত চিকন কালো চুল, তেলের অভাবে ঈষৎ লালিমা ধারণ করে, মাথার উপর, একটা পাটকিলে রঙের রেশম দিয়ে মোড়া তারের খাঁচার চারিদিকে জড়িয়ে পাকিয়ে, অতিশয় আধুনিকভাবে, বত্রিশটা অদৃশ্য কাঁটা দিয়ে, এঁটে বাঁধা হয়ে রয়েছে। মৃণালের মত বাহুযুগলের সোনালী আভা মাখনের মতো রঙের লম্বাহাতা অর্গ্যাণ্ডির জ্যাকেটের ভিতর থেকে ফুটে বেরুচ্ছে, জ্যাকেটটি মণিবন্ধের কাছে সাতটি ঝিনুকের বোতাম দিয়ে নিরাপদভাবে আঁটা আর গলার কাছে কান অবধি তিমিমাছের কাঁটা দিয়ে উঁচু করে তোলা। ধারে ধারে সরু হাতে-তৈরী লেসের ঝালর, গলার কোণে একটুখানি সমুদ্রের ফেনার মতো লেগে রয়েছে। ললিতার আধুনিকতার আগাগোড়া শীলতা দিয়ে মোড়া।

সত্যিকারের কাঁঠালিচাঁপার মতো আঙ্গুল, কুঁদফুলের মতো দাঁত, গোলাপের মতো অধরোষ্ঠ। কোথাও কৃত্রিমতার লেশ নেই, দুধের সর দিয়ে মুসুর ডাল বাটা

দিয়ে মুখ ধুয়ে, তার উপর কাঁচা শশার টুকরো মিনিট পাঁচেক ধরে রোজ ঘষা ছাড়া অঙ্গের অমন সোনার রংএর জন্য আর কোনো উপায় অবলম্বন করাকে ললিতার মা অতিশয় নির্লজ্জতা বলে জ্ঞান করতেন।

ললিতার মতো মেয়ে আজকাল খুঁজে পাওয়া যাবে না। তার গলার স্বরটি কেমন ধারা বলব? মাঝ সমুদ্রের বিশাল শঙ্খের মধ্যে আস্তে আস্তে ফুঁ দিলে যেমন একটা মন-কেমন-করা শব্দ বেরোয়, সেই রকম। একবার শুনলে আর ভোলা যায় না। হরিণের মত চোখ দিয়ে যখন এদিক ওদিক তাকায়, যে দেখে তার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করে।

কি নরম মনটিও। বেড়াল মরে গেলে, চোখে জল আসে। নিচু গলায় সুর করে ছোকরা রবি ঠাকুরের কবিতা আবৃত্তি করে, গুন গুন করে গান গায়। প্রজাপতির মতো হাল্কাভাবে চলে ফেরে, তারপর ক্লান্ত হয়ে যখন বসে পড়ে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা যায়, অবিকল মুক্তোর মতো, যে কাছে থাকে তারি মনটা উদাস হয়ে যায়।

নলিনী আবার অন্যধারা মেয়ে। ওর চেয়ে একটু বেঁটে, একটু শামলা, গলার স্বরটা একটু ভারি, কিন্তু কি যে কাজের মেয়ে সে আর কি বলব। বি-এ পাশ করেছে, সেলাই ফোঁড়াই কত রকম যে জানে, ক্রুশের কাজ, পুঁতির কাজ, কাপড়ের উপর তেল রং দিয়ে নক্সা তোলা, ঝিনুক বসিয়ে মাছের আঁশ বসিয়ে ফুল তোলা। আর রাঁধে যা খাসা, কত রকম বিলিতী রান্না স্বয়ং শিল্পী শশী হেষের ইটালিয়ান স্ত্রীর কাছে থেকে শেখা, এগ্‌স্-ইন্-স্নো ইত্যাদি, তার নামও কেউ আজকাল জানে না। তাছাড়া পালকের ঝাড়ন দিয়ে ঘর ঝাড় পোঁচ করতে জানে, রিঠে দিয়ে রেশমী কাপড় ধুতে পারে, চায়ের পেয়ালার উপর ডিমের হলদে দিয়ে রং গুলে জাপানী ফুলের ছবি আঁকতে পারে। তবে কিনা, চুলটা ঠিক অতটা চিকণ নয়, সাজ পোষাক অতটা মনোমোহন নয়। তবু অমন মেয়ে কম দেখা যেত। কাছে গেলে ক্লান্ত মানুষের প্রাণ জুড়োত, রুগী মানুষের ব্যথা কমে যেত। তবে কি না মেজাজটা মাঝে মাঝে একটু রুক্ষ, কথাবার্তা সময় সময় একটু ঝাঁঝালো।

দুজনার এত বর্ণনা দেবার একটা কারণ হচ্ছে যে ছোড়দাদু দেশে ফিরবার বছর খানেক বাদে একদা তাঁর পিতাঠাকুর তাঁকে লাইব্রেরি ঘরে ডেকে নিয়ে, নিজের সামনে দাঁড় করিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বললেন,

"দেখ হরিচরণ, ক্রমশঃ আমার ধৈর্য শেষ হয়ে আসছে। বিবাহ না করলে সৎভাবে জীবনযাপন যে কত অসম্ভব, আশা করি সেকথা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। আমার বাড়িঘর, জমিজমা, বিষয় আশয়ের, এবং সব চেয়ে বড় কথা আমার বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী তুমি। এক সপ্তাহ সময় দিলাম, শ্রীমতী ললিতাকেই বিবাহ করবে, না শ্রীমতী নলিনীকে

বিবাহ করবে স্থির কর। দুজনেই তোমার উপযুক্ত। ১লা অঘ্রাণ বিবাহের দিন স্থির করেছি, ব্যাণ্ড-পার্টিকে বায়না করেছি। এখন যেতে পার। ইচ্ছে হয় অন্য পাত্রীও দেখতে পার।"

বুঝতেই পারছেন, ছোড়দাদু বেচারি চোখে সর্ষেফুল দেখতে লাগলেন, এক বছরে যেটা হয়ে উঠলনা, এখন সাত দিনে সেটা কেমন করে সম্ভব হয়? এসব কথা কখনো গোপন থাকে না। যদিও লাইব্রেরি ঘরে ছোড়দাদু আর তাঁর পিতৃদেব ছাড়া অপর দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউ উপস্থিত ছিল না, তবুও দেখতে দেখতে কথাটা জানাজানি হয়ে গেল এবং পাত্রীপক্ষের মাতৃদ্বয়ের কানে উঠতেও বিলম্ব হল না।

সেকালে একটা সুবিধা ছিল যা কিছু দ্বন্দ্ব সব সামনাসামনি হত, তা সে যুদ্ধই বলুন আর প্রেমের ব্যাপারই বলুন। এ ক্ষেত্রেও তাই হল। ললিতার অভিভাবকরা আব নলিনীর অভিভাবকরা মেলা বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে ডায়মণ্ড হার্বারে এক বিরাট চড়িভাতির আয়োজন করলেন, তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছোড়দাদুকে মন স্থির করবার একটা সুযোগ দেওয়া।

এখন যেখানে মিলিটারিদের আডডা, সেই দুটো লম্বা আঙ্গুলেব মত গঙ্গার জলে বেরিয়ে এসেছে, সেইখানে গাছের ছায়ায় চড়িভাতি হল। তখন মোটর গাড়ির এতটা চলন ছিল না, ট্রেনে করে সবাই গেল, রাশি রাশি বাসন-কোষণ, হাতাবেড়ি, সতরঞ্চি, সামিযানা, দোলনা, হার্মোনিয়াম, বাঁশী, জাপানী হাত পাখা সঙ্গে গেল।

সে এক এলাহি কাণ্ড। বলা বাহুল্য কিছুদিন থেকে ললিতা নলিনীর মধ্যে একটা শৈত্যের ভাব দেখা দিয়েছে। তবে শিক্ষিত সমাজের মেয়েরা তো আর অকারণে পরস্পরকে ইংবেজিতে যাকে বলে "কাট" তাই করতে পারে না, তাছাড়া ওর মধ্যে কেমন একটা পবাজয়ের ভাবও আছে, এবং প্রতিদ্বন্দ্বীকে মাঝে সাঝে কাছে পিঠে না পেলে তার শক্তি আঁচ করে নেওয়াও কঠিন ব্যাপার হয়ে পড়ে। যাই হক নলিনী উৎসবক্ষেত্রে পৌঁছে দেখে গাছতলায়, গোলাপি একখানি রোদ-নিবারণী ছাতা আড়ভাবে ধরে, এক রাশি কালো মখমলেব কুশনের উপব আলগোছে বসে, ললিতা একগোছা বুনো ফুলের তোড়া বাঁধছে। তেঁতুলের রস মাখা কণ্ঠে নলিনী বললে— "বাঃ ললিতা, তোমাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে ভাই। গত বছরের সাদা সাড়িটা গোলাপি করে নিয়ে সত্যিই নতুনের মত দেখাচ্ছে। ওটা কি তোমার পাশে, বাংলা কবিতা? কে পড়ে, ভাই?"

ছোড়দাদু কাছেই ছিলেন, সেদিকে একবার অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করে ললিতা স্যাকারিণের মত কণ্ঠে বললে—

"ওটা ডার্লিং এত আনকালচার্ড বই, যে পড়তেই পারলাম না; তুমি নেবে

নাকি ? বাঃ বেশ করেছ, বলেছিলাম না কমলালেবুর খোসা বাটা মাখলে মুখের কালো দাগ মিলিয়ে যায়, ঐ দেখ, একদম বোঝা যাচ্ছে না।"

ছোড়দাদু এই পর্যন্ত শুনে এক ঢোক গিলে একেবারে যেখানে গিন্নিবান্নিরা ঠিক আজকালকার মত করে রাঁধাবাড়ার তদারক করছিলেন সেখানে উপস্থিত। সেখানে আবার ছোড়দাদুর মার সইএর মেয়ে বুটলি ঠাকুরদের সঙ্গে মাছ কোটা নিয়ে মহা চেঁচামেচি লাগিয়েছে।

শিউরে উঠে ছোড়দাদু বললেন—

"ছিঃ! নারীরা হবে নারীর মতো, শান্ত ধীর স্থির কোমল, নিচু গলায় কথা বলবে, লজ্জা বলে একটা ভূষণ থাকবে।"

বুটলি বললে—"লজ্জা না হাতী।"

ছোড়দাদু আরো বললেন—"ইস, তোমাকে তো আমি মেয়ে মানুষই বলি না। তোমার সঙ্গে একটা ঠ্যাঙ্গাড়ে ডাকাতের কোনো তফাৎ নেই। উঃ, একটু আগে হাটের মেয়েদের সঙ্গে কি তেড়ে দর কষাকষিটাই করছিলে। কোমরে কাপড় জড়িয়ে, কানের উপর দিয়ে চুল এঁটে বেঁধে পুরুষ মানুষদের মত সবাইকে ঠেলেঠুলে এগিয়ে চললেই হল কি না। নলিনী, ললিতাকে একবার চেয়ে দেখ, নারীত্ব কাকে বলে। ঠিক দুটি পদ্মফুলের মতো।"

বুটলি বিরক্ত হয়ে একটু নড়ে চড়ে বসল, হাতের চিংড়ি মাছটার সব কটা ঠ্যাং একসঙ্গে পড় পড় করে ছিঁড়ে ফেলল। ছোড়দাদু শিউরে উঠে বললেন।

"উঃ, কি সাংঘাতিক। ঐ কথাই তো বলছিলাম। এখানে প্রকৃতির বুকের মধ্যে এসেও তুমি চিংড়িমাছের ঠ্যাং ছিঁড়ছ ? ছোটবেলা থেকে তোমাকে দেখছি, কোথাও কোনো ফাইনার ফিলিংসের চিহ্নটি খুঁজে পেলাম না। দেখতো ললিতা নলিনী কেমন ঐ কিংশুক না কি যেন বড় গাছের তলায় বসে গানটান করছে।"

বুটলি মাছের ঠ্যাংগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল—

"যাও, কাজের সময় বিরক্ত কর না, ভাগো হিঁয়াসে। আদর্শ নারীদের কাছে যাও। চিংড়ি রান্না হলে কেমন কচিপানা হাত নেড়ে বলবে আহা আর দিয়োনা দিয়োনা, আর বলতে বলতে কেমন সব চেয়ে বেশি খাবে দেখো। এখন যাও তো, ভাগো।"

ছোড়দাদু একটু সরে গিয়ে বললেন—

"ছোটবেলা থেকে দেখছি, তোমার মধ্যে কোথাও একটু কবিত্ব বা আদর্শবাদ বা নারীত্ব কিচ্ছু নেই।"

বুটলি চিংড়ির মুণ্ডুগুলো কচ কচ করে কাটতে কাটতে হেসে বলল—"তা হক। ললিতা নলিনীর খুব আছে। কেমন আরসুল্লো দেখলে মুচ্ছো

যায়। টিকটিকি দেখলে গা শির শির করে, খোঁচা গোঁফওয়ালা মানুষ দেখলে বুক ধড়ফড় করে, রাত্রে উঠলে মাকে ডাকে—"

ছোড়দাদু এবার সত্যি চটে গেলেন—

"হিংসের কারণে তুমি ওদের মন্দ দেখ।"

বুটলি খুব হাসল।

"মন্দ কোথায়।

কেমন এক ঘণ্টা ধরে উঁকো দিয়ে ঘষে সুন্দর সুন্দর ডালিমের কোয়ার মত নখ বানিয়েছে। কাজ করলে নখ ভেঙ্গে যাবে বলে আহা বেচারিরা কাজই করতে পারে না।"

ছোড়দাদু আর সেখানে দাঁড়ালেন না, নারী তার নারীত্ব হারালে কেমনধারা হয় এর চেয়ে তার ভালো নমুনা কোথায় পাওয়া যাবে? এত কথা আমি আর কোথা থেকে জানব, ছোড়দাদুর মুখেই শুনেছি, কতকগুলো ফিকে হয়ে যাওয়া ফটোও দেখেছি।

সারাটা দিন কি যে মানসিক অশান্তিতে কাটালেন সে আর কি বলব। পৃথিবীব পিতৃদেবরা কত যে অশান্তির কারণ হন তাঁদের নিজেদেরি ধারণা নেই।

বাড়ি ফেরার আগে চায়ের পালা শেষ হল। নলিনী ললিতাকে দুটী ক্লান্ত পদ্মফুলের মতো লাগছে, আর বুটলি চাকর বাকরদের দলের মধ্যে একেবারে মিশে গেছে। আলাদা করে আর চেনা যাচ্ছে না।

নলিনী বললে—"ওমা, ললিতা, দেখ ভাই, তোমার চুলের মধ্যে থেকে গুছিটা বেরিয়ে পড়েছে, দাঁড়াও ঠিক করে দিই। তুমি এত সুন্দরী, তাই কেমন যেন লাগছে। তুমি আমার মত সুবাসিত কুন্তলীন মাখ না কেন বলতো? তা হলে আর গুছি লাগবে না।"

ললিতা মাথা নেড়ে বললে—

"সে কি ডার্লিং। তুমি আমাব দিকেই চেয়ে রয়েছ, আব ওদিকে দেখ, তোমার জামাটা পিন্ দিয়ে এঁটে পরেছ, তা সে পিন্‌গুলো দেখা যাচ্ছে। দাঁড়াও তো ঠিক করে দিই। ওকি ভাই, বোতাম আসছে না যে। এত ডায়েট করেও মোটা হচ্ছ কেন ভাই, একবার ডক্টর রাইলিকে ডাক না কেন? তোমার জন্য বডড ভাবনা, হয়, ডার্লিং।"

নলিনী তখন খেলাচ্ছলে কাঁটাশুদ্ধ একতোড়া কি যেন লালফুল ললিতাকে ছুঁড়ে মারল, ললিতাও কৌতুক করে সজোরে নলিনীকে ফিরিয়ে দিল, কিন্তু সেগুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ল গিয়ে একটা ভোজননিরত ষাঁড়ের গায়ে। সেও তৎক্ষণাৎ ভোজন ত্যাগ করে সুন্দরীদের দিকে তেড়ে এল। সেই সময় যদি চেলা কাঠ হাতে করে হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ করে বুটলি একেবারে ষাঁড়ের সম্মুখে

ছুটে না আসত, তা হলে সেদিনকার আনন্দোৎসবের সমাপ্তিটা অন্যরূপ হত নিঃসন্দেহ।

সকলেই বুটলির অশোভন দৌড়নোর নিন্দা করেছিলেন, পায়ের কব্জির উপরেও অনেকখানি বাদামী রংএর পা দেখা গিয়েছিল, চুল খুলে পাগলের মতো হয়েছিল, কর্কশকণ্ঠে চিৎকার করেছিল ইত্যাদি। নলিনী মুখচোখের উপর সবুজ অঞ্চলপ্রান্ত তুলে দিয়ে কেমন চোখের জলে ভেসে গেছিল। আর ললিতা একবার তাকিয়েই ছিন্ন ব্রততীর মত অচেতন হয়ে ছোড়দাদুর চরণ প্রান্তে লুটিয়ে পড়েছিল।

ছোড়দাদু তাকে কোলে তুলে, কুশনের উপর শুইয়ে দিয়ে, জাপানী পাখা দিয়ে হাওয়া করতে, এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের ল্যাভেণ্ডার গন্ধলাগা লাল সিল্কের রুমাল দিয়ে নলিনীর অশ্রুসিক্ত চোখ দুটি মুছে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। বুটলি এক বালতি জল এনে মনের আনন্দে দুজনার মুখে আঁজলা আঁজলা জল ছিটিয়ে দিয়েছিল।

সেদিন রাত্রেই ছোড়দাদু উপযাচক হয়ে লাইব্রেরি ঘরে গিয়ে, নতমস্তকে পিতৃদেবের সামনে দণ্ডায়মান হলেন।

"কিছু বলবার আছে? মন স্থির করেছ?"

ছোড়দাদু বললেন—"করেছি।"

"ললিতাকে না নলিনীকে? উভয়ই তোমার উপযুক্ত।"

আরক্তমুখে ছোড়দাদু বললেন, "বুটলিকে।"

বুনো ভ্রূ যুগলের আড়াল থেকে একবার দৃষ্টিপাত করে পিতৃদেব বললেন "উত্তম কথা। কিন্তু তোমার মতো একটা ষ্টুপিডকে সে বিয়ে করবে তো?"

ছোড়দিদিমার মুখে শুনেছি কেমন করে একমাস সাধাসাধি করার পর বুটলি মত দিয়েছিল। তখন ছোড়দাদু তার জন্য হীরের আংটি কিনে দিয়েছিলেন। ছোড়দিদিমা আরো বললেন "বিয়েতে আমার খুব মত ছিল না, তবে কি জানিস, আমি না করলে ঐ দুটো হিংসুটে মেয়ের মধ্যে একজন করবে, আর তোর ছোড়দাদু বেচারি কষ্ট পাবে, শেষ পর্যন্ত এই মনে করে মত দিলাম।"

"ভুয়ো"

আপনাদের অনেকের মনেই বোধ হয় এমন একটা ভুল ধারণা আছে যে সেকালের জীবনযাত্রা বড় সরল ছিল, জিনিষপত্রের জলের দাম ছিল, সোনা ছিল ষোল টাকা ভরি, ছেলেমেয়েরা ছিল বাধ্য। এও নিশ্চয় আপনাদের বিশ্বাস যে সেকালে ঘরে ঘরে যে সব অনুগত ভৃত্য থাকত তাদের মতো ধর্মপরায়ণ ও বিশ্বাসী মানুষ এখন খুঁজে পাওয়া দায়।

কতক পুরোন কাগজপত্র ও বংশ পরিচয় ঘেঁটে, কতক কতক পারিবারিক কিংবদন্তী থেকে আমি, অন্ততঃ আমার নিজের পূর্বপুরুষদের জীবন সম্বন্ধে, যেটুকু তথ্য আহরণ করতে পেরেছি, তা দেখে সেকাল সম্বন্ধে অনেকগুলি ভুল ধারণা, আমার নিজের মন থেকে ঘুচে গেছে। তাঁদের ধর্মের দিকটা সম্বন্ধে কিছু বল্‌ছি না। এ বিষয় আমার মনেও কোনো সন্দেহ নেই যে চার শো বছর আগে আমার একজন পূর্বপুরুষ তাঁর গুরুদেবের কাছে থেকে পাওয়া কষ্টিপাথরের জনার্দনকে সারাটা পথ বুকে করে নিয়ে, পায়ে হেঁটে সেই বৃন্দাবন থেকে এসে আমাদের বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

আমি তাদের সাংসারিক দিকের কথা ভাবছিলাম। আমাদের ছোটবেলায়, সম্ভবতঃ নৈতিক উদ্দেশ্যে, কথাটা আমার ঠাকুরমারা যতই গোপন করতে চেষ্টা করুন না কেন, এ বিষয় কোনো সন্দেহই ছিল না যে আমাদের বৃদ্ধ প্রপিতামহের এক জোটে তিনটি গৃহিনী ছিলেন। তৎসত্ত্বেও, কিম্বা হয়তো সেই কারণেই, বৃদ্ধ প্রপিতামহ ছিলেন প্রেমের মহাশত্রু। এবং সে কথা তিনি সদর্পে ও প্রকাশ্যভাবে যেখানে সেখানে বলে বেড়াতেন।

তাঁরা ছিলেন গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তি, তাঁদের উক্তিগুলি লোকের মুখে মুখে ফিরত। এবং সেই নিয়মেই কালক্রমে কথাগুলি গৃহিণীদের কর্ণ-কুহরেও এসে পেঁছিত। সেই সকল সময় সেই গৃহে যে অতিশয় শান্তি বিরাজ করত এমনো মনে হয় না।

কিন্তু বৃদ্ধ প্রপিতামহ কারো তোয়াক্কা রাখতেন না। তখনকার দিনের প্রচণ্ড প্রতাপশালী নীলকর সাহেবদের সঙ্গে তাঁর নিত্য ঝগড়াঝাটি লেগেই থাকত। ঐ সময় নীলকর্ সাহেবরাও থেকে থেকে অকারণে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতেন আর বৃদ্ধ প্রপিতামহও মধ্যে মধ্যে বিবাগী হয়ে সংসার ছেড়ে চলে যেতেন। সেই অবসরে অদৃশ্য সাহেবদের জন্য দেশী ও বিলাতী পুলিশ ও

পল্টনরা খানাতল্লাসী করে যেত। তারা দরদালান, কাছারিবাড়ি, কাঠগুদাম, গোলাবাড়ি, ক্ষেতখামার সব দেখে শুনে অবশেষে কম্পিত চরণে অন্দর মহলের দরজার কাছে এসে দাঁড়াত।

তখন বৃদ্ধা প্রপিতামহীরা তিনজনে, একগলা ঘোমটা ও এক গা গহনা সুদ্ধ সামনে এসে দাঁড়াতেন, আর তাঁদের ঘোমটার অন্তরাল থেকে তিনজোড়া চোখ দিয়ে যে অশনি বর্ষণ করতেন, দোর গোড়ার মানুষগুলির উপর তার বিষময় প্রতিক্রিয়া হত। তারা প্রাঙ্গনের প্রান্তদেশে গাদাগাদি করা বৌ-ঝি ছেলেপুলেদেব দিকে একবার চকিত দৃষ্টিপাত করেই সসভ্রমে নমস্কারান্তে সরে পড়ত।

আমার অতি বুড়োঠাকুরদার বিবাগী হবার বাস্তবিক কোনো প্রয়োজনই ছিল না, তিনি ঠাকুরমাদের যে কোনো একজনের খোদাই-করা তক্তপোষের উপব, তাকিয়া ঠেস দিয়ে, নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারতেন। তবে কিনা স্ত্রীজাতিকে তিনি এমন দারুণ ঘৃণা করতেন যে বড় জোর তাদের বিবাহ করতেন, কিন্তু কদাচ তাদের উপর নির্ভর করতেন না। এ ধরণের মানুষকে পুরুষসিংহ বলা হয়।

আসলে ঐ বুড়িঠাকুমারা কেউই সুন্দরী ছিলেন না। বরং ঠাকুবদার নিন্দুক বোনদের মহলে তাদের মধ্যে কে যে অধিক কুরূপা তাই নিয়ে তর্কাতর্কি ও মন কষাকষি চলত। কিন্তু রূপ না থাকলেও তাঁদেব হাতে লক্ষ্মী ছিল। তাঁবা এক এক বাপের বাড়ি থেকে ঘড়া ঘড়া যৌতুক, ভরি ভরি সোনাদানা, আর পাল পাল দুগ্ধবতী গাভী নিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের দৌলতেই ঠাকুরদার অবস্থা ফিরে গিয়েছিল।

পূর্বেই বলেছি তিনি প্রেমের মহাশত্রু ছিলেন, কিন্তু তাই বলে অকৃতজ্ঞ ছিলেন না। বৌদের কোনো কষ্ট ছিল না। রান্নাঘর আর ভাঁড়ার ঘরের তাঁরা সর্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন, তাঁদের হুকুমে বিশপঁচিশ জন চাকব দাসী উঠত বসত। সন্ধ্যে হলেই অন্দবের পুকুবঘাট থেকে গা ধুয়ে, শ্বেতপাথরের দালানে বসে নিজের নিজের দাসী দিয়ে তাঁবা চুল বাঁধতেন। সে যে কত রকমের খোঁপা হত তার অন্ত নেই, আজকাল সে সব নামও কেউ জানে না, সেকালের সেই বিয়েব-বাগান খোঁপা, মন-ভোলানো খোঁপা, ফাঁসজাল খোঁপা, আরো কত কি। খোঁপাবাঁধার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের বাপের বাড়ির ধনদৌলতের সে যে কত বকমেব গল্প হত। একটু তফাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অন্যান্য বৌঝিদের তাই শুনে শুনে তাক লেগে যেত।

আজকাল সতীন নিয়ে ঘর করার কথা শুনলে মেয়েরা যেমন শিউরে ওঠে, সেকালে তার কিছুই হত না। ঠাকুমাদের মধ্যে তেমন একটা ঝগড়াঝাটি পর্যন্ত হত না। হবেই বা কেন? তিনজনেই সমান বড় মানুষের মেয়ে, তিনজনেরি

সমান ওজনের সোনার গয়না, সমান দামের জড়োয়া গয়না, তিনজনেরি একটি করে ছেলে, একটি করে মেয়ে, সাতজন করে দাসদাসী।

আমার অতিবুড়ো ঠাকুরদা যে অতিশয় ন্যায়বান ছিলেন একথা তাঁর শত্রুরাও স্বীকার করত। তার উপর এই শান্তির একটা প্রধান কারণ ছিল যে তিনি প্রেমের মহাশত্রু ছিলেন। পক্ষপাতদুষ্ট কবিতা রচনা তো ছেড়েই দেওয়া যাক, বৌদের কাকেও কখনো একটা চিঠি পর্যন্ত লিখতেন না। বিদেশে অবস্থানকালে অতি জরুরী কোনো প্রয়োজন হ'লে তাঁর প্রিয় নাপিত গোপেনকে পাঠিয়ে দিতেন।

একবার এইরকম ছ সাতমাস ঠাকুরদা ফেরারি। অনেকদিন হয়ে গিয়েছে, যে সকল নীলকর সাহেবরা অদৃশ্য হয়েছিলেন তাঁদের জায়গায় যে সব নতুন সাহেব এসেছিলেন, তাঁদেরো আনকোরা পালিশটা উঠে গিয়ে, এদেশের মাটিতে তাঁরাও কায়েমী শিকড় গেড়ে বসেছেন। এমন সময় একদিন সন্ধ্যেবেলায় ঠাকুরমাদের দালানের শ্বেত পাথরের চওড়া সিঁড়ির প্রথম ধাপের ওপর একজন পরমাসুন্দরী ষোড়শী এসে অবনত-নেত্রে ঝুপ করে বসে পড়ল। তার সিঁথিতে নতুন সিন্দুররেখা জ্বলজ্বল করতে লাগল।

ঠাকুমারা অবাক হয়ে তাকে হাজার হাজার প্রশ্ন করতে থাকলেন, কিন্তু সে মাথা নিচু করে তেমনি নির্বাক হয়ে বসে রইল, আর তার সর্বাঙ্গ থেকে কেমন একটা মৃদু সৌরভ চারিদিকে বিকীর্ণ হতে লাগল। সেটা কোনো মহামূল্য কস্তুরী বা আতরের সুগন্ধ, নাকি তার দেহের সুষমা, তা স্পষ্ট বোঝা গেল না।

তবে এ বিষয়ে কারো সন্দেহই রইল না যে এমন রূপসী কখনো কারো চোখে পড়েনি। দু হাতে দু গাছি লাল রুলি ছাড়া অঙ্গে কোনো আভরণ নেই, তবু তার পুরোনো হাতীর দাঁতের রঙের উন্নত ললাটের চিকন কালো চূর্ণ চুল দেখে মনে হতে লাগল যেন মাথায় তার হীরের মুকুট শোভা পাচ্ছে। লম্বা চুলগুলি পিঠ ছাড়িয়ে শ্বেত পাথরের দালানের উপর ফণাধারা সাপের মত দেখতে হল। মেয়ে তো নয়, যেন একছড়া বেল ফুল।

চুলবাঁধা চুলোয় গেল, তিন ঠাকুমা একসঙ্গে আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন। কাছে এসে দেখলেন কোলের উপর কচি হাত দুখানি যেন দুটি পদ্ম ফুলের কুঁড়ি, ঠোঁটদুটি যেন গোলাপের পাপড়ি, চোখ দুটি সোনার প্রদীপের মতো উজ্জ্বল।

তাই না দেখে ঠাকুমাদের সাদামাটা মুখগুলি পাঙাশপানা হয়ে গেল। তবে তো তাঁদের নন্দনকাননে সর্প প্রবেশ করেছে। বিস্ফারিতনেত্রে তাঁরা পরস্পরের দিকে চাইলেন, এমন সময় গোপেন এসে অতি বিনীতভাবে তাঁদের পাদপ্রান্তে টিপ করে প্রণাম করল।

তাঁরা তার কুশল প্রশ্ন করলেন না, সাতমাস না দেখা তার প্রভুর কুশল পর্যন্ত প্রশ্ন করলেন না।

"গোপেন, একে নিশ্চয় তুই এনেছিস, তা হলে তুই-ই একে বিদায় কর।"

গোপেন হাতজোড় করে নিবেদন করল যে কর্তা যাকে পাঠিয়েছেন, সে তাকে বিদায় করবে, তার ঘাড়ে কটা মাথা ?

ঠাকুমাবা মেয়েটিকে আপাদমস্তক আরেকবার নিরীক্ষণ করে বললেন "তবে তুই নিজে বিদায় হ, আমবা যা হয় ব্যবস্থা করছি। ধর, এই বড় মাঠাকরুণের জড়োয়া অনন্তগাছাখানি ধর।"

অনন্ত গোপেনের পায়ের কাছে পড়ে রইল, সে চোখ বুঁজে জিভ কেটে বলল, "আমি যাই আর মাঠাকরুণবা ওনাকে হেঁটোয় কাঁটা, ওপরে কাঁটা দিয়ে পুঁতে ফেলুন আর কি। দশ বছর কর্তার নূন খেয়ে, এমন নেমকহারামি করতে পারব না।"

তখন মেজঠাকুমা তাঁর হাতের একগাছা অনন্ত ফেলে বললেন "দেখতো, এবার পারিস কি না।"

গোপেন এক চোখ খুলে একবাব চেয়ে দেখে, শিউরে উঠে আবার চোখ বুঁজে মাথা নাড়ল।

তখন ছোট ঠাকুমা এগিয়ে এলেন ; কিন্তু তবু গোপেন একবার তাকিয়ে আব চোখ খোলেনা। ঠাকুমাবা তখন মরীয়া হয়ে যে যা পারেন তাবিজ, বাজু, রতনচূড়, চন্দ্রহাব ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলেন। দেখতে দেখতে সেখানে ছোটখাট একটি গিবি-গোবর্দ্ধন তৈরী হয়ে গেল। শেষটা গোপেন একটা হৃদয়ভাঙ্গা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে, বললে।

"মাঠাকরুণবা আমি আপনাদের ছিচরণের দাসানুদাস। আপনাদের কথা ঠেললে আমার পাপ হবে। তাহলে দেন, পায়ের ধুলো দেন, যা থাকে আমার কপালে।"

বলে ক্ষিপ্রহস্তে লাল গামছাখানিতে গয়নাগাঁটি বেঁধে নিয়ে, সুন্দরী মেয়েটির হাত ধরে প্রস্থান কবল।

সেদিনের চুলবাঁধার আসর জমল না, ঠাকুমারা অমনি আধ আঁচড়ানো চুলেই যে যার শয্যা নিলেন। এতবড় একটা ফাঁড়া এত সহজেই কেটে গেলেও তাঁদের বুক টিপ টিপ করছিল, চবণ কম্পিত হচ্ছিল। অমন রূপ যে কারো হয় সে কথা কে জানত! কেউ জলস্পর্শ করলেন না, লুচিক্ষীর বারোভূতে খেল। অনেক রাত পর্যন্ত তাঁদের নাকে কেমন একটা মৃদু সুগন্ধ লেগে থাকল।

দুদিন পরে আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ হরিদ্বার বৃন্দাবন আরো কোথায় কোথায় যেন ঘুরে এসে বাড়িতে উপস্থিত হলেন। ঠাকুমারা পালাপালি করে তাঁর

যে কি সেবাটাই করলেন, ঠাকুরদা তো অবাক। আহারান্তে পান মুখে দিয়ে বললেন,

"এদ্দিন বাদে গোপেনটাকে বিদায় করতে হল। ব্যাটা কেষ্টনগরে গিয়ে ঐ যে কেষ্টচন্দ্র মহারাজের পেয়ারের কে নাপিত ছিল তারই কার রূপসী নাতনীকে একবার দেখেই একেবারে বিয়ে করে ফেলল, আমার একটা মত পর্যন্ত নিল না। ব্যাটা তুই চাকর মনিষ্যি—ও কি তোমরা সব চললে কোথায়?"

মহিলামহল

এই পৃথিবীতে যাকে ভালো জিনিষ কিংবা ভালো কাজ বলা হয়, সেসব যে কত বিচিত্র এবং সন্দেহজনক উপায়ে সম্পন্ন হয়ে থাকে, শুনলে আপনাদের তাক লেগে যাবে। এই যেমন ধরুন, আমার সেজমামার মেয়ে কুসুমদিদির বিয়ে। শুধু আমি কেন, আমি বাইরের বহু লোককেও বলতে শুনেছি যে ওরকম একটা সবদিক দিয়ে ভালো বিয়ে আজকালকার জগতে খুঁজে পাওয়া দায়। কুসুমদিদির শ্বশুরবাড়িতেও যেমন, বাপের বাড়িতেও তেমনি. সবাই একবাক্যে ওদের একটা আদর্শ দম্পতি বলে প্রশংসা করে থাকে। বাস্তবিকই ওদের মতো একটা সুখী পরিবারকে দেখে পাড়ার লোকদের হিংসায় আপাদমস্তক জ্বলতে থাকে। আদর্শ সুখের এর চেয়ে আর বড় প্রমাণ কি হতে পারে বলুন? অথচ এই বিয়েটা একেবারে শুরু থেকেই একটা বিরাট ধাপ্পাবাজির উপর তৈরি।

সে অনেক দিনের কথা, আমরা তখন এতটা ছোট ছিলাম যে আত্মীয়স্বজনরা আমাদের অতিশয় তাচ্ছিল্য করতেন ও আমাদের সামনেই, আমাদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, নানান বিষয় আলোচনা করতেন। আবার ওদিকে আমরা এতটা বড় ছিলাম যে এসব ব্যাপারে আমাদের যেরকম কৌতূহল, ঠিক সেই রকম উৎসাহ।

ব্যাপার হল গিয়ে যে কুসুমদিদির মাস্তুতো পিস্তুতো বোনদের সব টপাটপ বিয়ে হয়ে যেতে লাগল, কিন্তু কুসুমদিদির আর কিছুতেই বিয়ে হয় না। অবশ্য না হওয়ার যে একেবারেই কোনো কারণ ছিল না, তাও বলতে পারি না। এর আগেও দু একবার আপনাদের বলেছি যে আমার মামাবাড়ির মেয়েদের বিয়ে হওয়ার প্রধান অন্তরায় ছিল ওদের অটুট স্বাস্থ্য, অদম্য উৎসাহ, বাজখাঁই গলার স্বর, অদ্ভূত কর্মতৎপরতা আর প্রচণ্ড ক্ষিদে। ওদের বেশি কাছে এলেই পাত্ররা ঘাবড়িয়ে গিয়ে আর পালাবার পথ পেত না, কাজেই বিয়ে করতে হলে ঐ গুরুজনদের দিয়ে ব্যাপারটা পাকিয়ে নিতে হত।

কুসুমদিদির বেলা মুস্কিল হল, আর সব বোনেরা দিব্যি ফর্সা সুন্দর, আর কুসুমদিদির ছিল শামলা রং। তারপর অন্য মামারা দিব্যি গয়না গড়িয়ে টাকা পয়সা খরচ করে মেয়ের বিয়ে দিতে প্রস্তুত। আর কুসুমদিদির বাবা, অর্থাৎ আমার সেজমামা—দেখছেন তো সত্যের প্রতি আমার কি দারুণ শ্রদ্ধা, কিচ্ছু লুকোচ্ছি না—আমার সেজমামা নিজের পৈতৃক সম্পত্তির অংশ তো করে

উড়িয়ে পুড়িয়ে, চেঁচেপুছে সাবাড় করেছেনই, উপরন্তু অবস্থাপন্ন পাত্রের সন্ধান পেলেই তার বাপের কাছ থেকে পর্যন্ত টাকা ধার করবার তালে থাকতেন। মেয়ের বিয়ে হবে কোত্থেকে ?

আমার দিদিমা বেচারা ভেবে ভেবে সারা। নাতনীটি ওদিকে আর পাঁচজনার মাথা ছাড়িয়ে, শশীকলাটির মত বেড়ে উঠেছেন। ম্যাট্রিক পাশ করেই অন্যদের মতো ওর জন্যও বর খোঁজা হচ্ছে, ও এদিকে সেই সুযোগে আই-এ বি-এ পাশ করে, রাঁধাবাড়া, সেলাই ফোঁড়াই, হিসেবপত্র সব শিখে গোটা বাড়িটার ভার নিয়ে বসে আছে। ব্যস্, অন্যদের ভাবনা চিন্তা নেই, সবাই খায় দায় ঘুমোয়, যে যার নিজের ধান্দায় ঘোরে। নিন্দুকরা শেষে এমনো বলতে লাগল যে অমন কাজের মেয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে গেলে পাছে বাড়ির লোকদের অসুবিধা হয়, তাই ওঁরা ইচ্ছা করেই সেরকম চেষ্টা করছেন না। বুড়োকর্তা, অর্থাৎ আমার দাদামশাই, বেঁচে থাকলে কি আর এমন হত! ইত্যাদি।

নিজের বিয়ের ব্যাপারে কুসুমদিদিরো উৎসাহের অন্ত ছিল না, সকলকে নানান পরামর্শ দিত, কিন্তু এই একটা বিষয়ে—বোধ হয় অন্য লোকের হাতে কাজটা ছেড়ে দিতে হয়েছিল বলেই—কিছুতেই আর কিছু হয় না।

এই সময় বড়মামা ছোটমামার মেয়ে নেলি ডলির জন্য রেষারেষি করে মামিমারা খুঁজে পেতে বিয়ের সম্বন্ধ আনতে লাগলেন। নলিন চৌধুরীর ছেলে অনিমেষ এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাশ করেই সরকারী চাকরি পেয়েছে, বাপের অবস্থা অত্যন্ত ভালো ; ছেলে স্বভাবচরিত্রে এবং দেখতে শুনতে ভালো। নেলিকে যদি বা কাটিয়ে উঠতে পারে, ডলিকে কখনই পারবে না, ছোটমামি কোনো ওজরই শুনবেন না, সকলেরি এই ধারণা।

জানেন তো আমাদের কি রকম প্রগতিশীল পরিবার, ছেলেকে টি পার্টিতে নেমন্তন্ন করা হল, দেখে শুনে যাতে মনস্থির করতে পারে। বড়মামি ছোটমামি নেলি ডলিকে মেজে ঘষে শিখিয়ে পড়িয়ে দিলেন। সেজমামি চিরকাল দারুণ আনাড়ি, একগাল হেসে দিদিমাকে এসে বলে গেলেন,

"বুঝলেন মা, ঐ অনিমেষ কেন, ওর বাবা এলেও রাজী হয়ে যেত। যাই, মাছের কচুরীগুলো কুসুমটা আবার একা একা পেরে উঠবে না।"

সেজমামি চলে গেলে, দিদিমা কিছুক্ষণ থুম হয়ে রইলেন, তারপর হঠাৎ ফিরে নিজের ছোট ভাই, আমাদের গুপিদাদুকে বললেন, "দ্যাখ গুপে, পঁচিশ বছর ধরে দুবেলা এবাড়ির ভাত ওড়াচ্ছিস, আর কোথায় ক্রিকেট, কোথায় হকি, কোথায় ফুটবল করে বেড়াচ্ছিস। কোনোদিনো কিছু বলি নে। কিন্তু এবার বলে রাখলাম ঐ অনিমেষটার সঙ্গে যদি কুসুমের বিয়ে ঠিক করে না

দিস তোর মৌরসী পাট্টা শেকড় বাকল সুদ্ধু উপড়ে ফেলব, বাকি জীবনটা তোকে হিজলি গিয়ে তাস খেলে কাটাতে হবে। যা, আজ সন্ধ্যে অবধি সময় দিলাম।"

তারপর বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, সন্ধ্যেবেলা গানবাজনা থামলে পর, যে যার বাড়ি চলে গেল। পরদিন সকালে নলিন চৌধুরী লিখে পাঠালেন কুসুম নামে যে মেয়েটি কচুরী ভেজেছিল, অনিমেষের তাকেই পছন্দ হয়েছে, অতএব বিবাহের দিন যেন বৈশাখের প্রথম সপ্তাহেই স্থির হয়, টাকাকড়ি রাখবার এমনিতেই স্থান সঙ্কুলান হয় না, অতএব কিছু দিতে হবে না। বলা বাহুল্য সবাই অবাক ; বড় মামি, ছোট মামি রেগে টং। যাই হোক, বেশ ধূমধাম করেই কুসুমদিদির বিয়ে হয়ে গেল, দিদিমাই বেশির ভাগ খরচপত্র ও সমস্ত গয়না দিলেন।

ওদের বিয়ের পনের বছর বাদে আর কৌতূহল রাখতে না পেবে আমরা গুপিদাদুকে ধরে বসলাম, বলতেই হবে কাজটা কেমন করে হাসিল করা হযেছিল। বেশ খানিকটা আমতা আমতা কবে গুপিদাদু বললেন,

"ঐ যে আমাদের ক্লাবের ষণ্ডা সিধু, যে চেয়ারে বসলেই চেয়ার ভেঙ্গে যায়, ওকে পাঠিয়েছিলাম অনিমেষকে নিয়ে আসতে। গাড়ির মধ্যে সিধু ওকে একা পেয়ে বললে কুসুমকে পছন্দ না করলে অনিমেষকে পিটিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলবে। তাই শুনে ভয পাওয়া দূবে থাকুক এক হাতে সিধুব দুটো হাত একসঙ্গে কবে ধবে, অন্য হাত দিয়ে অনিমেষ সিধুব গালপাট্টায় এমনি একটা চড় কষিয়ে দিল যে যেসমস্ত আক্কেল দাঁত কোন কালে তুলে ফেলা হয়েছে, আজ পর্যন্ত তার গোড়া টন টন করে।

যাই হোক, সিধুকে অত্যন্ত মর্মাহত হতে দেখে, ওকে সান্ত্বনা দিয়ে, অনিমেষ বললে, অত কিছুই করতে হবে না, সিধু যদি ওকে ওদের ক্লাবের মেম্বার করে দেয়, তা হলে কুসুমকে কেন, অনিমেষ দরকার হলে সিধুকেও বিয়ে করতে রাজী আছে। ব্যস্, আর কথা নেই, সিধু তখুনি অনিমেষকে সে বছরের মত একটা সীজন্ টিকিট দিয়ে দিল, আর প্রতিজ্ঞা করল যে এ বছরের না হক, আসছে বছর নিশ্চয়ই মেম্বার করে দেবে।

আমি বললুম—"দিয়েছিল?"

দিদিমা বললেন—"আরে দ্যুৎ দ্যুৎ। তুইও যেমন। তদ্দিনে গুপি সিধু দুজনেই ঝগড়া ঝাটি করে ও ক্লাব ছেড়ে দিয়ে বসে আছে। তবে তাতে কিচ্ছু এসে গেল না। তদ্দিনে অনিমেষ আর তার বাড়ির লোকরা এক বছর আমার কুসুমের ম্যানেজারিতে থেকে থেকে, ওকে প্রায় ঠাকুর পূজো করতে শুরু করে দিয়েছে।"

এখন নিশ্চয় সকলে বুঝতে পারছেন কেন বললাম পৃথিবীর ভালো কাজের বেশীর ভাগই বিচিত্র এবং সন্দেহজনক উপায়ে সম্পন্ন হয়।

ভবিতব্য

আমার মণিপিসির বাস্তবিকই যে বিয়ের বয়স অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল এ কথা সত্য নয়। কারণ বিয়ের বয়স উপনীত হবার বহু পূর্বেই মণিপিসির বিবাহিত জীবনের শুরু এবং সাঙ্গ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তারপর এত দীর্ঘ দিন কেটে যাওয়াতে, এবং মুখ্য ঘটনাগুলি মণিপিসির পিতা-ঠাকুরের কর্মস্থল সুদূর ঔরঙ্গাবাদে সংঘটিত হওয়াতে, কারো তেমন স্মরণই ছিল না। তদুপরি মণিপিসির দেহে বা হাবে ভাবে বৈধব্যের কোনো লক্ষণ তো পরিদৃশ্যমান ছিলই না, বরং একটা উগ্র কৌমার্যের ভাবই লক্ষিত হত।

আসল কথা হল যে বৈধব্যের কোনো বাহ্যিক নিয়মকানুন পালন না করলেও মণিপিসি নিদারুণ রকমের সৎ ছিলেন। কোনোরূপ শৈথিল্য বা সৌখীনতা বা আতিশয্য বা মিথ্যাকথা বা লঘু আচরণ তাঁর ধার কাছ দিয়েও ঘেঁষতে পারত না।

যে সময়ের কথা বলছি, তখন গত মহাযুদ্ধ পুরোদমে চলেছে, সমগ্র দেশটা নিয়মকানুন দিয়ে এবং সমস্ত আলো বাতি ঘেরাটোপ দিয়ে বাঁধা। মানুষের মনের ওপর দিয়েও তার প্রতিক্রিয়া চলেছে। সকলকে বারংবার সাবধান ও সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে, বিপদ যে কখন কোথা দিয়ে হিংস্র শ্বাপদের মতো নিঃশব্দ পদক্ষেপে এসে ঘাড়ের ওপর পড়বে কে বা জানে। এমন কি আমাদের আসল শত্রুপক্ষ কারা তাই নিয়েই নানান অনিশ্চয়তা এবং জল্পনা কল্পনা চলেছিল। এহেন পরিবেশে মণিপিসির স্বাভাবিক সতর্কতা যে দশগুণ বৃদ্ধি পাবে এ আর আশ্চর্য কি!

ঘটনাস্থল কলকাতা নয়, সেখানকার ব্যস্তবাগীশ আবহাওয়াতে এ ধরণের ব্যাপারের উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে ওঠা অসম্ভব। স্থান হল দার্জিলিং। কাল শীতের ঠিক পূর্বেই, যখন গাছেরা সব পাতা খসাতে শুরু করেছে, আর আকাশে বাতাসে একটি শুষ্কতার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। পাত্রপাত্রীর কথা বিশদ-ভাবে বিবৃত করছি।

প্রথম দর্শনে মণিপিসির বয়সটা অনুমান করা কঠিন, কারণ যদিও তাঁর দৃঢ়সংবদ্ধ দেহে যৌবনের উচ্ছলতার বিন্দুমাত্র চিহ্ন প্রকট ছিল না, আর সংযত মুখাবয়বে একটা গুরুগম্ভীর শুচিতার ভাব ছাড়া আর কিছু লক্ষ্য হত না, তবু তাঁর নিমীলিত নেত্রের কোলে কোলে, তাঁর ঈষৎ অবাধ্য চূর্ণ কুন্তলের আঁকে বাঁকে এবং বিশেষ করে তাঁর ললাটের ধারে ধারে কয়েকটি নীলাভ

শিরার গতিবিধিতে, কেমন একটা রোমাঞ্চময় ইঙ্গিত নিহিত ছিল, যা সকল দুঃসাহসীকে যুগপৎ আহ্বান এবং ব্যাহত করত। কাজেই অনুমান করা যায় বয়সটা চল্লিশ পেরোয় নি।

মণিপিসি পুরুষজাতিকে ঘৃণা করতেন। সে এক পুরুষের ঘৃণা নয়। বংশপরম্পরায় মণিপিসির মাতৃবর্গ তাঁদের স্বামীদের, শ্বশুরদের, পিতাদের, ভাইদের এবং পুত্রদের বিরুদ্ধে যত নালিশ নীববে হৃদয়ের তলদেশে সঞ্চয় করে বেখেছিলেন, মণিপিসি যে একাকিনী সে সকলের উত্তবাধিকাবিনী হয়েছিলেন তার বহু প্রমাণ পাওয়া যেত। যে জাতি সাধারণতঃ সূচে সূতো পবাতে পারে না, লম্বাচৌড়া কথা বলে কিন্তু একজন আকাট মুখ্যু অপোগণ্ড পঞ্চদশীর কথায় যাদের ওঠবোস করতে দেখা যায়, এমনিতেই তাদের শ্রদ্ধা করা মণিপিসির পক্ষে সম্ভবপব ছিল না। তদুপবি মণিপিসির সহকর্মিণী প্রৌঢ়া এবং যাবতীয় সাংসারিক ও বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞা মিসেস্ পালিত পুরুষমানুষদের কপটতা, শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে এমন ভূরি ভূবি দৃষ্টান্ত এবং অকাট্য সব যুক্তি প্রদর্শন করতেন যে দিনে দিনে মণিপিসিব চিত্তের চাবিদিকে কচ্ছপের খোলাব চেযেও শতগুণ মজবুৎ এক বর্ম বচিত হয়ে উঠেছিল।

বলা বাহুল্য, মণিপিসি দার্জিলিঙেব মেয়েদেব স্কুলে মাষ্টারি কবতেন। কাহিনীর পাঁচ বছব পূর্বে মেয়েদের বোর্ডিংএব মাসিমাব সঙ্গে তিক্ত কলহের ফলে ক্ষুদ্র এক আলাদা বাড়ি ভাডা কবে, নিজস্ব একটি কাঞ্চী নিযুক্ত কবে সেই অবধি একাধাবে আবাম ও আত্মসম্মান বক্ষা কবছিলেন। তবে নিন্দুকবা মণিপিসিব মতো একজন অনতিবৃদ্ধাব দুঃসাহসিকতাব সমালোচনা না করে ছাড়ত না, এবং অনেক সময় কোনো অভাবনীয় সাংঘাতিক ভবিষ্যদ্বাণী কবতেও পিছপাও হত না। মণিপিসিও যথাসাধ্য সতর্কতা অবলম্বন করেই চলতেন। দরজা জানলায় আবেকটা করে ছিটকিনি লাগিযে নিলেন, একটা ভুটিয়া কুকুবের বাচ্চা কিনলেন, কিন্তু সে এমনই নিদ্রাপরায়ণ যে বিপদ্‌কালে তাকে দিযে কতখানি কর্তব্যসাধন হবে বলা কঠিন তবে দেখতে ভাবি মিষ্টি, কুৎকুতে চোখ তুলে লালপানা জিভ বের কবে যখন মণিপিসির কোণাভাঙ্গা গোলাপী পিবিচ থেকে চুক্‌চুক্ শব্দ করে দুগ্ধপান কবত, তখন মণিপিসির তৃতীয় পঞ্জরেব নিচে প্রজাপতিব পাখা নাড়ার মত একটা কোমল অনুভূতি হত।

যাই হক্, মণিপিসি সন্ধ্যা হবাব পূর্বেই কাজকর্ম বেড়ানো কুড়ানো সমাধা কবে নিজগৃহের নিরাপত্তার মধ্যে ফিরে আসতেন। এসেই গোলাপী পুরু পর্দাগুলিকে টেনে দিযে, গোলাপী সেড্ লাগান টেবিল ল্যাম্পটি জ্বেলে খাতাপত্রে মনোনিবেশ করতেন। ঠিক আটটাব সময় প্রৌঢ়া কাঞ্চী—যুবতী নিযুক্ত করা মিসেস্ পালিতের উপদেশ বিরুদ্ধ—ক্ষুদে টেবিলে মণিপিসির যৎসামান্য নৈশভোজনের উপকরণ সাজিয়ে রেখে, মুখে মাথায় চাদরখানি জড়িয়ে, নিচে ঝোড়ার

ধারে তার কুটিরখানির অভিমুখে রওনা হয়ে যেত। তখন শত কাকুতি মিনতি করলেও তাকে, ধরে রাখা যেত না। অবশ্য কাকুতি মিনতি করা মণিপিসির মতো একজন আত্মসম্মানপরায়ণা নারীর স্বভাববিরুদ্ধ। তথাপি সত্যের খাতিরে একথাও স্বীকার্য যে কাঞ্চীর প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িঘর এবং তার পারিপার্শ্বিক কেমন একটা সম্ভাবনাময় হয়ে উঠত, সে ভীতির না রোমাঞ্চের কে জানে। এই সময় প্রত্যহই মণিপিসির একটু একটু বুক ঢিপ ঢিপ করত, কাঞ্চীকে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করতে বলে খাটের নিচে, পর্দার পিছনে, স্নানের ঘরে, রান্নাঘরের কয়লার বাক্সের ভিতরে, একটা চকিত-পরিদর্শন সম্পন্ন করে নিতেন।

দার্জিলিঙে যদি শীতকালে বৃষ্টি পড়ে সে যে কেমন ধারা হয়, যে না দেখেছে তাকে বোঝানো যাবে না। একদিন সেই রকম বৃষ্টি হল। স্কুল ছুটির পর সেদিন অধ্যাপিকা মণ্ডলীর মিটিং ছিল, প্রধানা শিক্ষিকা মিস্ অ্যাডি সকলকে প্রচুর জলযোগও করালেন। বিষয়টাও গুরুতর, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্য-পরিকল্পনা-কমিটির কয়েকজন সদস্য এসেছেন, দুদিন ধরে স্কুল পরিদর্শন করবেন, তাঁদের রিপোর্টের উপর স্কুলের গোটা ভবিষ্যৎটাই নির্ভর করে আছে, অতএব সমগ্র অধ্যাপিকা মণ্ডলীর সহযোগের প্রয়োজন! দুজন এসে গেছেন, কালই হয়তো তৃতীয় সদস্যও উপস্থিত হবেন এবং পরিদর্শন সুরু হবে।

ঘরে ইলেক্‌ট্রিক হীটার জ্বালানো হয়েছিল, মিস্ অ্যাডির বাবুর্চির মাংসের সিঙ্গাড়াগুলিও একেবারে অননুকরণীয় ছিল; সবটা মিলে এমন একটা আরামপ্রদ কবোষ্ণতার সৃষ্টি করেছিল যে অঙ্কের দিদিমণি তাঁর মারাত্মক শত্রু ছবিআঁকা দিদিমণির সঙ্গে পাঁচ মাস অসহযোগের পর শুধু যে কথা বলে ফেললেন, তাই নয়, তার উপর তাঁর পশমের জামা বুননের জটিল প্রণালীটি জলের মতো করে বুঝিয়ে দিলেন। অঙ্কের দিদিমণি তাঁকে ক্ষমা করবার সুযোগ লাভ করে অনভ্যস্ত আত্মপ্রসাদের চোটে মণিপিসির প্রতি উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টিপাত করে বললেন—"মণি, তুমি আর দেরি কর না। ভালো ভালোয় বাড়ি চলে যাও। দিনকাল বড় খারাপ।"

বাইরে তখন বারিবর্ষণ থেমে গেছে, কিন্তু ঘন কুয়াসায় চারিদিক লিপ্ত হয়ে আছে, একহাত পথ দেখা যায় না। মিস্ অ্যাডিও সেই সূত্রে বললেন—"যাও, মণি। তোমাকেই দূরে যেতে হবে, আমার তো পাশের বাড়ি, মিসেস্ মল্লিকও নাই। আর সব বোর্ডিঙের বাসিন্দা। তুমি দেরি কর না। চৌকিদার বরং একটু এগিয়ে দিক।"

মণিপিসি প্রতিবাদ করতে যাচ্ছেন, হেনকালে চৌকিদার এসে জানাল যে জেলখানা থেকে একজন নামজাদা কয়েদী পলায়ন করেছে, পুলিশের লোক বাড়ি বাড়ি গিয়ে সকলকে সাবধান করে দিচ্ছে।

মিস্ অ্যাডি জিজ্ঞাসা করলেন—"কে লোকটা? কি করেছিল?"

শোনা গেল গুণের তার অন্ত নেই, শিক্ষিত লোক অথচ নোট জাল করে সাতবছরের কারাবাসের মাত্র দুবছর কাটিয়েছে, বদমায়েসের একশেষ, গুণ্ডা প্রকৃতির, খুনখারাবিতেও যে পেছপাও হবে এমন মনে হয় না। বিবর্ণ মুখে মিস্ অ্যাডি বললেন, "মণি, সত্যি যাবে? থেকেই যাও না, আমার রুমে বরং আজ শুয়ে থাক।"

কিন্তু মণিপিসি কিছুতেই রাজী হলেন না, বাড়িতে কাঞ্চী বসে থাকবে, তারো তো তাহলে বাড়ি যেতে বিলম্ব হবে। অগত্যা চৌকিদার সমভিব্যাহারে মণিপিসি দুরু দুরু বক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদে বাড়ি পৌঁছুলেন।

চৌকিদার বিদায় নিলে, কাঞ্চীকেও মণিপিসি তার সঙ্গে দিয়ে দিলেন। দরজা বন্ধ করে জানলাগুলির ছিটকিনি ইত্যাদি পরীক্ষা করে, খাটের নিচে, টেবিলের তলায় পর্দার আড়ালে দেখে নিয়ে, রান্নাঘরে গেলেন। কুকুর বাচ্চাও জেগে গিয়ে নেচেকুঁদে একাকার।

কাঞ্চী রান্নাঘরের দরজা ভিতর থেকে ভালো করে বন্ধ করে দিয়েছে। কুকুর বাচ্চা সেই বন্ধ দরজার উপর বার বার আছড়িয়ে পড়তে লাগল, আর তার কণ্ঠস্বরে রান্নাঘরের মধ্যে প্রতিধ্বনি হতে লাগল। মণিপিসি শেষ পর্যন্ত দরজা খুলতে বাধ্য হলেন। খুলেই তাঁর হৃৎপিণ্ড যেন এক মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে, পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মতো ডানা ঝাপটাতে লাগল। পিছনের বারান্দার রেলিংএর ধারে একজন পুরুষমানুষ শয়ান।

কি যে মনে হল মণিপিসির বিশ্লেষণ করে বলা শক্ত। কোন সতর্কতর কারণে বারান্দার আলো না জ্বেলে, রান্নাঘরের একটুখানি আলোতে মানুষটিকে পরীক্ষা করলেন, তাও বলা শক্ত। একেবারে অচেতন; কাঁধের কাছে জখম হয়েছে, ছাই রংএর কোটটার ফাঁক দিয়ে, সার্টে রক্তের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, খুব ছোট করে চুল ছাঁটা, দু একদিন খেউরিও হয় নি। মুখের উপর টর্চ ফেলে মণিপিসি আরো লক্ষ্য করলেন, কেমন ক্লিষ্ট মুখখানি, চোখের নিচে গভীর কালি। ওখানে নিশ্চয় ভালো করে খেতে দেয় না!

মণিপিসি নিজের বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে তাকে টেনে ঘরে এনে পুনরায় দরজা বন্ধ করলেন। রান্নাঘরের মেঝেটা বড় ঠাণ্ডা, তাকে শোবার ঘরে আনতে হল। ততক্ষণে মণিপিসির কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। রোগা হলে কি হবে, দারুণ ভারি। পুরুষমানুষদের সবই অদ্ভুত। মণিপিসি নিজের বিছানা থেকে লেপ কম্বল বালিশ দিয়ে তার আরাম বিধান করলেন। হাতের হাড় এত সরু যে মণিপিসির সমস্ত অন্তঃকরণ অনুকম্পায় পূর্ণ হল। মাথায়ও চোট লেগেছে। ডাক্তার ডাকা উচিত। কিন্তু তা হলে আর এত কষ্টের স্বাধীনতা ভোগ করতে হবে না।

মণিপিসি গরম জল করে আঘাতগুলো একটু একটু ধুয়ে আইডিন লাগিয়ে

দিলেন। জোর করে চামচ দিয়ে একটু দুধও খাওয়ালেন। কতকাল দুধ খায় নি কে জানে।

শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে মণিপিসিকে শয্যাগ্রহণ করতে হয়েছিল। তোলা কম্বল দুখানি বের করে বসবার ঘরের কুশনের একখানিতে মাথা রেখে, আলো জ্বেলে, মণিপিসি নিদ্রায় অভিভূতা হলেন। থেকে থেকে নিদ্রাভঙ্গ হতে থাকল। কতকটা উদ্বেগে—লোকটার চেতনা ফিরে আসে না কেন, কতকটা দুশ্চিন্তায়—একজন পুরুষজাতীয় লোককে ঘরে ঠাঁই দিয়ে কাজটা ভালো হল কি না ভেবে। মিসেস্ পালিতের কাছ থেকে ব্যাপারটা আগাগোড়া গোপন করার প্রয়োজনীয়তা বারংবার মনে হয়েছিল, কিন্তু লোক ডেকে এনে দায়মুক্ত হবার কথা একবারো মনে হয় নি।

পরদিনও তার চেতনা হল না, আর মণিপিসি জীবনে এই প্রথম এমন এক মিথ্যার জালে জড়িত হয়ে পড়লেন, যে তার থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। প্রথমে সকালে কাঞ্চী আসবামাত্র মণিপিসি তাকে বললেন, "কাঞ্চী, তোর সাতদিন ছুটি, আমি ঘর বন্ধ করে বোর্ডিংএ থাকব।"

কাঞ্চী চলে গেলে বিবেক এসে নির্মমভাবে মণিপিসিকে দংশন করতে লাগল। মণিপিসি মিথ্যা কথাকে চিরকাল ঘৃণা করে এসেছেন।

লোকটিকে দু ফোঁটা দুধ খাইয়ে, হাতের কাছে জল রেখে, ছোট একটা কাগজে দুটো আশ্বাসবাণী লিখে রেখে, লেপ কম্বল ঠিক করে গুঁজে দিয়ে নিজে শুধু দুধ রুটি খেয়ে দরজায় তালা দিয়ে স্কুলে যেতে মণিপিসির দশ পনেরো মিনিট দেরী হল। হাজার রকমের মিথ্যা কথা বলতে হল। টিফিনের ছুটিতে অসুস্থতার ভান করে মণিপিসি বাড়ি ফিরে এলেন। তৃতীয় ব্যক্তি সেদিনো না আসাতে ভাগ্যিস পরিদর্শন স্থগিত ছিল। বিষণ্নচিত্তে ভাবতে লাগলেন, মিথ্যাকথ্যা বলতে একবারো দ্বিধা করলাম না। একবার পদস্খলন হলে, মানুষের এমনি করে ধাপে ধাপে অধঃপতন হয়।

তালা খুলে ঘরে এসে দেখেন লোকটির জ্ঞান হয়েছে, কম্বল মুড়ি দিয়ে মণিপিসির চিঠিখানি পড়ছে। মণিপিসির দিকে অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে রইল, মণিপিসি বই খাতা রেখে তাকে আশ্বাস দিলেন—

"এখান থেকে কেউ তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে না। আমি কাউকে আসতে দেব না, দুদিন বিশ্রাম করলেই শরীরে শক্তি ফিরে আসবে, তখন রাত্রিকালে চুপিচুপি চলে গেলে কেউ টেরও পাবে না, তবে হেঁটে যেতে হবে, মোটরে ট্রেনে পাহারাওয়ালা থাকবে, কিন্তু কোনো ভয় নেই, আমি টাকা দেব, গাঁয়ের লোকেরা আশ্রয় দেবে, মোটে তো পঞ্চাশ মাইল নিচে পৌঁছে গেলে আর কেউ ধরতে পারবে না। কিন্তু নোট জাল করা, বা কোনো রকম মিথ্যা আচরণ করা মহা পাপ, আর কখনো এমন কর না। ইত্যাদি।

প্রথমে সে বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়েছিল, ধীরে ধীরে দৃষ্টির মধ্যে সংজ্ঞা ফিরে এল, এমন কি মণিপিসির মনে হল যেন অধরের কোণে ক্ষীণ একটু কৌতুকের রেখাও মুহূর্তের জন্য দেখা দিল, কিন্তু সে এত অল্প সময়ের জন্য যে ভুলও হতে পাবে। তত্ত্ব কথা শুনলে দুর্বৃত্তদের হাসি পাবারি কথা। মনে মনে একটু আহত হয়ে মণিপিসি রান্নাঘবে ষ্টোভ জ্বেলে দুজনাব জন্য সাধাসিধা রাঁধাবাড়া করলেন।

লোকটি উঠে দেয়াল ধবে ধবে স্নানের ঘবে গিযে নিজেই হাত মুখ ধুয়ে এল। বালিসে ঠেস দিযে অল্প কিছু খেলও। মণিপিসিব উদ্বেগেব শেষ নেই, বেশি খেলে যদি অসুখ কবে, আবার কম খেলে যদি দুর্বল হয়ে যায়। দুটি একটি কথাও বলল, কুয়াশাতে পথ দেখতে পাযনি, পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে এমন ধাবা হয়েছে, আলো দেখে মণিপিসিব বাডি অবধি পৌঁছে আব কিছু মনে নেই। মণিপিসিব মুখের গ্রাসটা দ্বিগুণ বড় হযে উঠে আব গলা দিযে নামতেই চায় না। সংক্ষেপে বললেন,

"ঘর থেকে বেবিও না, দুদিন পবেই শক্তি ফিবে আসবে। একজন ডাক্তাব ডাকলে ভালো হত, কিন্তু জানাজানি হযে যাবাব ভয় আছে, তাই না ডাকাই ভালো। মুখ্যু লোকবা খেতে পায না তাবা না হয পেটেব দায়ে অন্যায় কাজ কবে, কিন্তু শিক্ষিত লোকবা কেন নোট জাল কববে ? ও একবকম মিথ্যা আচবণ, মিথ্যাকে ঘৃণা কবতে হয।" যতই বলেন সাবাদিনেব মিথ্যা কথাগুলো সাবি বেঁধে সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। মণিপিসি মনকে শক্ত কবে বললেন—"খালি যদি অন্যকে সাহায্য কববাব জন্য দবকাব হয, তবেই মিথ্যা কথা বলা যেতে পাবে, তাও বেশি নয।"

লোকটি মাঝে মাঝে মণিপিসিব দিকে দৃষ্টিপাত কবে, একটু লুচি ছিঁড়ে মুখে দিতে লাগল। এমন সময বাইবেব দবজায মিস্ অ্যাডিব গলা শোনা গেল। মণিপিসি লোকটিকে বললেন—"তোমাব থালা গেলাস নিযে স্নানের ঘবে বেখে আসছি, তুমিও সেখানে গিযে বস। ওরা চলে গেলে আবাব এসো, কেমন ?"

দরজা খুলতেই শুধু মিস্ অ্যাডি নয, আবো দুজন ভদ্রলোক এলেন। মিস্ অ্যাডি তাঁদেব পরিচয করিয়ে দিলেন, এঁরাই সেই কমিটি মেম্বার। আর অপেক্ষা কবা নয, কাল থেকেই কাজ সুরু। ওঁদেব হোটেলে যাবার পথে মণিকে বলে যাবার জন্যই শুধু আসা। তা মণি তো ভালোই আছে, লুচি খাচ্ছে যখন।

দরজাব পাশে একটা ছায়া পড়ল। মিস্ অ্যাডিব সঙ্গীদ্বয় উল্লসিত হয়ে বললেন—"আরে, এই তো প্রফেসর চৌধুরীও হাজির হয়েছেন—কি ব্যাপার বলুন তো মশাই ?"

লোকটি ধীরে ধীরে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। মণিপিসি বললেন—"পড়ে গিয়ে ওঁর লেগেছে, আমি আইডিন দিয়েছি, বোধ হয় ডাক্তার ডাকা দরকার।"

তাঁরা সকলে ডাক্তার ডাকতে গেলে পর, লোকটি ধীরে ধীরে মণিপিসিকে বলল—"আমাকে দেখে দুষ্টুলোক বলে মনে হয় সত্যি?"

মণিপিসির খুব রাগ হয়েছিল, ভেবেছিলেন মেয়েদের প্রবঞ্চনা করা বিষয় বেশ কড়া কড়া দুকথা শুনিয়ে দেবেন। কিন্তু লোকটির কথা শুনে দূরে পাহাড়ের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বললেন--

"আশা করি সেই লোকটিকে কেউ ধরতে পারবে না। আশা করি এতক্ষণ সে বহুদূরে নিরাপদ জায়গায় চলে গেছে।"

এ গল্প দয়ার কাহিনী নয়, প্রেমের গল্প। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, প্রফেসর চৌধুরী সৎচরিত্র, স্বচ্ছল এবং অবিবাহিত ছিলেন, এবং পরে স্বীকার করেছিলেন যে, প্রথম দর্শনেই মণিপিসির সঙ্গে প্রেমে পড়েছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম মণিপিসির দয়ামায়ার জন্য কি না? বললেন—"দয়া-মায়ার তো বিশেষ পরিচয়ই পাই নি, সারাক্ষণই তো নীতিশিক্ষা দিল। তবে যারা অমন স্বচ্ছন্দে মিথ্যা কথা বলে, আর কানের পাশ দিয়ে যাদের চুল ঐ রকম ঘুরে ঘুরে গজায়, তাদের আমি ভালো না বেসে পারি না।" মণিপিসি এ কথা শুনে একবার শুধু চোখ তুলে তাকালেন।

প্রেমের বৈলক্ষণ্য

প্রেমের যে একটা নিদারুণ উড়নচড়ে স্বভাব আছে, একথা আমি বহুবার বলেওছি আর আমাদের পারিবারিক ইতিহাস থেকে তাব ভূরিভূরি দৃষ্টান্তও দিয়েছি।

গোড়া থেকেই বলে রাখা উচিত যে উপরিলিখিত উক্তি শুধু নরনারীর প্রেম কেন, সর্বপ্রকাব ভালোবাসার ব্যাপারেই খাটে। এমন কি নিঃস্বার্থ ভালো-বাসার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ যে বাবা মাব স্নেহ, তাই ধরা যাক না কেন। যত্রতত্র দেখা যায় ভালোভালো বাবা-মাবা তাঁদের পাজীর-পা ঝাড়া সব ছেলে-মেয়েদের গভীরভাবে ভালোবাসছেন, অথচ অনাদেব লক্ষ্মীমন্ত ছেলে-মেয়েদের সম্বন্ধে হয় তাঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন, নয় দারুণ অসহিষ্ণু! উপবন্ত সব চেয়ে বিস্ময়কর রহস্য হল যে, ঐ সন্তানরা জন্মাবার অনতিকাল পবেই দৈবাৎ কোনো অসতর্ক ধাত্রীর অন্যমনস্কতার হেতুই হক, বা যে কাবণেই হক, দুই বাড়ির নবজাত সন্তানরা যদি পিতামাতার অজ্ঞাতসারে পালটে গিযে, এ-বাড়িরটি ও-বাড়ি এবং ও-বাড়িবটি এ-বাড়ি এসে পড়ত, তাঁরা কিছু টেরও পেতেন না এবং তেমনি গভীরভাবে ভুল ছেলে-মেয়েদের ভালোবেসে যেতেন! প্রেমের নির্বুদ্ধিতার এর চেয়ে বড় নজিব খুঁজে পাওযা দায।

নবনারীর প্রেমের মধ্যেও এই একই অযৌক্তিকভাব দৃষ্ট হয়। যেমন ধরুন, আমাব অনিপিসিব বিবাহ ব্যাপার। সেকালের হিসাবে, অনিপিসি অতিশয প্রগতিশীল পবিবাবেই জন্মেছিলেন এবং প্রগতিশীল পরিবারে যেমনধারা হত, জন্মাবধি তাঁর প্রত্যেকটি বাক্য ও কর্মের উপর সতর্ক প্রহবা রাখা হয়েছিল। ইস্কুলে ও পবে কলেজে লেখাপড়া, মেম রেখে মখমলের উপর লাল-নীল সূতো দিয়ে টিয়া পাখির নক্সা তোলা, রান্না, পিয়ানো বাজানো, কোনো কিছুই বাদ যায়নি। নিশ্চয় বুঝতেই পাবছেন, অনিপিসি ছিলেন তাঁর বাবা-মার নয়নের মণিটি! হিংসুটে আত্মীয়-স্বজনরা গায়ের জ্বালায় যাই বলুক না কেন, অনিপিসি যে নানান গুণের আধার ছিলেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সুন্দরী না হলেও চেহারাখানির মধ্যে ভারি একটা জৌলস ছিল, সেটা ফটোগ্রাফে পর্যন্ত ধরা পড়ত। তার উপব বেথুন কলেজ থেকে বি-এ পাশ করে রুপোর মেডেল পেয়েছেন বলে লোকের মুখে আর তাঁর প্রশংসা ধরে না! এবং অন্যান্য প্রগতিশীল পরিবারের উপযুক্ত তরুণরা নানারূপ সুখস্বপনও যে একেবারে দেখত না এমন নয়। তাঁদের মা-মাসিরা শুধু যে অনিপিসিদের বাড়িতে ঘনঘন পায়ের ধুলো

দিতেন তাও নয়, তাঁদের বাড়িতেও আদর করে অনিপিসিদের গোটা পরিবার-টিকে নিয়ে যেতেন।

শুনেছি, তখনকার দিনে পয়লা বৈশাখ-টৈশাখের প্রচলন না থাকলেও, ইংরেজী নববর্ষে অনিপিসিদের বসবার ঘর ফুলের তোড়ায় ও নানারকমের সুন্দর সুন্দর ছবিদেওয়া কার্ডে নন্দনকাননে পরিণত হত। অর্থাৎ কিনা, শিক্ষাও যেমন পেয়েছিলেন, তদনুরূপ আদরেরও অভাব ছিল না।

এমনি সময় বিনামেঘে বজ্রপাত হয়ে তাঁদের পারিবারিক সুখশান্তি দীর্ঘ-কালের জন্য বিনষ্ট হল। ব্যাপার শুরু হয়েছিল,—যখন অনিপিসির বাবার অপিসের মিঃ হরিদাস চক্রবর্তীর একমাত্র ছেলে, দীপেন বিলেত থেকে পাশ করে একেবারে বিলিতী কোম্পানিতে চাকরি নিয়ে দেশে ফিরে এল। ছেলে তো নয়, যেন হীরের টুকরোটি! অনিপিসি তাকে কখনো চোখেও দেখেননি, কিন্তু একেবারে কার্তিকটি না হলেও চেহারাটি এমন কিছু মন্দ না,—নারীহৃদয় জয় করবার পক্ষে যথেষ্ট ভালোই। তাই উভয় পক্ষের বাবা-মারা যে উৎসাহিত হয়ে পড়বেন এ আর বিচিত্র কি!

বয়স্ক ছেলে-মেয়েকে, পরস্পরের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ না করিয়ে, একেবারে গাঁটছড়া বেঁধে দেওয়ার মধ্যে কেমন একটা সংরক্ষণশীল ও বর্বর ভাব আছে, এ কথা সকলেই জানতেন।

সব অনুষ্ঠানেরই একটা পদ্ধতি থাকে এর বেলাও তাই। গুরুজনেরা দেখেশুনে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করে, তবে তাদের আলাপ-পরিচয় করিয়ে দেবেন। তারাও পরস্পরকে চিনবে।—যাচাই করবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না কারণ,—গুরুজনেরা তো আর কেউ কাঁচা ছেলে নন।—তাঁরা আঁট-ঘাট বেঁধে, সবদিক বিবেচনা করেই কর্মে প্রবৃত্ত হয়ে থাকেন। তবে কি না, যার সঙ্গে কোনো দিনো কথাই বললাম না, তার গলায় মালা দিতে অন্ততঃ শিক্ষিতা ও প্রগতি-শীলাদের কেমন যেন বাধ-বাধ লাগে।

এই সকল কারণে, শ্রাবণের এক কোমল সন্ধ্যায় মিঃ চক্রবর্তীর বাড়িতে সান্ধ্য-সম্মেলনের আয়োজন হল। বর্ষার ভিজে ভিজে দিনগুলি তখন হয় ভারি মিঠে, মন আপনা থেকেই নরম হয়ে আসে, তার উপর শুভকার্যে বিলম্ব করা নিছক মূঢ়তা,—এ কথা কে না জানে?

গোলমাল বাধল অনিপিসিকে নিয়ে। নিমন্ত্রণের কথা বলবামাত্র তিনি কেঁদে বিছানার উপর আছড়ে পড়লেন। অবেলায় বিছানা হাটকানোর জন্য তাঁর মা যত না অসন্তুষ্ট হলেন,—ব্যাকুল হলেন তার চেয়ে বেশি।

"ও অনি, খুলেই বল্ না, অমন করে কাঁদিস নারে মা।"

অগত্যা বিষম খেয়ে, ঢোক গিলে, হিক্কা তুলে, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে অনিপিসি

বড় সাংঘাতিক কথা বললেন। বিস্ফারিত লোচনে মায়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে লজ্জার মাথা খেয়ে বলে বসলেন,—

"বিয়েই যদি করতে হয়, তাহলে একমাত্র পদোকে ছাড়া আমি আর কাউকে বিয়ে করতে পারব না।"

মা-মাসিরা অবাক মানলেন, মেয়ে বলে কি! কোথায় অমন সোনার চাঁদ ছেলে দীপেন,—আর কোথায় ঐ পদো! না আছে তার টাকা-পয়সা, বিষয়-আশয়, চাকরি-বাকরি, না আছে তার বিদ্যে-বুদ্ধি, বংশগৌরব।

বড়মাসি বললেন—"পদোকে আবার বিয়ে করা যায় নাকি? বাপটিতো জুয়ো খেলে যথাসর্বস্ব উড়িয়ে পুড়িয়ে এখন শুনি কোন গুরুঠাকুরের বাড়ি পড়ে থাকেন। মাটি তো চিরকাল নেকীর একশেষ!—এখন ভায়ের বাড়ির সবাইকে জ্বালিয়ে খাচ্ছেন, আর পদোটি তো মামার খরচায় তিন-তিনবার বি-এ ফেল করে এখন বোধ হয় ভেরেণ্ডা ভাজেন! আরে এই ছেলেকে একবার দেখই না।"

উত্তেজনার চোটে উঠে দাঁড়িয়ে অনিপিসি সরোষে বললেন "কখনো ভেরেণ্ডা ভাজে না। বেচারীর শরীর বড্ড ডেলিকেট বলে পড়াশুনো করতে পারে না, তাই বলে যে কিছু করে না ভেবো না। পার্কসাইড ক্লাবে বাঁশী বাজানো শেখায়। কোথাও একটা ভালো চাকরি পেলেই জয়েন করবে, তখন আমাদের ইয়ে—বেচারা গরীব কি না তাই তোমরা ওকে দেখতে পার না!"

এই বলে অনিপিসি বিছানায় মুখ গুঁজে সেই যে শুলেন, শত সাধ্য-সাধনাতেও আর উঠলেন না। মিঃ চক্রবর্তীদের বাড়িতে লিখে পাঠান হল—অনির মাম্প্‌স্‌ হয়েছে।

এই ঘটনার পর অগত্যা স্তম্ভিত গুরুজনরা সকলে অনিপিসিকে মধুপুরে নলিনীমাসির তত্ত্বাবধানে সমর্পণ করা ছাড়া, আর উপায়ান্তর দেখলেন না। যৌবনে কোনো অজ্ঞাত পুরুষ মানুষের কাছে হৃদয়ে কঠিন আঘাত পাওয়াতে, নলিনীমাসি সবদিক দিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত তরুণীদের সুযোগ্যা অভিভাবিকা। সারা জীবন মফঃস্বলে কোন মেয়ে স্কুলের প্রধানা শিক্ষিকার কাজ করে, কিছুদিন হল অবসর নিয়ে মধুপুরে একটি বাড়ি কিনে সেখানেই বসবাস করছেন, ও বছরে বছরে সেরা ক্রিসেন্‌থিমাম্‌ ফোটানোর জন্য বিস্তর সার্টিফিকেট ও স্বর্ণপদক পাচ্ছেন।

দিন কুড়ি বাদে অগত্যা একদিন সন্ধ্যাবেলা বৃদ্ধ বিপিনকাকার হেপাজতে যখন মধুপুর ষ্টেশনে অনিপিসি গাড়ি থেকে নামলেন তখন তাঁর হৃদয়-রাজ্যে যেমন অনবরত অশ্রুসিঞ্চন হচ্ছিল, বহির্জগতও অবিরল বারিধারাপাতে ভিজে সপ্‌সপ্‌ করছিল।

একটি ভুস্‌কো রং-এর বর্ষাতি গায়ে দিয়ে পুরুষদের বড় ছাতা মাথায়,

স্বয়ং নলিনীমাসি তাঁদের নিতে এসেছেন। কিন্তু বিপিনকাকা যদি মধুপুরের স্বাস্থ্যপূর্ণ আবহাওয়াতে দু একটি দিবসরজনী কাটাবার দুরাশা চিত্তে পোষণ করে থাকতেন, নলিনীমাসির পৌরুষ কণ্ঠে সে সুখস্বপ্ন নিমেষের মধ্যে ঘুচে গেল।

"আপনি ওদিকের প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দাঁড়ান বিপিনবাবু, দশ মিনিটের মধ্যে আপনার ট্রেণ এসে পড়বে। নইলে এই ষ্টেশনেই আপনাকে রাত দুটোর প্যাসেঞ্জারের জন্য বসে থাকতে হবে।"

বলে কুলির মাথায় অনিপিসির কালো ট্রাঙ্কটা অবলীলাক্রমে নিজের হাতে তুলে দিয়ে, অনিপিসির বাঁ হাতের কনুইটা দৃঢ়মুষ্ঠিতে ধরে, ফিতে বাঁধা কালো জুতো পায়ে হন্ হন্ করে ষ্টেশনের এলাকা পেরিয়ে চললেন।

অনিপিসির চোখ ফেটে জল এল। একে হৃদয়ের নিভৃততম স্থানটি গুরুজনদের সহানুভূতিশূন্য ব্যবহারে জর্জরিত, তাব ওপর সাবাটা পথ বিপিন-কাকা তাঁর শরীরের নানান স্থানের ব্যামোব্যাধির ইতিহাস বর্ণনা করতে করতে এসেছেন, একবারটি চায়ের কথা উত্থাপন করারো প্রয়োজন বোধ করেন নি। উপরন্তু রুমালের আড়ালে গোপনে অশ্রু বিসর্জন কবে কবে অনিপিসিব চোখ দুখানি ফুলে জবাফুলের মত লাল হয়ে, সে যে কি বিশ্রী দেখাচ্ছিল অনিপিসি নিজেই সেটা অনুমান করতে পারছিলেন। নলিনীমাসি কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে একটা টঙা বা এক্কা পর্যন্ত না ডেকে, নিজের ছাতা দিয়ে অনিপিসিকে আড়াল করে বাতাসের মুখে ছুটে চললেন।

"চল, চল, পা চালা। বাড়িতে কি খাস? দুধভাত নাকি? পাদুটো যেন ময়দার তৈরী মনে হচ্ছে!"

ঢোক গিলতে পর্যন্ত অনিপিসির গলায় টনটন করতে লাগল। ছাতা বন্ধ করে নলিনীমাসি বললেন, "যাক বাঁচা গেল, বৃষ্টিটা থামল। ভাগ্যিস ছাতাটি ছিল, বুঝলি—এই ছাতাই হল নারীদের প্রধান সহায়। পেটে ভাত, হাতে ছাতা,—ব্যস্, দুনিয়াতে কাউকে আমি ভয় পাইনে। পুরুষ-মানুষদের সাপের মত জ্ঞান করবি। আরে তোর হল কি? সেপাই-এর মত হাঁটবি, লেফ্ট্ রাইট লেফ্ট্ রাইট্।"

(২)

তবু সুবিধের কথা এইটুকু যে, কাছেই বাড়ি। কিন্তু ঝিরঝির করে আবার বৃষ্টি পড়তে সুরু করেছে, ঐটুকু হাঁটতেই অনিপিসির সাপের চামড়ার 'কোর্ট-সুর' গোড়ালি বেঁকে যাচ্ছিল আর ফিকে গোলাপি রেশমি মোজাতে বালি কাদার ছিটে লেগে যাচ্ছিল। তায় আবার, নলিনীমাসির বয়স হলে কি হবে, হাওয়ার মাথায় এগিয়ে যাচ্ছিলেন।

বাড়ির সামনেই একটু ফুলবাগান ; পাশে দুটি ইউকালিপটাস গাছ সুগন্ধ ছড়াচ্ছে। কাঠের একটুখানি গেটের সামনে দাঁড়িয়ে নলিনীমাসি হাঁক দিয়ে বললেন,

"আরে, ওরকম মাজাভাঙ্গা কলাগাছের মত ঝুলে পড়ছিস কেন? একবার চেয়ে দেখ কেমন চন্দ্রমল্লিকা ফুটিয়েছি। বুঝলি কি না, এই গোবর আর ছাই আধাআধি মাপে,—ব্যস্, আর কিছু নয়। আহা চক্ষু জুড়োয় কি না তাই বল। দেখ, ঝপাঝপ বাগান কোপাবি, দরদর ঘাম ঝরবে, গাঁউ গাঁউ মাংসভাত খাবি, খাসা হজম হবে, প্রেম-ট্রেম সব সেরে যাবে। আমাকে দেখে"——নলিনীমাসি হঠাৎ গলা নামিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বললেন—

"ঐ যে সেই স্কাউনড্রেলটা! বদমাইসের একশেষ! তাকাসনে বলছি।"

অনিপিসি হকচকিয়ে গিয়ে, কোন দিকে তাকাতে হবে না বুঝতে না পেরে, চোখ তুলতেই পাশের বাড়ির গেটের ধারে দাঁড়ানো এক যুবাপুরুষের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। পরনে তার বিলিতি কায়দায় বারান্দাওয়ালা টুপি, হাঁটুর নিচে আঁটো গল্ফ্ খেলবার পেণ্টেলুন, আর পাঁশুটে রং-এর কোমরে বেল্ট-দেওয়া হাল-ফ্যাসানের স্পোর্টিং কোট আর চোখ-ঝলসানো রংচঙ্গে মোজা, বগলে একটা গল্ফ ক্লাব্ আর হাতে একটা পাইপ ঝুলছে, মুখভরা হাসি। নমস্কার করে বললে, "এই যে মাসিমা, কেমন আছেন? বাড়িতে অতিথি এল বুঝি?"

রাগে নলিনীমাসির মুখ রাঙ্গা হয়ে উঠল। কোনো মতে ছোট একটা নমস্কার করে, কথার কোনো উত্তর না দিয়েই গট্ গট্ করে নিজের বারান্দায় গিয়ে উঠলেন।

বসবার ঘরটি দিব্যি একটা লম্বা চোং-লাগানো কেরোসিন ল্যাম্পে আলো হয়ে রয়েছে। বেতের আসবাব, রঙ্গিন ফুলতোলা কুশন, আর ছোটখাট টেব্‌ল-কভারের ছড়াছড়ি, চেয়ারের পিছনে—পাছে মাথার তেলের দাগ ধরে যায়,—তাই ছোট ছোট গোলাপি টুপি পরানো,—এখানে-ওখানে রূপোর ফ্রেমে আত্মীয়স্বজনের ছবি আঁটা, কাঁচের ফুলদানিতে নানারকম ফুলের বাহার।

অল্‌স্‌টারটা খুলে ফেলে রাগতভাবে নলিনীমাসি বললেন,

"খবরদার ওর সঙ্গে কথা বলবি নে। বদমাইসের একশেষ! তবে কি না, বাল্যবন্ধুর ভাইপো, একেবারে অভদ্র তো আর হওয়া যায় না, তাই প্রতিনমস্কারটা করতেই হয়।"

দুটি ছোট ছোট মৌমাছি পিন্ দিয়ে নলিনীমাসির মাথার কাপড়টা আটকানো ছিল, রাগের চোটে টান দিয়ে খুলতে গিয়ে, খানিকটা কাপড়ো ছিঁড়ে গেল। ঝোড়ো আকাশের মত মুখ করে চায়ের সরঞ্জামের সামনে বসে বললেন, "বিলেতে ওদের কি বলে জানিস? নেকড়ে বাঘ, উল্ফ্! ভদ্র-সমাজের

উল্ফ্! শিকারের খোঁজে সর্বদা ঘুরছে। অথচ বিলেত-ফেরৎ, রেলের এঞ্জিনিয়ার, মোটা মাইনেপায়। দুষ্টুর শিরোমণি এদিকে। ঐ খালি বাড়িতে একা আছে, নাকি ম্যালেরিয়ার পর শরীর সারাতে এসেছে। তিন মাসের ছুটি নিয়ে। অন্ততঃ আহ্লাদে পিসিটি তো তাই লিখেছেন। শরীর সারাতে না আরো কিছু! ঐ স্যাণ্ডোর মত চেহারা! তায় জুলপী রেখেছে কতখানি দেখলি? বদমায়েসির অন্ত নেই। নিত্যি বন্ধুবান্ধব আসছে, ষ্টেশনের রেস্তোরাঁ থেকে সোডার বোতল আসছে, আরো কিছু চলে কিনা কে জানে! আবার একটি নেড়িকুত্তো পোষা হয়েছে, তাব নাম রেখেছে "সুইটি-পাই", ঢং দেখে বাঁচিনে। খুব সাবধানে থাকবি, তোর ঘরেব ওদিককার জানালাগুলো বন্ধই রাখিস। সাহেবদের সঙ্গে তিন বছব বাস কবে এসেছে, ওসব লোকদের বিশ্বাস নেই।"

পরদিন সকালে অনিপিসির হাতে ছোট একটা খুবপি দিযে নলিনীমাসি-হাটে গেলেন ;—

"দেখ এক্সাবসাইজের মতন উড়ু-উড়ু মনের আব কোনো ওষুধ নেই। ফিরে এসে দেখতে চাই এই সাবা লাইনটার আগাছা তুলে রেখেছ।"

পদোর কথা ভাবতে ভাবতে গুটি চাবেক আগাছা তুলেই, সোনালি বোদ-মাখা সকাল বেলাতে, ক্রিসেনথিমামেব ঝাড়েব পাশে, সবুজ নরম ঘাসের ওপব বসে, হাঁটুব মধ্যে মুখ গুঁজে অনিপিসি অঝোব নয়নে কাঁদতে লাগলেন। এমন সময মেঘেব মত গম্ভীব, বৃষ্টিব ধারাপাতেব মত স্নিগ্ধ কণ্ঠে কে যেন বলল—

'আহা, ও কি আপনার হাতে সাজে? দিন, আমি করে দিচ্ছি।"

অবাক হয়ে মুখ তুলতেই বিনাবাক্যে পাশেব বাড়িব দুষ্টু লোকটি হাত থকে খুবপিটি নিযে অনিপিসির দিকে পিঠ দিযে বসে কুড়ি মিনিটের মধ্যে সব আগাছা তুলে দিল! আব একটি কথাও বলল না।

অনিপিসিব চোখেব জল কখন শুকিয়ে গেল। আশ্চর্য হযে তাকিযে দেখলেন, লোকটাব ঘাড়েব কাছে বেঁটে চুলগুলো খাড়া হয়ে না থেকে, কি রকম পাকিযে পাকিযে রয়েছে। আর তাব সর্বাঙ্গ থেকে কেমন একটা তামাকের গন্ধেব সঙ্গে---হেয়ারওয়াসের গন্ধেব সঙ্গে কি একটা অজানা সুগন্ধ অনিপিসির নাকে এল।

আগাছা তোলা হযে গেলে লোকটি কাছে এসে খুবপি ফিরিয়ে দিযে, পকেট থেকে সাদা একখানি রুমাল বের কবে হাত ঝেড়ে বললে,

"হতাশ হবার ত কোনো কারণ নেই। জানেন, দুনিয়াতে সর্বদা প্রেমের জয় হয়।"

বলে এক লাফে বেড়া পার হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। নলিনীমাসি ফিরে এসে বাগান দেখে অবাক! বাঃ, বাগানে একবেলা কাজ করেই তোর

গালদুটি কেমন রাঙা হয়ে উঠেছে,—বলি না, বাগানের মতো কিছু নেই! ততক্ষণে গণ্ডদেশ ছেড়ে মণিপিসির ললাট পর্যন্ত রক্তিম হয়ে উঠেছে।

যাবার সময় অত কথা বলে পদো কিন্তু একখানি চিঠিও লেখে না! অনিপিসির বুকখানি জলভারাক্রান্ত মেঘের মত হয়ে ওঠে। পদোর চাঁদপানা মুখখানি দেখবার জন্য দুই চোখ ব্যাকুল হয়ে ওঠে। পাশের বাড়ির লোকটা লুকিয়ে লুকিয়ে সান্ত্বনা দেয়, একদিন চিঠি না লেখার একশোটা কারণ দিয়ে একটা লম্বা ফর্দও বানিয়ে এনে দিল। পড়ে অনিপিসি হেসেই লুটোপুটি!

রোজ বিকেলে নলিনীমাসি ওপাড়ার মিসেস্ মল্লিকের বাড়ি ব্রিজ্ খেলতে যান, অনিপিসিকে বাগানের কাজ বুঝিয়ে দেবার পর। আর রোজ সেই লোকটি এসে সাহায্য করে। তার নাম রবিন—তার দাঁতগুলি যেন মুক্তোর সারি! আর মনটা এমন নরম যে, মনের কথা সব বলা যায়। পদোর বিষয় তার কিছু জানতে বাকি নেই। তবে এক মাস পরে সে ডেরি-অন্-সোনে চলে যাবে, রেলের ব্রিজ্ তৈরী করতে। তারপর বাকি জীবনটা অনিপিসিকে একা একা পদোর কথা ভেবে কাটাতে হবে!

মাঝে মাঝে রাত্রে খাবার টেব্‌লে নলিনীমাসি বলেন, —

"ঐ লক্ষ্মীছাড়া তোকে জ্বালায় না তো?"

আর অনিপিসি সজোরে মাথা নাড়েন, আর মিথ্যা আচরণ করার জন্য তাঁর কান দুটি গরম হয়ে ওঠে।

দেখতে দেখতে এক মাস কেটে গেল. কাল সকালের গাড়িতে রবিন চলে যাবে। বিকেল বেলায় এতদিন বাদে পদোর কাছ থেকে একখানি চিঠি এল,— "প্রিয়তমা, অনিলা, আমি তোমার যোগ্য নই, তুমি আমাকে ভুলে যেও। তোমার বড় মেসোমহাশয় রেঙ্গুনে আমার চাকরি ঠিক করে দিয়েছেন। আমি চললাম। বিদায়।—হতভাগ্য পদো।"

চিঠি হাতে নিয়ে উদাস দৃষ্টিতে অনিপিসি বসে রইলেন!

এদিক ওদিক তাকিয়ে অতি সন্তর্পণে বেড়া ডিঙ্গিয়ে রবিন আসতেই, কম্পিত হস্তে তার হাতে চিঠিখানি তুলে দিয়ে, অনিপিসি চোখে রুমাল দিলেন! চিঠি পড়ে রবিন রাগে অন্ধ হয়ে গেল—

"স্কাউণ্ড্রেল! কাওয়ার্ড! রাউণ্ডার! দাঁড়াও না, চুলের মুঠি ধরে টেনে এনে দিচ্ছি, কেমন তোমায় বিয়ে না করে দেখব!"

তারপর অসহায়ভাবে এদিক ওদিক তাকিয়ে অনিপিসির কোঁকড়া চুলের ওপর আলগোছে একটা হাত রেখে ভগ্নকণ্ঠে বললে—"অত কেঁদ না অনি, আমার বড় কষ্ট হয়। বলেছি ত রাস্কেলটাকে ধরে এনে দিচ্ছি।"

হঠাৎ অনিপিসি জলভরা চোখ তুলে বললেন—

"ফুল। ইডিয়ট্। ওর জন্য কে কাঁদছে? তুমি কাল চলে গেলে আর তোমাকে দেখতে পাব না তাই কাঁদছি।"

তখন রবিন,—থাক সে কথা বলে আর কি হবে? তবে ঠিক সেই মুহূর্তে অপ্রত্যাশিতভাবে ফিরে এসে নলিনীমাসি তো সক্‌ড্। উপসংহারে রবিনের পিসিকে লেখা নলিনীমাসির চিঠির এক অংশ উদ্ধৃত করে দিই।

"ভাই বেণু, শুনে সুখী হবে যে শেষ পর্যন্ত রবিনকে বিবাহ করতে অনিলাকে রাজী করাতে পেরেছি। সে অনেক কথা। তোমাকে তো বহুবার বলেছি যারা প্রেমকে পরিহার করে চলে প্রেম তাদের খেলার পুতুল! তোমরা ছড়ো দিয়ে যে বিবাহ ঘটাতে পারনি, দেখ আমি কেমন বাধা দিয়ে সেটি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করে দিলাম। তবে এর জন্য রবিন, ওরফে দীপেনের সম্বন্ধে দিবারাত্র অজস্র নিন্দামান্দা না করলে শেষ রক্ষা হত কিনা সন্দেহ! চক্রবর্তী সাহেবকে বল এবার তাঁর প্রতিশ্রুতি মতো আমাদের গার্ডেন ক্লাবে মোটা চাঁদা দিতে হবে। ইতি।"

দৈবযোগ

সমালোচকদের মতে যে সকল নাটকের পরিণাম দৈবাতের যুক্তিশূন্য খেলার ওপর নির্ভর করে, তাদের ততখানি উৎকৃষ্ট বলে গণনা করা যায় না। শ্রেষ্ঠ নাটকের অন্তিম পরিণাম হবে অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী, আর কাহিনীর ঘটনা পারম্পর্য একাদিক্রমে, যুক্তিসঙ্গত ও অব্যর্থভাবে ঐ পরিণামে গিয়ে উপস্থিত হবে, অর্থাৎ কি না ভালো নাটকে দৈবাতের বা এক্সিডেণ্টের স্থান থাকা উচিত নয়। সৌভাগ্যক্রমে সত্যকার জীবনে সেরকম কোনো অমোঘ নিয়মের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। বরং হামেসাই দেখা যায় যে, ছোট একটি ভুল বা অসাবধানতা, বা নিছক এক্সিডেন্টের ওপর বিরাট বিরাট ব্যাপার নির্ভর করে থাকে, এমন কি বহু মানুষের গোটা জীবনটার ধারাই বদলিয়ে যায়।

নজির দিয়ে প্রমাণ করে দিতে না পাবলে আমি অনর্থক এতগুলো কথার অবতারণা করতাম না। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমার পটলকাকার প্রেমের কাহিনীকে নেওয়া যেতে পারে।

পটলকাকার গুণাবলী দর্শনমাত্র চোখে পড়বার মত ছিল না। মাথায় বেশি লম্বাও নন আবার বেঁটেও নন। গায়ের রং বেজায় কালোও নয়, আবার খুব ফর্সাও নয়। বুদ্ধিশুদ্ধিও মাঝামাঝি গোছের, হাবভাব কিঞ্চিৎ লাজুক গোছের। এক কথায় পটলকাকা বাইরে থেকে একজন সাধারণ মাঝামাঝি গোছের মানুষের মতো। বিয়ে পাশ করে বাপের খাতিরে বিলিতী কোম্পানিতে চাকরি পেয়ে, নির্ঝঞ্ঝাটভাবে কর্তব্য পালন করে যাচ্ছিলেন।

এমন সময় তাঁর হৃদয় রাজ্যে বসন্তকাল এসে জানান দিল। রাতারাতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল, এবং আটপৌরে সংসারটা অপরূপ ও অপূর্বের সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। দুঃখের বিষয় বাইরে থেকে এ সকলের কোনো প্রমাণই পাওয়া গেল না, এমন যে একটি বিপর্যয় ঘটে গেছে এ কথা কারো সন্দেহও হল না।

সব চেয়ে মর্মান্তিক কথা হল যে পটলকাকার হৃদয়ের অধীশ্বরী, পাশের বাড়ির মলি, এ বিষয় কিছুই জানতে পারল না। অথচ তাঁদের পরিচয় কিছু নতুন নয়, বারো বছর বয়স থেকে পটলকাকা সাত বছরের মলিকে বকে, ধমকে, চুল টেনে, প্রয়োজন হলে ক্রিকেট ব্যাট্ দিয়ে ঠেঙ্গিয়ে, তবে না এতটা বড় হয়েছিলেন। কিন্তু সে মলি আর নেই। সে এখন ইয়ং লেডিদের দলে গিয়ে ভিড়েছে। কাঁধের ওপর সোনার সেপ্‌টিপিন দিয়ে বোম্বাই সাড়ি পরে;

মাথায় অতি আধুনিকাদের মত সিফনের ল্যাজওয়ালা মখমলের টুপি দেয়; টুংটাং করে স্পিনেট্ বাজিয়ে গান করে; আর পটল বলে যে পাশের বাড়ির ছেলেটির কাছে চার বছর আগে ও অঙ্ক বোঝাতে গিয়ে, তাড়া খেয়ে, কেঁদে কেটে, খাতা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাড়ি চলে আসত, তার দিকে ভুলেও একবার তাকিয়ে দেখে না।

যখন তখন দেখা যায় উঁচু খুরের জুতো পরা একদল সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে ব্যালকনির ঘরে বসে হি হি করে হাসছে। নয়তো তাদের সঙ্গে জুটে কোমরে ঝালর দেওয়া মেম প্যাটার্ণের পিনাফোর পরে ষ্টোভের উপর সস্‌প্যান্ চাপিয়ে, কি সব রাঁধছে। পটলকাকার ছোট ভাই পদুকাকা অত কায়দা কানুনের ধার ধারে না, একদিন ধুতি পাঞ্জাবী গায়ে দিয়েই মলিদের রান্নাস্থলে গিয়ে হাজির হয়ে, সেই সব খেয়ে এসে খুব তারিফ করল। ইয়ং লেডিরা নাকি তাকে দেখে জাপানী পাখার পিছন থেকে গোল গোল চোখ করে তাকিয়ে রইল, খালি মলি তাকে খাইয়ে দাইয়ে বিদায় দেবার সময় পাখা দিয়ে মাথায় একটা ঠোনা মেরে দিল। এই অবধি শুনে পটলকাকা রেগে বললেন,

"গায়ে পড়ে আলাপ জমাতে যাস! তোর লজ্জা করে না?"

পদু ত অবাক্। বাঃ রে মলিই তো যখন তখন তাকে দিয়ে এটা ওটা আনিয়ে নেয়, কি এমন দোষ হল?

মানুষের যখন ভাগ্য বিপর্যয় হয়, তখন একটু আধটুতে সামলায় না, একেবারে চারিদিক আচ্ছন্ন করে আসে। তাই এই সময়ে মলির একজন সব দিক দিয়ে উপযুক্ত অ্যাড্‌মায়রার জুটে গেল। তাঁকে দেখে শুধু মলির কেন, পটলকাকার শুদ্ধ তাক লেগে গেল। এই বড় বড় দুটো কালো ঘোড়াওয়ালা ল্যাণ্ডো চেপে আসেন, লম্বা চৌড়া ধবধবে ফর্সা মানুষটা আর নাকের নিচে ইয়া পাকানো চকচকে কালো গোঁফজোড়া একেবারে জুলপীর সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। কেষ্টনগরের ওদিককার প্রগতিশীল জমিদার, দারুণ লেখাপড়া জানেন, ওদের বাড়িতে সাহিত্য সভা হয়, কতসব নামকরা লোক ঢোকরা যান, অনেকদিন আগে বঙ্কিম বাবু পর্যন্ত সেখানে রাত কাটিয়ে এসে নাকি বলেছিলেন

"পৃথিবীতে যদি কোথাও স্বর্গ থাকে তো সে ঐখানে।"

কড়ে আঙ্গুলের মস্ত হীরের আংটি নেড়ে নেড়ে কত রকমের গল্প করেন ভুজঙ্গধর, পটলকাকারা হাঁ করে শোনেন। বয়সটা একটু বেশি, বহুদিন বিলেতে টিলেতে ঘুরেছেন কি না; তাই বলে আর কিছু বুড়ো হন নি, এই বছর পঁয়ত্রিশ হবে। এমন একজন পাণিপ্রার্থী পেয়ে মলি যে পটলকাকার দিকে ফিরে তাকাবে না, এ আর আশ্চর্য কি। তাছাড়া এমন সব প্রতিদ্বন্দ্বীদের সামনে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাবার কথা পটলকাকার মনে আসে না। খালি বুকের ভিতর জ্বালা করতে থাকে।

অথচ দুই বাড়িতে যথেষ্ট যাওয়া আসা ; পদু তো রোজ বিকেলটা ও বাড়িতেই কাটিয়ে আসে। এদানিং ভুজঙ্গধরের গল্প শুনবার আগ্রহে পটলকাকাও মাঝে মাঝে যাতায়াত করা আরম্ভ করেছেন। তাই নিয়ে মলির মা মিনিপিসি মৃদু পরিহাসও করেছেন—"কি গো পটল, তবু ভুজঙ্গধর এসেছিল বলে এ বাড়িতে তোমার পায়ের ধূলো পড়ল। কতদিন আসনি তার প্রমাণ দেখ, মলিকে গত বছর জন্মদিনে যে কুকুরবাচ্চা দিয়েছিলে সে কত বড়টি হয়ে গেছে।"

মলি তাই শুনে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললে—

"ওর আজকাল পুরোন বন্ধুবান্ধব আর পছন্দ হয় না, তবু ভাগ্যিস্ ভুজঙ্গধর এসেছিল।"

বলে খুব হাসে, আর পটলের সঙ্গে একটিও কথা বলে না। পটলের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

মাসিমা বললেন

"কুকুর বাচ্চাটা কিন্তু ভারি দুষ্টু, কত লোককে যে কামড়েছে,তার ঠিকানা নেই। কেউ নিচু হলেই হল, ব্যস্, অমনি ফিলো গিয়ে যেখানে নাগাল পাবে দাঁত বসাবে।"

পটলকাকা লজ্জিত হয়ে বললেন "ওদের ভালো করে ট্রেণিং না দিলে ঐ রকমই করে।"

কথাটাব মধ্যে যে ঠেস ছিল, মলি সেটা বুঝল।

"বেশ তো', তুমি নিয়ে গিয়ে ট্রেণিং দিলেই পার।"

অমনি পটল কাকা রাগ করে কুকুর বাচ্চা বগলে নিয়ে বাড়ি চলে গেলেন।

দাদার মূঢ়তা দেখে পদুর আর ধৈর্য থাকে না।

"অমন করলে কোনো জন্মে মলি তোমাকে বিয়ে করবে না। আরে তুমি যে ওর পাণিপ্রার্থী, তার প্রমাণই খুঁজে পাওয়া যায় না। খালি ঝগড়া কর। অবিশ্যি এরকম বদমেজাজী লোকদের বিয়ে হওয়াই উচিত নয়, কাজেই ভালোই হল। মলি ভুজঙ্গর ল্যাণ্ডো চড়ে কেমন জলঙ্গী নদীর ধারে হাওয়া খেতে যাবে, ফুরফুরে বাতাসে টুপির ন্যাজ উড়বে, তখন সে কত সুখীই না হবে। তোমার মতো একটা ষ্টুপিডের কথা তার মনেও থাকবে না তখন। মিনিমাসিরা কত খুসিই যে হবেন, সোনা দিয়ে বাঁধানো সব চিরুণী বুরুশ তৈরী কবাবেন, তার উপর খোদাই করে ইংরিজিতে লেখা থাকবে—"ভূ-চৌ।"

এতকথা শুনেও পটলকাকা বই থেকে চোখ তোলেন না। পদুকাকা আরো কাছে এসে বিরক্ত হয়ে বলেন—

"কি রকম পুরুষমানুষ তুমি, একটু ঈর্ষা টির্ষাও হয় না? এমনি এমনি ভুজঙ্গর হাতে ছেড়ে দেবে? একটু লড়বেও না? ফুল্।"

এতক্ষণে পটলকাকা চোখ তুলে বললেন,

"তোর এত মাথাব্যথা কিসের রে? তুই নিজেই না বললি ভুজঙ্গধরই হলেন মলির উপযুক্ত, তাঁকে বিয়ে করলে সে সুখী হবে। যা, এখন পালা দিকি নি।"

এমনি করে পটলকাকার বিয়ের আশা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে লাগল। পটলকাকা আপিস যান, মাইনে বৃদ্ধি হয়, সুনাম কেনেন, অন্য জায়গা থেকে বিয়ের সম্বন্ধ আসে, পটলকাকা সাড়া দেন না। অপর কাজের মধ্যে মলির কুকুর বাচ্চা ফিলোকে ট্রেণিং দেওয়া, তা সে হতভাগা কুকুর কিছুতেই কিছু শিখবে না। সাতদিন না যেতে, এ বাড়ির সকলকে অতিষ্ঠ করে তুলল, আঁচড়ে কামড়ে, কৌচের ঝালর খেয়ে, পর্দার তলা ছিঁড়ে, রাতে চেঁচিয়ে, কারো জীবনে আর বিন্দুমাত্র শান্তি রাখল না।

এতদিন পটলকাকার মা ছেলের মনেব ব্যথার কথা বুঝে মুখ বুঁজে সব সহ্য করেছেন কিন্তু অবশেষে যেদিন লাই পেয়ে কুকুব বাচ্চা তাঁর বাপের বাড়ির বৃদ্ধ সরকার মশাইএর গোড়ালি কামড়ে ধরে ঝুলে রইল, সেদিন তার ঝুঁটি ধরে ঝুলিয়ে এনে পটলকাকাকে বললেন—

"এখুনি যদি একে মলির কাছে দিয়ে না আসিস তো আমি কাশীবাসী হলাম, তা তোর বাবার যতই না কষ্ট হক।"

পদু হাঁ হাঁ করে ছুটে এস বলল—

"আঃ মা, তুমি এখন সব পণ্ড করে দিও না। সরকার মশাইয়েব ঠিক ঐ সময় নিচু হয়ে জুতোর ফিতে বাঁধবার কি এমন দরকারটা ছিল বলতো? আর ঐ অতটুকু কুকুর, একটু কামড়েছে তো আর এমন কি হয়েছে?"

সরকার মশাই রুমাল দিয়ে ক্ষত স্থান বাঁধতে বাঁধতে বললেন—

"আপনার মা-ই আমাকে পাঠিয়ে দেন, নইলে আমি এ বাড়ির চৌকাঠ মাড়াতাম না, যা সব ছেলেপিলে।"

তাই শুনে মা চোখে আঁচল দেন আর পটলকাকা নিরুপায় হয়ে কুকুর বাচ্চাকে ঝুঁটি ধরে ঝুলিয়ে মলিদের বাগানে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেন।

ঠিক সেই সময়, কাঠচাঁপা গাছের তলায় ভুজঙ্গধর ঘাসের উপর রুমাল পেতে, তার উপর এক হাঁটু গেড়ে বসে, মলির চরণপ্রান্তে বিবাহের প্রস্তাব নিবেদন করছেন। ছাড়া পেয়েই কুকুর বাচ্চা এক দৌড়ে তাঁর বিশাল দেহের একটা প্রশস্ত স্থল বেছে নিয়ে দাঁত বসিয়ে দিয়েছে।

"আহা, ছাড়, ছাড়, উঃ, মরে গেলাম। ঈশ্, পেণ্টেলুনটা একেবারে ছিঁড়ে দিয়েছে রে।"

উদগ্র ক্রোধে ভুজঙ্গধর ফিলোকে এক প্রচণ্ড পদাঘাত করলেন। ফিলো উড়ে গিয়ে স্তম্ভিত পটলকাকার বাহুর মধ্যে গিয়ে পড়ল।

মলির দুই চোখ দিয়ে বিদ্যুৎ বর্ষণ হতে লাগল, গেটের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললে—

"যান, আর প্রেমের কথা মুখে আনবেন না। নির্দোষ কুকুর বাচ্চাকে যে অকারণে অমন নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করে, তাকে"

—কণ্ঠরোধ হয়, একবার মরীয়া হয়ে রুমাল খোঁজে, না পেয়ে দুই হাতে চোখ ঢেকে হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকে। অবশেষে পটলকাকা তাকে সান্ত্বনা দেন।

ভুজঙ্গধর একবারমাত্র বলেন—

"মারাটা হয়তো উচিত হয় নি, কিন্তু কি করি বল, কামড়ে দিল যে। অকারণে মারব কেন?"

মলি হাত নামিয়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললে—

"জানেন তো নিচু হলেই ও কামড়ে দেয়। ঐ ওর স্বভাব, ও কি করবে? আপনি যান।"

অনেক দিন পরে, দুই বাড়িব আনন্দিত বাসিন্দাদের অভিনন্দনের পর্ব শেষ হলে, সলজ্জ হেসে মলি পটলকাকাকে বললে—

"কেন এতদিন কিছু বল নি? আমি তো প্রায় আশাই ছেড়ে দিয়ে আরেকটু হলেই ভুজঙ্গধরকে বিয়ে করে ফেলছিলাম। তবু যে শেষ মুহূর্তে কুকুর বাচ্চা লেলিয়ে দিলে, সেই রক্ষে। পদু তো বলেছিল যে হাজার চেষ্টা করলেও তোমাকে দিয়ে বিয়ের প্রস্তাব করানো যাবে না।"

পটলকাকার এতক্ষণে চৈতন্য হল,

"ওমা, তাইতো, তা হলে এই বেলা বিয়ের প্রস্তাবটি চুকিয়ে ফেলা যাক।"

—যাক, আর কথায় কথা বাড়িয়ে কি লাভ? এইটুকুতেই যথেষ্ট প্রমাণিত হল যে সত্যিকাবের জগতে অধিকাংশ সময়েই ছোট ছোট এক্সিডেণ্টের উপর বিরাট বিরাট সঙ্কল্প নির্ভর করে থাকে।

প্রেমের বনেদ

প্রেমের পথ সর্বদা পিচ্ছিল হওয়া সত্ত্বেও এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে বর্ষার বারিপাতের মতো প্রেমও যোগ্য এবং অযোগ্যের উপর সমানভাবে বর্ষিত হতে থাকে। তার প্রমাণ দার্জিলিং-এ আমাদের পৈতৃক হোটেলখানি। পাছে পাঠকবর্গ সন্দেহ করেন যে এর মধ্যে কোনোরূপ স্বার্থের উদ্দেশ্য জড়িত আছে, সেই জন্য তার নাম গোপন করলাম। গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে আপনারা অনেকেই হয়তো সেই হোটেলে দুচার দিন বাস করে পৃথিবীর মাটিতে থেকেও স্বর্গের একটা মোটামুটি ধারণা নিয়ে ফিরে এসেছেন। যাই হোক, ঐ হোটেল-খানি প্রেমের ওপর প্রতিষ্ঠিত। শঙ্কিত হবেন না, প্রকৃত প্রেমের বনেদ ইট-কাঠের চেয়ে কোনো অংশেই কম মজবুৎ নয়।

আমার বাবার রামকৃষ্ণকাকার বয়স যখন সবে ত্রিশ পেরিয়েছে, সহসা এক দূর সম্পর্কীয় মাতুল মৃত্যুকালে তাঁর নামে এমনি এমনি দুতিন লাখ টাকা লিখে দিয়ে গেলেন। নিন্দুকরা মরণোন্মুখ বৃদ্ধের উচ্চারণ-অশুদ্ধিকে উপলক্ষ্য করে নানান্ কথা বলতে লাগল বটে, কিন্তু রামকৃষ্ণকাকা আশৈশব অভাব-অনটনের মধ্যে মানুষ হওয়ার পর ভাগ্যদেবীর এই অযাচিত দাক্ষিণ্যে কৃতজ্ঞ-চিত্ত হয়ে উঠলেন।

বিবাহ করা দূরে থাকুক, অর্থাভাবে চিরকাল তিনি নারীসঙ্গ পর্যন্ত পরিহার করে কেবলমাত্র বিদ্যার্জ সাধনা করে এসেছেন। মেট্রোপলিটান কলেজে সামান্য শিক্ষকতা করেন, কোনো অষ্টাদশী সুন্দরী কালো বঙ্কিম নয়নে তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করে নি। কিন্তু নবলব্ধ সম্পত্তি উকীলদের কাছ থেকে বুঝে নেবার জন্য, মামার শেষ বয়সের আস্তানা দার্জিলিং শহরে পদার্পণ করেই রামকৃষ্ণকাকার মনে হল প্রজাপতির কুঞ্জবনে বুঝি বা এসে উপনীত হয়েছেন।

সামান্য কথা দিয়ে সেকালের দার্জিলিং-এর বর্ণনা করা যায়না। সারাটা ভারতবর্ষের সুসজ্জিত সৌন্দর্য আর অশ্বারোহী ঐশ্বর্য দার্জিলিং-এর পথে-ঘাটে ভিড় করে থাকত। তার মধ্যে রেডিমেড স্যুট পরিহিত রামকৃষ্ণকাকার অবস্থাখানি ভাবা যায় না। মৌমাছির মধুর গুঞ্জনের মতো তাঁর সৌভাগ্যের খ্যাতি সুন্দরীকুলের কানে কানে ছড়িয়ে পড়েছিল। কন্যাদের মাদের সনির্বন্ধ নিমন্ত্রণ আর কন্যাদের চটুল দৃষ্টিবাণ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য রামকৃষ্ণকাকা জলাপাহাড়ের পিছন দিকে অবস্থিত মামার ছোট

বাড়িখানির দরজা জানলা শক্ত করে এঁটে নিয়ে তার মধ্যে আশ্রয় নিলেন। মামার চাকর বুড়ো কাঙ্গাই তাঁর হাটবাজার আর দুবেলা রাঁধাবাড়া করে দিত।

মৎলবী ও কপট বন্ধুদের বিষয় বুড়ো উকীলবাবু বারংবার রামকৃষ্ণকাকাকে সতর্ক করে দিলেন। বললেন,

"নগদ কতগুলো টাকা ফেলে রেখো না, বারো ভূতে লুটে খাবে। বরং বড় রাস্তার ওপর ঐ যে হোটেলখানি বিক্রী আছে ঐটি কিনে ফেল—একেবারে সোনার খনি। বুকের আর পেটের মাপেব তো কোনো তাবতম্য দেখি না, এই বয়সেই হয় তো বা ডিস্পেপ্সিযাতেও ধরেছে, কলকাতার চাকবিটি ছাড়, এখানে হোটেলটি কিনে বসবাস কব, স্বাস্থ্যও ফিরে যাবে, অবস্থাও ফিরে যাবে।"

বন্ধ ঘরে অবস্থানকালে এই সকল কথা রামকৃষ্ণকাকার মনে হয় এবং মাঝে মাঝে পিযানোর টুং-টাং সহ বিলিতী গানের হুয়া হুয়া শব্দও কানে আসে। প্রথমটা ওগুলিকে নতুন অবস্থাব কাল্পনিক আনুষঙ্গিক বলে সন্দেহ করে-ছিলেন। পরে কাঙ্গাব কাছে শুনলেন যে পাশেব বাড়ির বাসিন্দা, হোটেলের কর্মচারী মিষ্টার সিরকাব আর তাঁব একমাত্র কন্যা মিমি গান অভ্যাস করছেন।

একদিন দেখাও হয়ে গেল। সূর্য অস্ত যাচ্ছে, তার শেষ রশ্মিগুলো লম্বা লম্বা হযে মাটিতে শুযে পড়েছে, ঘরে আব মন টেকে না, অতি সন্তর্পণে বামকৃষ্ণকাকা খিড়কিব ছোট গেটখানি খুলে সরু পথে পা দিয়েছেন, এমনি সময় মিষ্টাব সিরকাবের সঙ্গে একেবাবে সামনা-সামনি সাক্ষাৎ।

সাহেব মনে করে তখুনি পালিযে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মিষ্টার সিবকার মুখের পাইপখানি নামিয়ে ডেকে বললেন—

"চলে যাবেন না স্যার, আমরাও আপনাবি মতো পৃথিবীব কোলাহল থেকে ভীরু পলাতক।"

মুখ তুলতেন মিমির সঙ্গে চারি চক্ষুব মিলন হয়ে গেল। আর রামকৃষ্ণকাকার মনে হল সান্ধ্য গগনকে আমোদিত করে স্তবকে স্তবকে বুঝি সব রং-বেরং-এর বিলিতী ফুল ফুটে উঠেছে।

মিমি যে কেমনধারা দেখতে ছিল সে আমার পক্ষে বলা অসম্ভব। শুনেছি ভায়োলেট ফুলটির মত দিনান্তেব শেষ আলোতে মুখখানি তুলে ধরে বিস্ফারিত লোচনে রামকৃষ্ণকাকার দিকে চেয়ে ছিল। পরনে ছিল সরু সাদা লেসের পাড় বসানো ফিকে নীল ফরাসী সিল্কের শাড়ি, ছোট সাদা শঙ্খের মতো গলাটিতে ছিল সরু একটি সোনার চেন, তার মাঝখানে হৃদয়ের আকারের একটি লকেট্, তার মধ্যে মিমির স্বর্গীয়া মার বারো বছর বয়সের আলোকচিত্র, একদিন কম্পিত হস্তে মিমি সেটিকে খুলে দেখিয়েছিল। ক্ষীণ কটিদেশে

ফিকে হাতীর দাঁতের রংএর একখানি কোমল হাত আলতোভাবে রেখে, এমনি আলগোছে দাঁড়িয়েছিল যে রামকৃষ্ণকাকার আশঙ্কা হচ্ছিল এখনি এক দমকা পাহাড়ে বাতাসে বুঝি বা সে উড়ে গিয়ে রামকৃষ্ণকাকার তৃষিত নেত্রকে চিরকালের মত অন্ধকার করে দেবে।

সেই এক নিমেষে রামকৃষ্ণকাকার সর্বনাশ হয়ে গেল, তাঁর বিবেক বিবেচনা সুবুদ্ধি সতর্কতা সব গেল। মন্ত্রমুগ্ধের মত মিষ্টার সিরকারের আহ্বানে তাঁদের ঈষৎ ঝুরঝুরে বাড়ির বারান্দাতে গিয়ে উঠলেন। গরম চা এল, তাস জোড়া এল, মিষ্টার সিরকার কত যে মজলিসি গল্প ফাঁদলেন তার আর ইয়ত্তা নেই। আর, গল্পের ফাঁকে ফাঁকে কত যে নতুন বিলিতী তাসের খেলা শিখিয়ে দিতে দিতে, দিনের পর দিন একটু একটু করে কত সহস্র টাকা যে রামকৃষ্ণকাকার কাছ থেকে জিতে নিলেন, তারো হিসাব নেই।

মাঝে মাঝে যদি বা রামকৃষ্ণকাকা বিহ্বল দৃষ্টি ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করেছেন, অমনি দৃষ্টিপথে মিমি এসে কখনো বা ঝিনুকের ভিতরকার রঙের গোলাপি বেশে, কখনো বা বর্ষার আকাশে পুঞ্জিভূত ঘন মেঘের মত ঘোর নীল বেশে, কখনো বা সমুদ্রের বক্ষ-দেশের ঈষৎ নীলাভ সবুজ বেশে, আবির্ভূতা হয়েছে।

এমনি ভাবে দিনের পর দিন কেটেছে, উকীলবাবু হতাশ হয়ে কাছারিতে ফিরে গেছেন। সুন্দরী কন্যারা ও তাদের চতুরা মারা অন্যত্র দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছেন। রামকৃষ্ণকাকার কোনো খেয়াল নেই।

মাঝে মাঝে মিমির সঙ্গে সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়েছেন, জহুরীর দোকানের সামনে যদি বা মিমি অপাঙ্গে কোনো মণি-মুক্তোর দিকে তাকিয়েছে, তখনি সেটি কিনে দিয়েছেন আর দিবারাত্র অবাক হয়ে ভেবেছেন তাঁর মতো রূপগুণ-শূন্যকে মিমির কেন ভালো লাগল।

এমনি করে একদা ব্যাঙ্কের তহবিল মরুভূমির মত শূন্য হয়ে গেল। তখন মিষ্টার সিরকারের বারান্দায় বসে শেষ একবার তাস খেলে, শেষ সম্বল সোনার চেন ও ঘড়িখানি মিষ্টার সিরকারের হাতে তুলে দিলেন। তারপর মিষ্টার সিরকার বক্র হেসে তাঁকে বিদায় করে দিলেন, বললেন, রূপগুণহীন কপর্দকশূন্য মাষ্টার মশাইয়ের আর মিমির আশে পাশে গুন্‌গুন্ করা শোভা পায় না। এবং শুনে বোধ করি সকলে খুশি হবেন, জঙ্গীপুরের রাজা বাহাদুরের সঙ্গে মিমির বিবাহ এতকাল যে উপযুক্ত যৌতুকের অভাবে স্থগিত ছিল, এবার তা সম্পন্ন হবে।

হেনকালে ঝড়ের মত মিমি এসে প্রবেশ করল, বাপের সম্মুখেই থুতনি ধরে রামকৃষ্ণকাকার নতমস্তককে উঁচু করে দিল। তারপর দৃঢ়মুষ্টিতে স্বীয় দক্ষিণ করে তাঁর বাম কর ধারণ করে কোকিলকণ্ঠে বলল,

"এসো বাবাকে দুজনে প্রণাম করি। আজ বাবার বড় সৌভাগ্য যে, বড়

হোটেলের নতুন মালিক কেবল তাঁর মুনিব নন, ভাবী জামাতাও বটেন। ও কি! মুখ বন্ধ কর। এই নাও ধর, তোমার টাকা দিয়ে কেন। তোমার হোটেলের দলিলপত্র, উকীলবাবু সব ঠিক করে দিয়েছেন তোমার নামে। বাবা, মুখ বন্ধ কর, বোয়ালমাছের মত লাগছে যে।''

এমনি করে পঞ্চাশ বছরের বেশি হয়ে গেল, আমাদের দার্জিলিংএর পৈতৃক হোটেল তৈরী হল প্রকৃত প্রেমের বনেদের উপর।

স্ত্রী স্বাধীনতা

সেকালের শিক্ষিতা ও স্বাধীনতাপ্রিয়া মহিলাদের প্রেমের ব্যাপারগুলো কত যে জটিল ছিল, আজকালকার সুবিধাবাদী প্রেমের দিনে সে কথা কেউ বড় একটা ভেবেও দেখে না। তাছাড়া আজকাল আধুনিকাদের নিজেদের সপ্রকাশ স্বাধীনতা প্রমাণ করবার জন্য কোনো চেষ্টাই করতে হয় না, বরং ঐ স্বাধীনতাটা একটু কমলেই বাঁচা যায়।

পঞ্চাশ বছর আগে পরিস্থিতিটা অন্য রকমের ছিল। সারা বাংলা দেশে যে কজনা শিক্ষিতা ও স্বাধীনতাপ্রাপ্তা মহিলা ছিলেন, নিজেদের শিক্ষিতা ও স্বাধীনতাপ্রাপ্তা হওয়ার মর্যাদা রক্ষা করতেই তাঁদের ভীষণ ক্লেশ স্বীকার করতে হত। কারণ কে না জানে যে স্বাধীনতাপ্রাপ্তা মেয়েদের পিঞ্জরে বদ্ধ করতে পারলে হিংসাপরায়ণ পুরুষ মানুষরা যেরূপ আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, আর কোনো কিছুতেই তেমন করেন না। কেবল মাত্র যাঁরা বাঘ-সিংহীকে পোষ মানান তাঁদের মনের ভাবের সঙ্গে এর তুলনা করা যেতে পারে। একটা গল্প বলি।

আমার মায়ের অতুল পিসেমশাইকে যেই দেখত তারি জীবনের উপর দারুণ ঘৃণা জন্মিয়ে যেত। সে রকম মানুষ আজকাল সচরাচর দেখা যায় না। ছ ফুটের উপরে লম্বা, নৌকার পাটাতনের মত বুকের ছাতিখানি, আজানুলম্বিত দুই বাহু, তাই নিয়ে যা একবার ধরতেন তা কখনো ছাড়তেন না, আকর্ণ বিস্তৃত চোখ, হাতীর দাঁতে যেন খোদাই করা কানদুটি মাথার দুপাশে পেতে পড়ে থাকত, বাঁশির মত নাক, ধনুকের মত ভুরু কপালের মাঝখানে এসে মিশে যেত, খোদাই করা অধরোষ্ঠ কখনো বা ফুলের মত কোমল, কখনো বা বজ্রের মত কঠিন, বেগুনী আঙ্গুরের গুচ্ছের মত কালো কোঁকড়া চুল। বলেছি না অমনধারা বড় একটা চোখে পড়ে না।

মেলা টাকা পয়সাও ছিল। বলা বাহুল্য সে সকলই অসৎভাবে সঞ্চয় করা অর্থাৎ ঘোড় দৌড়ের মাঠে, রেস্ খেলে, জুয়ো খেলে, ঘোড়া দৌড়িয়ে। শুনলে সজ্জননাত্রেরই শিহরণ হত, কিন্তু দেখলে ঐ যে বললাম সৎজীবনে দারুন ঘৃণা জন্মে যেত।

যারা নিজেদের জীবনটাকে সব দিক দিয়ে সাফল্যমণ্ডিত করতে চায়, সহজে কারো সঙ্গে প্রেমে আবদ্ধ হওয়া তাদের পোষায় না। সেইজন্য অতুলপিসেমশাইও যথাসম্ভব প্রেমকে পরিহার করেই চলতেন। একটা

সুবিধাও ছিল, কারণ সে সময়কার বেশীর ভাগ সুন্দরীরা এখনকার মত অতটা সচল ছিলেন না, এবং অন্তরাল থেকে অতুলপিসেমশাইকে যতই নয়নবাণে বিদ্ধ করতে চেষ্টা করুন না কেন, সে সকল বিষময় অস্ত্রই হাঁসের গায়ে জলের মত পিছলে পড়ে যেত। আর তখনকার আধুনিকারা যে সমাজে আনাগোনা করতেন সে সমাজে অতুলপিসেমশায়ের আদৌ যাতায়াত ছিল না। এইসব কারণে নিজেকে অপরাজেয় জ্ঞান করে তিনি শেষ পর্যন্ত একটু অসতর্কও হয়ে পড়েছিলেন এবং বন্ধু মহলে যেখানে সেখানে তাই নিয়ে গর্ব করতেও ছাড়তেন না।

কিন্তু কে না জানে যে মানুষের সতর্কতায় সূচের পরিমাণ ছিদ্র থাকলেও তার মধ্যে দিয়ে সর্প প্রবেশ করা অসম্ভব নয়। দিনে দিনে অতুলপিসেমশাই বোধ হয় গুণ পরানো ধনুকের পর্যায় থেকে তিলে তিলে স্খলিত হচ্ছিলেন।

সেকালে দোলের সময় পথেঘাটে সে যে কি কাণ্ড হত সে কথা এখন কল্পনা করা যায় না এবং বলা বাহুল্য কোনো ভদ্রমহিলা কোনো কারণেও সে সময় লোকচক্ষু গোচর হতেন না, সে তিনি যতই আধুনিকা হন না কেন। কিন্তু সে বছর পাশের বাড়ির সদর দরজার সামনে প্রাতঃকালে একটি অফিস যান গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছিল এবং তার রুদ্ধ দুয়ার ঈষৎ উন্মুক্ত করে একজন তরুণী অবতরণ করেছিলেন। হয়তো ইচ্ছা করে নয়, অসাবধানতা বশতঃই অতুল পিসেমশাইএর তরুণ সঙ্গীদের একজনের হাতের পিচকারি থেকে একটুখানি রং আচমকা তার সুসংবদ্ধ কালো জুতো জোড়াব প্রান্তদেশে একটুখানি স্পর্শ করে থাকবে। তরুণী বাণবিদ্ধা ব্যাঘ্রিনীর মত ফিরে দাঁড়িয়ে বিশুদ্ধ ইংরিজিতে অতুলপিসেমশাই এবং তাঁর সঙ্গীদের উর্দ্ধতন চতুর্দশ পুরুষের উদ্ধার সাধন করে দিলেন। সেকালে এমন অভাবনীয় ঘটনা কেউ দেখেনি।

তরুণীর এরূপ অশোভন আচরণের ভূরি ভূরি নিন্দা করতে করতে সঙ্গীরা প্রস্থান করার বহুক্ষণ পরেও অতুলপিসেমশাই চিত্রার্পিতের মতো সেখানে দণ্ডায়মান ছিলেন, কারণ তাঁর বাহুদ্বয় কম্পিত হচ্ছিল, চোখে সরষে ফুল দেখছিলেন এবং পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছিল।

ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরে গিয়ে প্রথমটা কড়া একডোজ সর্বরোগের ধন্বন্তরী স্যাল ভলাটাইল টেনে নিলেন। পরে বুঝলেন ওটা কোনো রোগের জন্য নয়, আচমকা প্রেমে পড়ার লক্ষণ।

ঐ কন্যার নাম চারুশীলা, বেথুন কলেজ থেকে সদ্য বি-এ পাশ করেছেন এবং একটা অতি সতর্ক সেকালের ব্রাহ্ম আবহাওয়াতে মানুষ হওয়াতে অপরিচিত পুরুষ মানুষকেই সন্দেহের চোখে নিরীক্ষণ করেন, বিশেষ করে সে যদি রূপবান হয়। আর পথে ঘাটে হৈ হুল্লোড়কারী, মহিলাদের সম্মান রক্ষা করতে অপারগ পুরুষ মানুষের কথা তো ছেড়েই দেওয়া যাক। উপরন্তু চারুশীলা জুয়ো খেলা,

রেসে যাওয়া, থিয়েটার দেখা, টেরী কাটা ও ধূমপান করাকে চরিত্র স্খলনের প্রথম সোপান বলে মনে করে এসেছেন। এ হেন পরিস্থিতিতে অতুল পিসেমশাই নিজের ভবিষ্যৎকে অন্ধকার দেখতে লাগলেন।

কিন্তু তাঁর পুরুষ সিংহ তাঁকে সহজে পরাভূত হতে দিত না। চারুশীলার অভিভাবকদের হৃদয় জয় করা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার ছিল না।

চারুশীলার পিতা তত্ত্বকৌমুদীতে জ্ঞানগর্ভ এবং অতিশয় দুর্বোধ্য সব প্রবন্ধ লিখতেন মহিলা শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা এই সব বিষয়ে। অতুলপিসেমশাই তারি দুই এক সংখ্যা সংগ্রহ করে, পাঠ করে, সবটা না বুঝলেও, সান্ধ্য বিহার থেকে ফিরবার সময় সে সকলের বিষয় উল্লেখ করে তাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করবামাত্র, তিনি তাঁকে একেবারে হৃদয়ে গ্রহণ করে ফেললেন।

কিন্তু অতুলপিসেমশায়ের জুড়িগাড়ি আর হীরের বোতাম দেখেও চারুশীলার চোখ ঝলসে গেল না। সহসা বদান্যতার বশ হয়ে মেদিনীপুরে বন্যার সময় তাঁর অকাতর দানের কথা শুনেও তাঁর চিত্ত বিমুগ্ধ হল না। আর যে রূপ দেখে স্বয়ং কার্তিকেয়র হিংসা হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্যের বিষয় নয়, তার দিকে ভালো করে চারুশীলা চেয়েও দেখলেন না।

নিজের শয়নগৃহের বিশাল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারা মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করে করে শেষটা অতুল পিসেমশাই বিরক্ত কণ্ঠে বললেন

"কি আশ্চর্য, মেয়েটা বি-এ পাশ করতে পারে, কিন্তু আদৌ গুণগ্রাহী নয়।"

অবশেষে প্রত্যক্ষ কিছু বলবার সুযোগের অভাবে চারুশীলার মা-বাবার কাছে অতুলপিসেমশাই রাশি রাশি বহুমূল্য উপহারের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। এক কোপে উপযুক্ত জামাতা লাভ এবং ব্রাহ্মসমাজের সভ্যসংখ্যা বর্ধনের আনন্দে তাঁরা চারুশীলাকে নানান ভাবে বোঝাতে লাগলেন। কিন্তু তিনি সেই যে নিজের ঘরে কবাট দিয়ে শয্যা নিলেন, উত্তরও দিলেন না, দরজাও খুললেন না। ঐ সকল বহুমূল্য উপহারের প্রতি মা-বাবার বিন্দুমাত্র লোভ ছিল না, কিন্তু কন্যার উদ্ধত আচরণের জন্য তাঁরা বাস্তবিকই লজ্জিত হয়ে সে সকল ফিরিয়ে দিলেন ও বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

অতুলপিসেমশায়ের স্বভাবের একটী বিশেষত্বই ছিল যে বাধা পেলেই তাঁর দ্বিগুণ রোখ চেপে যেত। অবাধ্য ঘোড়া দৌড় করিয়েই কতকটা এরকম হয়েছিল। চারুশীলাকে লাভ করবার জন্য তিনি কি না করেছিলেন। দান ধ্যান, ধূমপান বর্জন, বন্ধু বিতাড়ন, কিছুই তিনি বাদ রাখেন নি। শোনা যায় স্তুতিবাদে বিধাতারো মন গলে, কিন্তু সুগন্ধযুক্ত গোলাপি, ভেলাম কাগজে গুটি পাঁচ সাত মর্ম্মস্পর্শী চাটুবাদপূর্ণ কবিতা,—নিজের রচনা না হলেও উৎকৃষ্ট সব কবিদের দিয়ে বহু অর্থ ব্যয় করে রচনা করানোটাই বা এমন কি মন্দ—

চারুশীলাকে পাঠিয়ে এবং সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে চারুশীলার গবাক্ষের নিচে অদৃশ্যভাবে অবস্থিত অসুন্দর কিন্তু সুদক্ষ সব গাইয়েদের দিয়ে তাঁর অভিনন্দন করিয়ে এবং নিজে প্রকাশ্যে বিশুদ্ধ তান-লয় সংযোগে ক্ল্যারিওনেট বাদ্য করেও কোনো ফল হল না।

বন্ধুদের সাহায্যে ইংরিজি বাংলা বহু গ্রন্থ ঘেঁটেও নারী হৃদয় জয় করবার আর কোনো পথ খুঁজে পাওয়া গেল না। এমন সময় বিধাতা তাঁর সামনে স্বুবর্ণ স্বুযোগ উপস্থিত করে দিলেন। কথিত আছে যে স্বুযোগ সমুদ্রের ঢেউএর মত আসে, হয় তার ঝুঁটি ধরে তার সঙ্গে সঙ্গে সাফল্যের কোলে উপনীত হতে হয়, নয়তো তার ভেঙ্গে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও জলাঞ্জলি দিতে হয়। এখানেও তাই হল। ভগ্ন মনে সান্ধ্য বিহার থেকে অতুল-পিসেমশাই ফিরেছেন, এমন সময় চারুশীলা ডবল ঘোড়ার দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্ধ গাড়ী করে কোথায় কে জানে কোন মোহময় নিমন্ত্রণ থেকে, কোন সব উজ্জ্বল পুরুষরত্নদের দর্শন করে তাই বা কে জানে, ফিরে এসে গাড়ি থেকে পাদানিতে চামড়া মণ্ডিত পদ্ম ফুলের মত চরণটি দিয়েছেন মাত্র, এমন সময় জুড়ি ঘোড়ারা পরস্পরের দিকে ঘৃণাপূর্ণ অপাঙ্গ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে সহসা গাড়োয়ানের শাসন না মেনে, ক্ষেপে গেল। গাড়োয়ানের হাত থেকে রাশ ছুটে গেল, পথের লোক হায় হায় করে উঠল, কিন্তু অতুলপিসেমশাই এতদিনে ভাগ্যদেবী বুঝি বা প্রসন্ন হলেন মনে করে, ছুটে গিয়ে উন্নত মাংসপেশীযুক্ত বিশাল দুই বাহু দিয়ে নিমেষের মধ্যে নিজের নিরাপত্তা তুচ্ছ করে, দুই ঘোড়ার মুখের লাগাম একসঙ্গে চেপে ধরলেন।

সহানুভূতিশীল জনতার সাহায্যে চারুশীলা ও তাঁর ভয়ত্রস্ত অভিভাবকরা গাড়ি থেকে নেমে সকলকে কম্পিত কণ্ঠে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কবে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করবার সময়, চারুশীলার বাবা অতুলপিসেমশায়ের কনুইটা সবলে আকর্ষণ করে তাঁকেও ভিতরে টেনে নিয়ে গিয়ে বহির্দ্বার রুদ্ধ করলেন।

সকলেই আশা করেছিলেন যে এবার একটা মিলনান্তক-নাটকীয় কিছু ঘটবে, কিন্তু কঠিন হৃদয়া চারুশীলা গম্ভীর মুখে ধন্যবাদ জানিয়েই সিঁড়ি দিয়ে উপরে চলে যাবার উপক্রম করল। সহসা অতুলপিসেমশাই মর্মভেদী কাতরোক্তি করে উঠলেন। হতাশ প্রেমে হৃদয় ভগ্ন হয়ে গেল বলে নয়, চারুশীলার সবুজ চোখো ছাই রংএর বেড়ালটা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে তাঁর গা ঘেঁষে চলে গেল বলে। অবাক হয়ে চারুশীলা চেয়ে দেখলেন অতুল পিসেমশায়ের গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল পোড়া ছাইএর রং ধরেছে, আঙ্গুরগুচ্ছের মত চুলের কোঁকড়া খুলে গিয়ে খাড়া হয়ে উঠেছে, হাত পা কাঁপছে।

এক লম্ফে চারুশীলা সিঁড়ির তিনটে ধাপ অতিক্রম করে, পিতামাতার স্তম্ভিত চোখের সামনেই অতুল পিসেমশাইকে দুই মৃণালভুজ দিয়ে জড়িয়ে ধরে বললেন

"কিসের ভয়, এই দেখ আমি আছি, পৃথিবীর যাবতীয় ভয় থেকে তোমাকে রক্ষা করবার জন্য।"

গোলাপি অঞ্চলপ্রান্ত দিয়ে চারুশীলা অতুলপিসেমশায়ের কপালের ঘামের বিন্দু মুছিয়ে দিতে লাগলেন। আর অতুলপিসেমশাইও প্রায় হাত পা এলিয়ে মূর্চ্ছা যান আর কি, তা সে ভয়ের কারণে, না অবাক হয়ে, না প্রেমের বিহ্বলতায়, সে খবর কে বা রাখে।

সেকালের তেজী বরাঙ্গনারা কেমন করে যুগপৎ স্ত্রী-স্বাধীনতার মর্যাদাও রক্ষা করতেন আবার প্রেমের কাছে আত্ম নিবেদনও করতেন আমার মার চারুশীলা পিসিমার বিবাহ ব্যাপার তারি একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

যুগলমহেশ্বরীর কারসাজি

দেশ থেকে মাঝে মাঝে আমাদের ঠাকুরমশায় এসে কলকাতায় দুচার দিন কাটিয়ে যেতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, "তোরা তো আর বিশ্বাস করবি না, কিন্তু আমাদের গাঁয়ের ঐ যে যুগলমহেশ্বরী আছেন, ওঁর দোর্দণ্ড প্রতাপ শুধু ভারতবর্ষে কেন, সাত সমুদ্দুরের ওপারে বিলেতে পর্যন্ত টের পাওয়া যায়। জিজ্ঞাসা করে দেখিস একবার তোদের পানুকাকাকে। এখন যতই সায়েব সাজুক না কেন, পড়েছিল একবার যুগলমহেশ্বরীর কোপে, তখন নাকের জলে চোখের জলে বাছাধনকে টেরটা পাইয়ে ছেড়েছিলেন মা দয়াময়ী। একবার জিজ্ঞাসা করেই দেখ না।"

পানুকাকা কিন্তু আগাগোড়া ব্যাপারটাকে অন্য ভাবে বললেন। বললেন, বংশ পরম্পরায় ঐ যুগলহেশ্বরীটিকে পুষে রাখার ফলেই হক, কি যে কারণেই হক, ওঁদেব মতো আরেকটি প্রাচীন-পন্থী, সংরক্ষণশীল পরিবার খুঁজে পাওয়া দায় ছিল। এখন যুগলমহেশ্বরীব প্রভাবে বিশ্বাস থাকুক বা নাই থাকুক, সময়কালে সামান্য একটু সাহায্য পেলে নিয়তির যে সাংঘাতিক বাড় বেড়ে যায়, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

পানুকাকা ঐ রকম আবহাওয়াতে মানুষ হওয়া সত্ত্বেও কি করে যে মনে মনে ইংরেজদের বিষম ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন সেইটাই ছিল আশ্চর্যের বিষয়। তবে সে ভক্তি মনের মধ্যেই ফল্গুধারার মত সুড়ঙ্গ কেটে কেটে প্রবাহিত হতে থাকল, তাঁর ছ ফুট লম্বা, দারুণ উগ্র স্বভাবের গোঁড়া হিন্দু বাপের কাছে প্রকাশিত হবার সাহসে কুললো না।

অতিশয় মুখচোরা ভালোমানুষ ছেলেটি, ছোট করে চুল ছেঁটে, গলা-বন্ধ কোটের উপর চাদর ঝুলিয়ে, মাথায় টিকি নিয়ে মেট্রোপলিটান কলেজে যেতেন। আই-এ পাশ করে জলপানি পেলেন। বি-এ পাশ করে জলপানি পেলেন। এম-এ আর আইন পরীক্ষা পাশ করবার পর বিলেত যাবার একটা স্কলারশিপ জুটে গেল। মনে হল এ যেন নিয়তির উপহাস।

কিন্তু বাড়ি থেকে যে প্রবল আপত্তি আশঙ্কা করেছিলেন, তার কিছুই হল না। বরং ঠাকুরমশায়ের বাবা, বুড়ো ঠাকুরমশায় পানুকাকার পিতৃদেবকে বুঝিয়ে বললেন, বিদ্যাশিক্ষায় জাতবিচার করা চলে না, বরং আরো বিদ্যা অর্জন করতে পারলে পানুকাকার হিঁদুয়ানি যে আরো দৃঢ়মূল হয়ে যাবে একথা পানুকাকার মুখ দেখলেই বোঝা যায়।

অবশেষে একদিন মা খুড়িদের কাঁদিয়ে হৃদয়ে গোপন উল্লাস ও কপালে দইএর ফোঁটা নিয়ে পানুকাকা বিলাতযাত্রা করলেন। বলাবাহুল্য পথিমধ্যেই তাঁর ভোল অনেকটা বদলিয়ে গেল। যাত্রাপূর্বে উপযুক্ত পোষাক করিয়ে দিতে পিতৃদেব কার্পণ্য করেন নি, এবার টিকিটিও বর্জন হল। পানুকাকা ঝাড়া হাতপায়ে বিলেতের মাটিতে পদার্পণ করলেন।

মাস তিনেক বাদে, এখানে ওখানে ঘোরাঘুরি করবার পর, যে বোর্ডিং হাউসে শেষে গিয়ে উঠলেন, সেখানে আর একটিমাত্র বাঙ্গালী ছাত্রের দর্শন মিলল। দেখতে দেখতে দুজনে অন্তরঙ্গ বন্ধুও হয়ে উঠলেন। ব্যারিষ্টার হতে বিলেত গেছেন, যাতে পড়াশুনোর সঙ্গে সঙ্গে বিলিতীয়ানাটাও সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারেন পানুকাকার সর্বদা সেই দিকে দৃষ্টি ছিল। কাজেই দেশের লোকের অভাবটা তাঁকে বিন্দুমাত্র পীড়া দিল না। বরং জীবনে এই প্রথম আত্মীয়-স্বজনদের সতর্ক স্নেহদৃষ্টির অন্তরালে এসে, একটা অনাবিল আরাম তাঁর দেহ মনকে আচ্ছন্ন করছিল।

এতদিন যে দুনিয়াটার দিকে চেয়েই দেখেন নি, বিশেষ করে দুনিয়াটার উত্তম অর্দ্ধেকটার দিকে, একথা অল্পদিনের মধ্যেই পানুকাকা আবিষ্কার করে ফেললেন। একদিন ডিনার টেবিলে তাঁর পাশে একটি আশ্চর্য সুন্দরী মেয়ে এসে বসল। এমন ধারা মেয়ে যে ইহজগতে থাকতে পারে একথা পানুকাকার স্বপ্নেরো অগোচর ছিল। পাৎলা ছিপছিপে নলখাগড়ার মতো শরীরটা, মনে হয় বাতাস লাগলেই দুলতে আরম্ভ করে দেবে। অস্তগামী সূর্যের আলোর মতো লাল রঙের চুল, পদ্ম ফুলের পাপড়ির মতো গায়ের রঙ, আর সমুদ্রের জলের উপর রোদ পড়লে মাঝে মাঝে যে রকম রংএর বাহার খোলে, ঠিক নীলও নয়, আবার ঠিক সবুজও নয়, দুইএর মাঝামাঝি একটা অপরূপ বর্ণ, তেমনি তার চোখ দুটি।

পানুকাকা অবাক হয়ে দেখলেন ঐ নীল-সবুজ চোখের তারার ধারে ধারে আরো গাঢ় সবুজ রঙ লাগানো। আর উপায় রইল না, সেই এক মুহূর্ত্তে পানুকাকা ঐ মেয়েটির সঙ্গে আকণ্ঠ প্রেমে পড়ে গেলেন। কোথায় গেল যুগলমহেশ্বরীর চাপাচোপা নাটানোটা কালোরূপের প্রভাব, যে প্রভাব নাকি পুরুষানুক্রমে ওঁদের বংশের রক্তের ধারায় প্রবাহিত থাকে, সময় অসময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে ফুটে বেরোয়! মেয়েটির জাতজোত কুলশীল সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র অনুসন্ধান না করেই পানুকাকা দ্বিগুণ উৎসাহে পড়াশুনোয় মন দিলেন। বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যে দূরদৃষ্টির জন্যও ওঁদের বংশের খ্যাতি ছিল।

ব্যাপার দেখে অন্য বাঙ্গালী ছাত্রটির চক্ষুস্থির। তার সহস্র সতর্কবাণী এড়িয়ে গিয়ে পানুকাকার প্রণয় দিনে দিনে শশীকলার মত পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্তে

লাগল। মেয়েটির নাম মেরি-লুইসা, গলার স্বরটিও নামেরি মতো মিষ্টি। আর যেমনি তার কোমল হৃদয়,—বেড়ালের কান্না শুনে পানুকাকা তাকে চোখের জল ফেলতে দেখেছিলেন—তেমনি তার জ্ঞানপিপাসা। পানুকাকা তাকে যা বলেন, হাঁ করে সে তাই গেলে।

তার সঙ্গে পানুকাকা গোটা লণ্ডন সহর চষে ফেললেন, তবু তার আশা মেটে না। অথচ সর্বদা খরচের দিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। একাধারে এমন রূপগুণের সমাবেশের সঙ্গে যুগলমহেশ্বরী পেরে উঠবেন কেন?

যেমন হয়ে থাকে, কথাটা জানাজানি হয়ে গেল। পিতৃদেবের কানেও কে যে তুলে দিল পানুকাকা আজ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারেন নি।

পানুকাকাব ঘরটি ছিল বোর্ডিং হাউসেব রান্নাঘবের ঠিক উপরে। ভোর বেলাতে, আর গভীব বাত্রে ঘরকন্নাব নানান শব্দ তাঁব কানে এসে পৌছত। যারা বলে যে বিলেতে সংসার চলে নিঃশব্দে, তেল-দেওয়া যন্ত্রেব মতো, তারা ভুল বলে। রান্নাঘর থেকে মাঝে মাঝেই একটি কোপনস্বভাবা খিটখিটে মেয়ের কণ্ঠস্বর পানুকাকার কানে আসত। তাতেও তাঁর সুখস্বপ্নের কিছুমাত্র বিঘ্ন ঘটত না, বরং মনে মনে ঐ বদ্‌মেজাজী মেয়েটির সঙ্গে মেরি-লুইসার তুলনা কবতে কবতে পরম সুখে ঘুমিয়ে পড়তেন।

ততদিনে পানুকাকা মেরি-লুইসার হৃদয় জয় করে ফেলেছেন। একদিন সন্ধ্যাবেলায় তার কম্পিত আঙ্গুলে ছোট একটি হীরের আংটিও পবিয়ে দিয়েছেন। ছোট্ট গোলাপি আঙ্গুলটিতে খুদে একটা চুমো খেযে বলেছেন,

আজ এর বেশী দেবার আমার ক্ষমতা নেই, মেবি লু, কিন্তু একদিন তোমার গা ভবা হীরের গযনা গড়িয়ে দেব।

বলা বাহুল্য তাই শুনে মেরি লু আহ্লাদে আটখানা।

ঠিক এই সময় যুগল-মহেশ্বরী এক চাল চাললেন। অত সহজে ছেড়ে দেবাব পাত্রী তিনি নন। কালো গরম চোগা-চাপ্‌কান পরিহিত হয়ে, হঠাৎ একদিন স্বয়ং পিতৃদেব বোর্ডিং হাউসে এসে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে করে নিযে এলেন গোটা হিন্দুধর্ম্মের তেলচিটে পুরোনো আবহাওয়া, মায় স্বয়ং যুগল-মহেশ্বরীর অদৃশ্য উপস্থিতি।

পানুকাকাব মনে হল, আমাদের গোটা গাঁ-টাই যেন উঠে এসে ঐ বোর্ডিং হাউসে বাসা নিয়েছে। পিতৃদেব এসেই সত্যি সত্যি গামছা নিয়ে দুবেলা স্নান করা আর নিজের ঘরে গ্যাস রিংএ রান্না করা শুরু করে দিলেন। সেই সঙ্গে অকাতরে পয়সা খরচ করতে লাগলেন, ল্যাণ্ড-লেডি তো মহাখুশি। বলেছিলাম কি, পানুকাকার পিতৃদেবের মনটা যেমন সঙ্কীর্ণ ছিল, অবস্থাটি ছিল তেমনি স্বচ্ছল?

পানুকাকা হয়তো প্রেমের জন্য প্রাণ পর্যন্ত দান করতেন। কিন্তু তার

আর প্রয়োজন হল না। মেরি-লু অকারণে আংটি সহকারে খসে পড়ল। পিতৃদেবের আগমনের পর থেকে তাকে আর একবারো দেখা গেল না। পানুকাকা এদিকে ওদিকে ল্যাণ্ডলেডির কাছে অনুসন্ধান করেও যখন তার হদিস পেলেন না, তখন যে চক্রান্তশীলা যুগলমহেশ্বরীর ধূর্তবুদ্ধি সম্বন্ধে নানান সন্দেহ মনের কষ্টে উপস্থিত হয়নি, একথা বললে মিথ্যা বলা হবে। তবে উৎসাহের সঙ্গে পিতৃদেবকে লণ্ডন সহর দেখাতে লেগে গেলেন। পুরুষদের হৃদয় এইরকমই হয়ে থাকে।

যথাকালে পরীক্ষার ফলও প্রকাশিত হল, পানুকাকা কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন। পিতৃদেব পানুকাকাকে সঙ্গে না নিয়ে এখান থেকে নড়বেন না এ বিষয়ে কারো মনে সন্দেহ রইল না। তাঁর আগমনের হেতু যে দেশভ্রমণের একটা ইচ্ছা ছাড়াও অন্য কিছু হতে পারে, একথা তাঁর বাক্যে বা আচরণে কোনো দিনো প্রকাশ পেল না। মেরি-লু সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র কৌতূহলও প্রকাশ করলেন না। পুত্রের প্রতি প্রসন্ন হ'য়ে তাকে নানানরকম মূল্যবান উপহার কিনে দিয়ে, কণ্টিনেণ্ট দেখবার তোড়জোড় করতে লাগলেন।

এই সকল ঘটনার মধ্যে পানুকাকার সেই বাঙ্গালী বন্ধুটিও জড়িত ছিলেন। এবার তিনিও তৃতীয়বার পরীক্ষায় নিরাশ হয়ে ওদেরি সঙ্গে দেশে ফিরবার আয়োজন করতে লাগলেন। পানুকাকার নিরুদ্বিগ্ন মনোভাব দেখে দিনের মধ্যে দশবার যেন কি বলি বলি করেও বলে উঠতে পারলেন না।

হয় তো বা শেষ পর্যন্ত কিছুই বলা হত না। কিন্তু জাহাজে একদিন সন্ধ্যাবেলা, পিতৃদেবের ক্ষণিক অনুপস্থিতিতে পানুকাকার বন্ধু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসলেন—

"মেরি লুর হাত থেকে এত সহজে উদ্ধার পেয়ে যাবি, কখনো ভেবেছিলি, পানু?"

পানুকাকা খানিক চুপ করে থেকে বললেন—

"সবটাই যেন হেঁয়ালী। জানিস আমাদের গাঁয়ের ঠাকুরমশায় বলেন আমাদের গুষ্টিতে কেউ কখনো বিদেশী মেয়ে বিয়ে করে না, কারণ আমাদের যুগলমহেশ্বরীর তাতে মত নেই। এমন কি ওঁর যতক্ষণ না মেয়ে পছন্দ হয়, ততক্ষণ অবধি কারো বিয়েই হয় না।"

এ কথা শুনে বন্ধুও এতক্ষণ চুপ করে রইলেন যে, পানুকাকা ভাবলেন হয় তো বা দেবীমাহাত্ম্যের মধ্যে ডুবে রয়েছেন। তারপর হঠাৎ বন্ধু বললেন, "অবিশ্যি, হেঁয়ালী এমন কিছু নেই। একটি কারণ হতে পারে যে, ইয়ে কি বলে, তোর বাবার উদ্বেগ দেখে আমিই তাঁর মনে সান্ত্বনা দেবার জন্য মেরি-লুকে বলেছিলাম যে কোনকালে তোর বিয়ে হয়ে গেছে, তিনটি ছেলে মেয়েও আছে। আর উনি মোটেই তোর বাবা নন, তোর সাক্ষাৎ শ্বশুর। এখন

মনে হচ্ছে তাই সরে পড়ল না কি। অবিশ্যি সত্যি কথা বলতে কি, তাতে আমার একটুও দুঃখ হয় নি, বরং খুশিই হয়েছি। কারণ গত বছর ঐ মেরি-লু আমার আংটি পরে বেড়াত। সেটাও সে ফিরিয়ে দেয় নি।"

আমরা এই অবধি শুনে বলে উঠলাম,

"ঈশ, পানুকাকা, কি সাংঘাতিক বন্ধু তোমার! স্রেফ হিংসে করে এই কাণ্ডটা পাকাল।"

কাষ্ঠ হাসি হেসে পানুকাকা বললেন,

"না রে। তার কাছে আমি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। বাবা যেদিন এলেন সেরাত্রে আর কিছুতেই ঘুম হয় না, মনে বড় অশান্তি, আর রান্নাঘরের সেই ঝগড়াটি মেয়েটির সেদিন ফর্ম খুলে গেছে, সে যে কি দারুণ চ্যাঁচামেচি লাগিয়েছে ভাবা যায় না। শেষ পর্যন্ত ঝনঝন করে এক গাদা বাসনটাসন ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দুম দুম করতে করতে যখন রান্নাঘরের বারান্দায় বেরিয়ে এল, তাকিয়ে দেখলাম সে মেরি-লু ছাড়া আর কেউ নয়; রাগে তার লাল চুল খাড়া হয়ে উঠেছে! জীবনে সেই একদিন যুগলমেহশ্বরীকে ডেকেছিলাম রে, তার পরের ব্যাপার তো সবই জানিস।"

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবাব বললেন, "অত অবাক হবার কিছু নেই। মেরি-লু হল গিয়ে ল্যাণ্ড-লেডির মেয়ে।"

পাশের বাড়ির মেয়ে

কাল আমাদের বাড়িতে পাশের বাড়ির গিন্নি এসেছিলেন। আমি রান্না চাপাচ্ছি, মেজাজটা খুব ভালো নেই, ঠাকুরের শরীরটা কদিন ভালো যাচ্ছে না। নিজেই রান্না করছি। মনে দারুণ সন্দেহ ব্যাটার বোধ হয় আসলে কিছুই হয় নি। এমন সময় পাশের বাড়ির গিন্নি এসে দোর গোড়ায় দাঁড়ালেন।

মাছগুলো ছেড়ে দিয়ে, ফিরে একবার তাঁর মুখের দিকে তাকালাম, মুখখানি যেন তোলো হাঁড়ি, ভাঁড়ের দুধ দই হয়ে যাবার জোগাড়। শুধোলাম—

"ওকি, আবার কি হল?"

জলচৌকির উপর বসে পড়ে বললেন—"দিদি, মনটা বড় খারাপ।"

বললাম "সে কি! অনিলবাবু ভালো আছেন, ছেলে পাশ করেছে, মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, জায়গাজমি কিনেছেন, মন ভালো হয়ে গেছে বলুন।" বিষম একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—

"না, হাসির কথা নয়, ছেলে মেয়ে জায়গাজমি দিয়ে কি হবে? জানেন নুটুর ভূগোল বইতে কি সাংঘাতিক কথা পড়ে এসেছি?"

মাছে অল্প একটু জল ঢেলে, তার উপর কুচি কুচি ধনে পাতা আর আস্ত আস্ত কাঁচা লঙ্কা ছেড়ে বললাম,

"এঁ্যা, তাই নাকি? ভূগোল আবার কি বলে?"

বললেন,

"উঃ, জীবনে আমার সব স্পৃহা চলে গেছে। আপনি জানেন যে পৃথিবীটা ক্রমে ঠাণ্ডা হতে হতে একদিন একেবারে হিমশীতল বরফে ঢাকা মরুভূমিতে পরিণত হবে? তখন এই সব প্রাসাদ, মন্দির, কৃষ্টি, শিল্প, বিজ্ঞান, কাব্য, এ সবের কি হবে?"

হাউ হাউ করে কেঁদে বললেন—"আমাদের পুতির পুতিদের কি অবস্থা হবে ভেবেও যে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে!"

মাছটা নামিয়ে রেখে দিলাম—"কি আপদ! এই ভেবে এত কষ্ট পাচ্ছেন? আপনি জানেন না অ্যাটম বোমা দিয়ে সব কৃত্রিম উপায়ে গরম করা হবে?"

"আঃ! বাঁচালেন দিদি! সত্যি এম্ এ পাশ করার কত সুবিধে? যাই, এবেলার রাঁধাবাড়ার জোগাড় করি গে, সারাদিন ভেবে ভেবে আর কিছু করে উঠতে পারি নি।"

এমনি ধারা ঘটনা প্রায়ই হয়। হয় তো রাত্রে একটা বই নিয়ে নিরিবিলি একটু বসেছি, দরজার কাছে নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালেন, ভারি চুপচাপ ঠাণ্ডা মানুষটি এদিকে। আদর করে বসাই, কান পেতে থাকি আবার কি নতুন চিন্তা এল। বললেন—

"দিদি, ঘরকন্নার উপর কখনো আপনার ঘৃণা ধরে যায়?" বললাম—"তা আর যায় না '? অনেক সময়ই যায়। কাঁচের বাসন ভাঙলে, ছেলে অঙ্কে ফেল্ করলে, ধোপা দেরী করে এলে, ননদ এসে দু মাস থাকলে, হঠাৎ জিভ কামড়ে গেলে, ওর সঙ্গে খিটিমিটি লাগলে, সত্যি বলছি, এইসব বলতে বলতেই আমার সংসারের উপর একটু একটু ঘৃণা জন্মে যাচ্ছে।"

তিনি বললেন—

"না, দিদি; আমি ওরকম ঘৃণাব কথা বলছি না। আপনাব কি কখনো মনে হয় না যে যীশু, শঙ্করাচার্য্য, বুদ্ধদেব, রামকৃষ্ণ পরমহংস, এমন কি স্বয়ং আমার গুরুদেব, কেউ দুনিয়াটাকে যখন ভালো করতে পারছেন না, তখন আর বেঁচে থেকে লাভ নেই? যেদিকে তাকাবেন খালি পাপের গন্ধমাদন, ঠগ জোচ্চোর নিষ্ঠুর দুষ্টু লোকরা চারিদিকে আনন্দে বিচরণ করছে আর ভালো লোকরা কষ্ট পাচ্ছে?"

আমি চমকে উঠে বললাম—"এই রে! পাপের গন্ধমাদন বলতে মনে পড়ে গেল, আমার ছোট ভাজ আবার আমার কাঁচি নিয়ে গিয়ে ফেরত দেয় নি। ধব এবার ওকে ঠেসে"

উঠেই পড়ি।

ভদ্রমহিলা আগে বোধ হয় খুব মাছের মুড়োটুড়ো খেতেন, নইলে চিন্তা করবাব এত শক্তি পেলেন কোথায? একদিন এসে বললেন—

"দিদি, একটা বড় ভাবনায় পড়ে গেছি। এই যে কারো ছেলে হল, মেজ পিসিমাব নাতনী হল, অমলা কমলা দুজনারই ছেলে হল, রমেনের বৌ-এরই বা হতে কতক্ষণ, এই এতগুলো লোক বেড়ে গেল, তার বদলে কই কেউ তো আমাদের মলনা? তা হলে কি করে চলবে? পাঁচটা জন্মাবে আর বড় জোর একটা মববে, এমনিতেই শুনি রেশনের বাজার, কিছু পাওয়া যায় না, তা হলে শেষ পর্যন্ত ওনাকে কি করে পেট ভরে খেতে দেব?"

আমি বললাম—"কি মুস্কিল! আপনার যে ভাবনার আব অন্ত নেই। এই বিষয়ে অনেক বড় বড় পণ্ডিতরা আগেই গবেষণা কবে রেখেছেন। আপনি কিচ্ছু চিন্তা করবেন না, দেখবেন ঐ অমলা কমলার ছেলেপুলেরা হয় জলে ডুবে, নয় বোমা পড়ে, নয় গাড়ি চাপা পড়ে, নিশ্চয় অল্পদিনের মধ্যেই মারা যাবে। তাছাড়া শীগগির দেখবেন বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই এই টুকু

জায়গায় এতখানি ধান গজানো হবে, সবাই খেয়েপরে সুখে থাকবে।"

"তাই বলুন।" নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি ফিরে যান

পরদিন সকালে আবার এসে উপস্থিত।

"দিদি, কাল যে অমলা কমলার ছেলেদের শীগগিরই মারা যাবার কথাটা বললেন, কথাটা ঠিকই। বোধ হয় কয়েক বছরের মধ্যে গাড়ি চাপা পড়ে ওরা মরবে। খবরের কাগজে দেখলাম গত একশো বছরের মধ্যে আমেরিকার লোকরা যুদ্ধে যত না মরেছে, গাড়ি চাপা পড়ে মরেছে তার চেয়ে ঢের বেশি। আমাদের দেশের লোকরা তো আরও আনাড়ি। ভাবছি অমলা কমলাকে জানিয়ে দেব কিনা। ওরা আবার ছেলেদের নামে কি সব কাগজ কিনে রাখবে বলছিল। মরেই যখন যাবে তবে আর পয়সা নষ্ট কেন?"

ব্যস্ত হয়ে বললাম, "না, না, অমন কাজো করবেন না, কে জানে হয় তো অমলা কমলার ছেলেরাই বেঁচে থাকবে, আমরা আর সবাই মরে যাব, কিছুই তো বলা যায় না।"

কোনো রকমে তাঁকে ঠাণ্ডা করি।

আরেকদিন আমিই একটু আঠা চাইতে ওঁদের বাড়ি গিয়েছিলাম। দেখি গিয়ে বাড়ির যা অবস্থা সে আর ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। জিনিষপত্র এদিকে ওদিকে ছড়ানো, চারধারে ধূলো ঝুল কালি, বুঝলাম নিশ্চয় কোনো দারুণ চিন্তা এসেছে। তিনতলার ছাদে গিয়ে দেখলাম হাসি হাসি মুখ করে আকাশের দিয়ে চেয়ে বসে আছেন। তবুও ভালো। আমাকে দেখেই ছুটে এসে পায়ে পড়ে বললেন—

"দিদি, দিন, দিন, চারটি পায়ের ধূলো দিন। আজ আমার মনটা যে কি খুসি সে আর কি বলব!"

জিজ্ঞাসা করলাম—"কেন, বলুন তো? আমি আবার কোথাও আমার আঠার শিশি খুঁজে পাচ্ছি না, বলে খুব মন খারাপ করে এসেছি।"

খুব হেসে আমাকে আঠার শিশি দিলেন, দিয়ে বললেন—"না, দিদি, এখনি যাবেন না, বসুন একটু মিষ্টিমুখ করে যান। আজ বড় আনন্দের দিন।"

কি আর করি, হাতে তেমন কাজও ছিল না, বসে রসগোল্লা টসগোল্লা, খেলাম। বললেন—

"জানেন, ভেবে ভেবে পৃথিবীর সব দুঃখ দূর করে দেবার উপায় ঠিক করে ফেলেছি। এত সহজ উপায়টা যে এতদিন কারো কেন মনে হয় নি তাই ভাবি।"

অবাক্ হয়ে বললাম—"তাই নাকি! সবাইকে শিখিয়ে দিন তা হলে।"

"শেখাবার কিছুই নেই, পৃথিবীতে কেউ যদি বিয়ে না করে, সবাই যদি সন্ন্যাসী হয়ে যায়, তা হ'লেই তো ল্যাঠা চুকে গেল! সংসারে লোকই থাকবে না, তবে আর কষ্ট পাবে কে? হাসছেন, দিদি, ভাবছেন বুঝি ঠাট্টা করছি। এই দেখুন, সত্যি সত্যি আমার ননদের ভাবী বেয়াই বাড়িতে চিঠি লিখেছি, এ চিঠি বেয়াই পেলে, কক্ষণই ননদের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন না। এমনি করে একটু একটু করে, দুঃখের সম্ভাবনা দূর করতে হয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওকি দিদি, চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দিলেন যে।"

ভদ্রমহিলার স্বামীর সঙ্গেও আলাপ আছে আমাদের, দিব্যি মোটাসোটা হাসিখুশি মানুষটি, চোখে একটা দুশ্চিন্তার ছাপ। একদিন বললেন—"দেখুন, আমার গিন্নির হাজার রকমের চিন্তা, কিন্তু আমার ঐ একটিমাত্র চিন্তা, গিন্নির চিন্তাগুলো যাতে কাজে পরিণত না হয়, এই এক চিন্তা। জানেন, কাল আমাদের একটা বড় ফাঁড়া কেটে গেছে!"

বললেন—"ভালো চিন্তাই বলুন আর মন্দ চিন্তাই বলুন, চিন্তাতে আমাদের বড় একটা এসে যায় না। আব শুধু আমাদের কেন, পৃথিবীতে কারই বা এসে যায়। যদি যেত, তবে এত ভালো লোক এত সব ভালো ভালো চিন্তা করে যাওয়া সত্ত্বেও দুনিয়াটার এ দুর্দশা কেন? গিন্নী যতক্ষণ শুধু চিন্তা করেই ছেড়ে দেন, আমরা একটুও মাইণ্ড্ করি না, কিন্তু মাঝে মাঝে যখন উনি চিন্তাগুলোকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেন, তখন আমরা বাড়িশুদ্ধ সকলে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি।

"বুঝলেন, কাল দেখলাম একটা নতুন চাকর এসেছে, কদমছাঁট করে চুল ছাঁটা, খাটো একটা নীল হ্যাফপ্যাণ্ট আর ময়লা গেঞ্জি গায়, চোখ দুটো নাকের পাশ ঘেঁষে বসান, সব সময় চারিদিকে চাইছে। দেখেই আমার দারুণ সন্দেহ হল। গিন্নিকে বললাম,

'ওকে কোথায় পেলে? ও যদি পাকা চোর না হয় তো কি বলেছি!' গিন্নি অবাক্ হয়ে বললেন—চোরই তো! • চোর বলে কি ফেলে দেব? জেলে দিয়ে, শাস্তি দিয়ে, ঘেন্না করে, কোনো চোরকে কখনো ভালো করা গেছে? চাকরি দেব না তো কি! ও বেচারা কি আবার চুরি করে খাবে? জান ও সাতাশবার জেল খেটেছে, তবু ওর স্বভাব বদলায় নি? জেলের দারোগাবাবুর বৌ-এর কাছ্র থেকে আমার শোনা। তাই ওকে ডেকে নিয়ে এসেছি। এ বিষয় আমি অনেক চিন্তা করেছি, বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠবে। তুমি খালি আপিশ যাও আর পয়সা রোজগার কর, তাই তুমি চিন্তা করবার সময় পাও না, নইলে বুঝতে আমি ঠিকই বলছি। আজ রাত্রে তোমার সোনার বোতাম, হাতঘড়ি আর ফাউণ্টেন পেন টেবিলে রেখে, দরজা খুলে শোব। দেখো, কিচ্ছু হবে না। বরং ওর একটা অনুতাপ আসবে। কত ভেবেছি এ বিষয়।"

বললাম—"আমার সোনার বোতাম, হাতঘড়ি, ফাউণ্টেন পেন এ সম্মানের যোগ্য নয়। তোমার সোনার মাকড়ি দিয়েই পরীক্ষা হক, আর কিছু দিয়ে নয়।"

তাই গিন্নি করলেন শেষ পর্যন্ত। আর সে কি ঘুম, খাটে শোয়ামাত্র ভোঁস ভোঁস নাকা ডাকা। কি বলব মশায়, আমারি চুরি করতে ইচ্ছা করছিল। চুপ করে মটকা মেরে পড়ে আছি। আর পা টিপে টিপে বাছাধন ঘরে ঢুকেছেন, যেই মাকড়ি পকেটে পুরেছেন, আমিও লাফিয়ে উঠে, তাকে জাপটে ধরে, চেঁচিয়ে মেচিয়ে লোক জোগাড় করেছি। তারপর জেলের ছেলে আবার জেলে।"

একটু থেমে, একটা পান মুখে পুরে, ভদ্রলোক অল্প হেসে বললেন —"গিন্নির চিন্তাশক্তিকে আজ হার্নেস করে ফেললাম মশাই। উনি আসছে বছর স্কুল ফাইনেল পরীক্ষা দেবেন। অঙ্ক আর সংস্কৃতের মাষ্টার ঠিক করেছি। এখন উনি, চিন্তা করবার বিষয় পেলেন—নর-নরা-নরৌ আর একটা বাঁদর একটা তেল মাখানো বাঁশ বেয়ে এক মিনিটে তিন ফুট ওঠে, পরের মিনিটে দেড় ফুট পিছলে পড়ে!—আচ্ছা তবে আসি।"

"তিন অঙ্ক"

১ম অঙ্ক

গোড়া থেকেই সবটা যে নকুড়মামার দোষ এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। হতে পারে যে মারা যাবার আগে তাঁর একটু বুদ্ধি-বিভ্রম হয়েছিল, তবে অনেকেরি মতে সে সব কিছুই হয় নি ; জেনে শুনে, ইচ্ছে করেই আগাগোড়া ব্যাপারটাকে পাকিয়ে তুলে, তিনি দিব্য নিশ্চিন্ত মনে স্বর্গে গিয়েছিলেন।

শ্রাদ্ধশান্তির পর নকুড়মামার বহুদিনের বন্ধু এবং আজীবনের উকীল মিষ্টার ব্যানার্জি যখন নকুড়মামার বেহালার একতলা বাড়ির সুসজ্জিত বসবার ঘরে বসে সকলের সামনে উইলের কথা প্রকাশ করছেন, প্রচণ্ড ঝড়ের আগে যে রকম একটা থমথমে ভাব হয়, ঘর জুড়ে সেই রকম একটা থমথমে ভাব বিরাজ করতে থাকল। তারপর চারদিক থেকে সাইক্লোন্, বোমা বিস্ফোরণ! প্রথমটা কেউ তো বিশ্বাসই করতে চায় না, তারপর যখন হাতে হাতে উইলের মোটা কাগজখানা প্রায় ছিঁড়ে যাবার জোগাড়, মিষ্টার ব্যানার্জি নিচু গলায় ও ভদ্র ভাষায় নিবেদন করলেন যে উইল ছিঁড়ে ফেলে কোনো লাভ নেই, কারণ আপিশে আরো তিনখানা কপি তোলা আছে। এই রকম একটা পবিস্থিতি আশঙ্কা করে, নকুড়মামা নিজেই বুদ্ধি কবে কপিগুলো করিয়েছিলেন।

উইলে যে দুটি লোকের নাম ছিল, রাগের চোটে এতক্ষণ তাদের বাক্যস্ফূর্তি হচ্ছিল না, এতক্ষণে কতকটা আত্মসংবরণ করে তাবা দুজনে এগিয়ে এল। অতিশয় ক্রোধে জয়ন্তর তোতলামি এসে গিয়েছিল। সে খানিকটা দ্-দ্-দ্ ফ্-ফ্ করবাব পর কৃষ্ণা বিরক্ত হয়ে বললে,

'তুমি থামো তো। কই দেখি দেখি উইলটা, বেশ এক চাল চাললেন নকুড়পিসেমশাই।'

মিষ্টার ব্যানার্জি মিনুদিদির হাত থেকে উইলটা নিয়ে কৃষ্ণার হাতে দিলেন। কৃষ্ণা উইল নিয়ে, আবার দরজার পাশে নিজের জায়গায় গিয়ে বসল। তার ডান দিক থেকে মা আর বাঁ দিক থেকে অশোক বসু ঝুঁকে পড়ে উইল পড়তে লাগলেন। নিদারুণ রাগে কৃষ্ণার ফোঁস্ ফোঁস্ করে নিশ্বাস পড়ছিল, একটু কাষ্ঠ হাসি হেসে সে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। অশোক বসু বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল আর কৃষ্ণার মা একবার এর দিকে একবার ওর দিকে চাইতে লাগলেন।

তারপর কৃষ্ণা ক্রুদ্ধ চাপা কণ্ঠে বললে "নেভার।"

বলে উইলখানিকে ঘৃণা ভরে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

সেখান থেকে উইল কুড়িয়ে মিষ্টার ব্যানার্জি সেটিকে জয়ন্তর হাতে দিলেন। জয়ন্ত কম্পিত হাতে ভাঁজ খুলে পড়তে লাগল, তারো ডান দিক থেকে মা আর বাঁ দিক থেকে মলি ঝুঁকে পড়ল। জয়ন্ত উইলের অক্ষরের উপর একবার মাত্র চোখ বুলিয়ে, গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল, পুরুষোচিত গম্ভীর গলায় বললে—"আমি রাজী নই মিষ্টার ব্যানার্জি, মলিকে ছাড়া আমি আর কাউকে বিয়ে করবার কথা ভাবতেও পারি না।"

মলি ব্যাগ্ থেকে রুমাল বের করে চোখ ঢাকল। কৃষ্ণা ভীষণ রেগে বললে—"কে চায় তোমাকে বিয়ে করতে যে অত মাথা ঘামাচ্ছ।"

জয়ন্ত কোনো উত্তর না দিয়ে বড় বড় পা ফেলে খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। কৃষ্ণার মা বললেন—

"এ কি কখনো হতে পারে মিষ্টার ব্যানার্জি? একটা যা তা বললেই তো আর হয় না! ছোটবেলা থেকে কৃষ্ণা জয়ন্তকে দেখতে পারে না, একথা নকুড়দাদা বেশ জানতেন। বাবা! ছেলেও কম পাজী ছিল না, আমারই ওকে দেখবামাত্র হাড় জ্বলে যেত, তা আমার মেয়েকে আর দোষ দিই কেমন করে?"

জয়ন্তর মা বললেন, "বড় যে যা মুখে আসছে বলে যাচ্ছ বাণীদি, সারাটা জীবন পরকে হিংসা করে করেই গেলে! কারো উপর যদি অন্যায় করা হয়ে থাকে, আমার উপর হয়েছে। নকুড়দাদা আমার আপনার পিস্তুতো ভাই, ওরকম লেজুড় না জুড়ে সোজাসুজি জয়ন্তকেই তো সম্পত্তি দিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। দুনিয়াতে এত মেয়ে থাকতে কৃষ্ণাকেই বিয়ে করতে হবে, এ তো মহা জুলুম! কৃষ্ণাটাকে ছোটবেলায় আমার মনে পড়ে, মা গো! কি ঝগড়াটি, মিথ্যাবাদীই না ছিল! কিছু হয়েছে কি না হয়েছে অমনি ছিঁচ্ কাদুনী গিয়ে বলবে, ওঁ পিঁসেমশাই, দেঁখ না, জয়ন্ত কি করে। আমরি মত নেই তা ছেলের মত হবে কি করে!"

কৃষ্ণার মা এই পর্যন্ত শুনে কৃষ্ণার হাত ধরে টানতে টানতে ঘর থেকে চলে গেলেন। অশোক বসু একবার একটু ইতস্ততঃ করে তাদের পিছন পিছন নিষ্ক্রান্ত হল। জয়ন্তর মাও কাষ্ঠ হাসি হেসে যে দরজা দিয়ে জয়ন্ত গিয়েছিল সেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন, মলি রুমাল তুলে সঙ্গে গেল।

মিনুদিদি, টুনিদিদি, রমলামাসিমা, পানুবাবু, অর্দ্ধেন্দুবাবু, যোগেশদা যে যার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

মিনুদিদি বললেন—"বহু মৎলবী লোক দেখেছি বাপু জীবনে, কিন্তু এদের কাছে কেউ লাগে না। একটা বুড়ো মানুষকে ভাঁওতা দিয়ে গোটা সম্পত্তিটা বাগিয়ে নিলে!"

টুনিদিদি বললেন—"হ্যাঁ! আমরা নিজের মাসি পিসি মামা দাদারা

যেন কউ নই। বলি যখন কৃষ্ণা জয়ন্ত জন্মগ্রহণ করে নি, তখন কাদের নিয়ে তোর জীবন কাটত। তুই মরে গেছিস বলে কি সে সব কথা আমরা ভুলে গেছি নাকি।"

রমলামাসিমা, যাতে চুলের কায়দা নষ্ট না হয় এমনি সন্তর্পণে, আঁচল তুলে চোখে দিয়ে বললেন—

"কৃতজ্ঞতা বলে দুনিয়াতে কিই বা আছে। এই পাড়া ঠেঙ্গিয়ে রাশি রাশি ট্যাক্সি ভাড়া দিয়ে এলাম, বুড়ি মাসিমার বাড়ি গিয়ে কত খেইছিস, তা একবার মনেও করলি না।"

পানুবাবু জানলা দিয়ে গলিয়ে মুখের পানটা বাইরে ফেলে দিয়ে বললেন—"আরে ছোঃ ছোঃ! ছোট বেলাকার বন্ধুত্ব টন্ধুত্ব কিছু নয়।"

অর্দ্ধেন্দুবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, নয়নদ্বয়কে উর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত করে বললেন—"গুরুদেব! তোমার ঐ অযোগ্য শিষ্যটিকে ক্ষমা কর। তুমি না হয় স্বর্গে গেছ তোমাব বোধ হয় আর কিছুবি দরকার নেই, কিন্তু আমরা পাঁচসাতজনা গুরুভাই রয়েছি, কারো নামটা পর্যন্ত কবলে না। ছি, ছি, সংসারটা কিছু না, কিছু না।"

যোগেশদা দু'ই ঘাড় তুলে ফরাসী কায়দায় একটু স্রাগ করে, হাতের সিগারের ছাই ফেলতে ফেলতে আর সকলেব সঙ্গে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

যেতে যেতে সকলে সমস্বরে বলতে লাগলেন—"বাড়ি! বাগান! ব্যাঙ্কের টাকা! চার পার্সেণ্ট কাগজ, ও হো হো।"

ছোট গোলটেবিলের কাছে বসে পোর্টফোলিও খুলে মিষ্টার ব্যানার্জি কাগজপত্র বের করে ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগলেন। মাথার উপরে দেয়াল ঘড়িতে টং টং করে সন্ধ্যা ছটা বাজ্‌ল।

২য় অঙ্ক

ঘরের বাইরে দিব্যি এক নাটুকে পরিস্থিতি গড়ে উঠল। জয়ন্ত নকুড়-মামার চারকোণা পুকুরের পাড়ে টালির ছাদ দেওয়া ছোট চাতালে গিয়ে, হাঁড়ি মুখ করে জলের দিকে চেয়ে রইল। বাড়ি, বাগান, টাকা কিছু ফেলে দেবার জিনিষ নয়, বিশেষ করে যারা সবেমাত্র ডাক্তারি পাশ করে প্র্যাক্‌টিস্ শুরু করেছে, কিন্তু তাই বলে প্রেমের কাছে ওসবের কোনো মূল্যই নেই। সেইখানে জয়ন্তর মা গিয়ে তাকে কোণঠাসা করলেন।

"ওরে জয়ন্ত, ভালো করে ভেবে দেখিস, এসব জিনিষ কিছু ফেলে দেবার মত নয়। আর মলিই বা কি এমন অসাধারণ রূপে গুণে যে তার জন্য এত সব ছেড়ে দিবি? বাইরেই যেটুকু তফাৎ, ভিতরে ভিতরে ঐ মলিও যা কৃষ্ণাও তাই। বরং কৃষ্ণাই ভালো।"

"দেখ, মা, মলিকে তুমি পছন্দ কর না জানি, কিন্তু তাই বলে আমার কাছে

ওর বিষয়ে অমন তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে কথা বলাটা তোমার উচিত নয়। তা ছাড়া কৃষ্ণাকেই বা কি বলে সাপোর্ট করছ? চিরকাল তো তুমি ওর উপর হাড়ে চটা বলে জানি।"

"যা তা বলিস নে জয়ন্ত, কৃষ্ণা আমার মেয়ের মতো, ওর মার ভারি গুমোর বলে মুখে যাই বলি না কেন, মনে মনে কৃষ্ণাকে আমি ভারি স্নেহ করি। মলিকে বিয়ে করলে চিরকালটা কষ্ট পাবি, না আছে তার চালচুলো, না আছে বিদ্যাবুদ্ধি, অথচ সখের অন্ত নেই। কিন্তু কৃষ্ণাকে বিয়ে করলে তুই খুব সুখী হবি বলে রাখলাম—।"

জয়ন্ত মাথা নেড়ে সেখান থেকে প্রস্থান করল।

ওদিকে কৃষ্ণার মা ঘর থেকে বেরিয়েই অশোক বন্ধুকে বললেন "তুমি বাছা আমাদের পিছন পিছন ওরকম করে ঘুরলে পাঁচজন আত্মীয়স্বজনই বা কি বলবেন বল তো? তুমি বরং বাগানে গিয়ে একটু বেড়াও না, বেশ দখিণ হাওয়া দিয়েছে।"

অশোক ব্যথিত মুখ করে বাগানে চলে যায়। কৃষ্ণার মা বারান্দার কোণায় পৌঁছে বেতের চেয়ারে ধপ্ করে বসে পড়েন।

"কৃষ্ণা, তোর পিসেমশাই-এর শেষ ইচ্ছাটা পালন না করলে কাজটা কিন্তু ভালো হবে না।"

কৃষ্ণা রেগে আগুন হয়ে বললে—"দেখ মা, তুমি অশোককে পছন্দ কর না জানি, কারণ ওর বেশি টাকা নেই। তোমরা বুড়ো হয়ে গেছ, টাকা পয়সাই তোমাদের কাছে বড় হল। আমি এই বাড়ি বাগান ভোগ করার চেয়ে অশোকের সঙ্গে কুঁড়ে ঘরে শাক ভাত খেয়ে থাকাটাকেই ভালো মনে করি।"

"তবে যে বড় শনিবার, শনিবার অশোককে টেনে নিয়ে এসে দুজনে মিলে নকুড়দাদার খোসামুদি করতিস? আমাকে আব বলিস না, সিল্কের সাড়ি না হলে যে বাড়ি থেকেই বেরোয় না, তাব মুখে ওকথা সাজে না। অশোকটা একটা ওয়ার্থলেশ্ ভ্যাগাবণ্ড, বি-এ পাশ করে অবধি বসে বসে বাপের ভাত ওড়াচ্ছেন আর কাব্যি করছেন। তাও যদি কবিতার কোনো মাথামুণ্ডু মানে হত। জয়ন্তর সঙ্গে ওর তুলনা হয়? জয়ন্ত দিব্যি ডাক্তারি পাশ করে কাজকর্ম করছে। ওর মাটি বড় সুবিধের নয় বলে তার সামনে কিছু বলি না, কিন্তু জয়ন্তকে আমি ভারি ভালোবাসি। ওকে বিয়ে করলে—

কৃষ্ণা বললে—"কখনো না, কখনো না।"

বলে হাতে চোখ ঢেকে সেখান থেকে চলে গেল।

বাগানে মলির সঙ্গে জয়ন্তর আবার দেখা হয়। ততক্ষণে মলি দাঁত দিয়ে রুমালটাকে কামড়ে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলেছে। চোখ দিয়ে মলির আগুন ঠিকরোচ্ছে—দেখা হবামাত্র সে বললে—

"জয়ন্ত, এ আমি তোমার কাছে আশা করি নি। প্রতি রবিবার তুমি আমাকে এখানে এনেছ, আমাকে ভাবতে দিয়েছ এ বাড়ি বাগান শীগ্গিরই একদিন আমাদের হবে—"

জয়ন্ত বাধা দিয়ে বললে—"শীগ্গিরই একদিন নয়, মলি, আমি তো ভাবতাম নকুড়মামা আরো ত্রিশ বছর বাঁচবেন, সত্যি বলছি ভয় হত, বাড়ি বাগান পাবার আগে আমরাই মরে ঝরে শেষ না হয়ে যাই!"

মলি সে কথায় কান দিল না, আরো বললে—

"যখন বাড়ি বাগান, টাকা পয়সার কিছুরি কোনও নিশ্চয়তাই নেই, তবে তুমি কোন সাহসে আমার কানে কানে অত প্রেমের কথা বলেছিলে? উঃ! পুরুষ মানুষকে কখনো বিশ্বাস করতে নেই! কিই বা রোজগার কর, তুমি? চার শো? পাঁচ শো? আবার মা-টিতো আছেন!"

হাত থেকে আংটি খুলে জয়ন্তর পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দেয় মলি। বুকের উপর পদ্মফুলের মত দুটি হাত, ছেঁড়া রুমাল সুদ্ধ, চেপে ধরে, চাপা কণ্ঠে বলে—

"তুমি আমার হৃদয় ভগ্ন করে দিলে, জয়ন্ত। পুরুষ মানুষের কাছে প্রেম একটা খেলা, কিন্তু নারীর কাছে প্রেম হল সর্বস্ব।"

জয়ন্ত অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকে। মলির চোখ দিয়ে বড় বড় ফোঁটা সত্যিকার জল পড়ে, ভগ্ন-কণ্ঠে মলি বলে—

"তোমার জন্য শঙ্করকে বিদায় করে দিয়েছিলুম, জয়ন্ত, সে দুঃখ তুমি আর কি বুঝবে। শঙ্কর বেচারার নাকটার একটু ফানি সেপ্, কিন্তু হৃদয়টা তার কত বড়, আর ব্যাঙ্কে তার এক লক্ষ টাকা আছে তা জান? উঃ! এখানে আমি আর কেন অপমান হচ্ছি! দেখি কোথায় শঙ্কর, শুনেছি নাকি ঐ হেট্ফুল্ টিলি ওর পিছন পিছন ঘুরছে! আর সময় নেই জয়ন্ত, বিদায়!—"

ঝড়ের মত মলি চলে যায়। জয়ন্ত পকেট থেকে একখানি খাকি তোয়ালের রুমাল বের করে কপালের, মুখের, গলার ও ঘাড়ের ঘাম মুছে, হিমে-ভিজা ঘাসের উপরেই বসে পড়ে। একটা হাস্নাহানার ঝোপ তাকে আড়াল করে দেয়। ব্রাউন্ জুতো জোড়ার একটুখানি শুধু দেখা যায়। ঘাসের উপর আংটিখানি চক্‌চক্ করে।

সেইখানে কৃষ্ণা আসে, তার পিছন পিছন অশোক বসু

"আমাকে বিদায় দাও কৃষ্ণা, তোমার জীবনে আমার আর স্থান নেই।"

"কি! টাকা পাবে না বলে, সরে পড়ছ বুঝি তুমি! হায়, অশোক, তুমিও'!

অশোক আকাশের দিকে চোখ তুলে, গভীর কণ্ঠে বলে "না, না, কৃষ্ণা, আমি তোমার জীবন নষ্ট হতে দেব না। দারিদ্র্যে তুমি পিষ্ট হবে এ আমি সইতে পারব না।"

"কেন, বি-এ পাশ করেছ, একটা চাকরিবাকরি খুঁজে নিতে পারবে না? আমি তো একটা স্কুলে মাষ্টারি করতে পারি।"

দুই হাতে কান ঢেকে অশোক শিউরে উঠে বলে—

"না, না, কৃষ্ণা, অমন করে প্রয়োজনের পায়ে প্রেমকে বলি দিও না। নাই বা হল আমাদের বিয়ে, আমাদের হতাশ প্রেমের সৌন্দর্য অক্ষুণ্ন থাকুক—। কিন্তু চাকরিটাকরি আমি করতে পারব না, তা হলে আমার কাব্য প্রতিভা পিষ্ট হয়ে যাবে। তা ছাড়া কেউ আমাকে চাকরি দেবেও না, আমার হাঁপানি রোগ আছে। অতএব বিদায়, কৃষ্ণা। আমার পিসিমারি জয় হল। তাঁর ভাসুরঝির মনে কষ্ট দিয়ে, তোমার কাছে এসেছিলাম, ভগ্নহৃদয়ে নিয়ে ফিরে যাই, হায় কৃষ্ণা, বিদায়।"

অশোক বস্তুও চলে যায়। কৃষ্ণা এতক্ষণে একটু ম্লান হাসি হেসে, আঁচলের কোণ দিয়ে চোখ মুছে ফেলে। জয়ন্ত ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে বলে— "মলি, অশোক তো ভগ্ন হৃদয় নিয়ে বিদায় হল। এবার কি হবে, কৃষ্ণা?" কৃষ্ণা হঠাৎ হেসে ফেলে, জয়ন্তও হেসে ফেলে।

"চল, বুড়ো মানুষের শেষ ইচ্ছা পালন করি।"

ঘাসের উপব থেকে আংটি তুলে জয়ন্ত কৃষ্ণার আঙ্গুলে পরিয়ে দেয়।

৩য় অঙ্ক

নকুড়মামার বসবার ঘরে আলোর নিচে গোল টেবিলে মিষ্টার ব্যানার্জি কাগজপত্র গুছোতে গুছোতে চমকে ওঠেন, একখানি মোটা কাগজ তাঁর হাতে থেকে যায়, বাকি সব মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে। মিষ্টার ব্যানার্জি অস্ফুট আর্তনাদ করে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ান, বড় চেয়ারখানি ধীরে ধীরে উলটিয়ে পড়ে যায়। ভারি একটা শব্দ হয়।

বাগানের দিকের দরজা থেকে কৃষ্ণা ও জয়ন্ত পরস্পরের হাত ধরে ঘরে প্রবেশ করে। অপর দিকের দরজা দিয়ে কৃষ্ণার মা ও জয়ন্তর মাও পরস্পরের হাত ধরে প্রবেশ কবেন। বিভিন্ন দরজা জানলা দিয়ে মিনুদিদি, টুনিদিদি, রমলামাসিমা, পানুবাবু, অর্দ্ধেন্দুবাবু ও যোগেশদা প্রবেশ করেন।

কৃষ্ণা জয়ন্ত ছাড়া আর সকলে সমস্বরে বলেন—

"কি হল? কি হল? মিষ্টার ব্যানার্জি, আপনি ওরকম করছেন কেন?" কৃষ্ণা জয়ন্তর হাত ছেড়ে এগিয়ে এসে হাসিমুখে বললে—"কি হয়েছে দেখবে? এই দেখ!"

বলে পদ্মফুলের মতো বাম করতল তুলে দেখালে অনামিকাতে অল্পক্ষণ আগে মলির আঙ্গুলে যে আংটি শোভা পাচ্ছিল সেটি জলজল করছে। সকলে বিস্মিত, বাক্যহত। জয়ন্তও তখন এগিয়ে এসে সলজ্জভাবে বললে—

"কই, কেউ আমাদের কন্‌গ্র্যাচুলেট্ করবে না ?"

জয়ন্তর মা ও কৃষ্ণার মা পরস্পরের গলা জড়িয়ে হু হু শব্দে কেঁদে ফেলেন— "ও দিদি! এত সুখ কি সইবে ?"

মিষ্টার ব্যানার্জি সহসা জেগে উঠে তাঁদের মাঝখানে ছুটে গিয়ে তাঁদের আলিঙ্গন বিচ্ছিন্ন করে দেন—

"থামুন, থামুন, একটু প্রি-মেচ্যুর হয়ে যাচ্ছে।"

সে আবার কেমন কথা ? বিস্ময়ে সকলের মুখ হাঁ হয়ে যায়।

অনুতাপের বশে বাঁ হাত দিয়ে নিজের মাথা থেকে কয়েক গুছি পাকা চুল ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে মিষ্টার ব্যানার্জি বললেন,

"আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন, একটা সাংঘাতিক ভুল করে ফেলেছি। ও উইলটা ঠিক নয়, ওটা আমার ছিঁড়ে ফেলা উচিত ছিল। এইটা হল আসল উইল। জয়ন্ত, কৃষ্ণা, তোমাদের পরস্পরকে বিবাহ করবার দরকার নেই। যাও, মল্লিকে অশোক বসুকে ডেকে আনো। নকুড় তার শেষ উইলে সম্পত্তিটাকে তোমাদের দুজনের মধ্যে সমান ভাবে ভাগ করে দিয়ে গেছে, কোনও কণ্ডিসন্ নেই। কৃষ্ণা, ওর আংটি ওকে ফিরিয়ে দাও।"

কৃষ্ণার মা জয়ন্তর মার কাছ থেকে খানিকটা সরে দাঁড়ান। সকলের চক্ষু জয়ন্ত কৃষ্ণার উপর আবদ্ধ হয়, উভয়ে ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে, পরস্পরের হাত ধরে আরেকটু এগিয়ে আসে।

"কই, কেউ আমাদের কন্‌গ্র্যাচুলেট্ করবে না ?"

কৃষ্ণার মা জয়ন্তর মা পুনরায় পরস্পরের কণ্ঠলগ্ন হয়ে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করতে থাকেন। মিনুদিদি, টুনিদিদি, বমলামাসিমা, পানুবাবু, অর্দ্ধেন্দুবাবু, যোগেশদা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে বললেন,

"কন্‌গ্র্যাচুলেসন্স।"

মাথার উপর দেয়াল ঘড়িতে টং টং করে সন্ধ্যা সাতটা বাজল। যবনিকা পতন।

বন

ফেলাদা বললেন, ভালো জিনিসকে যে সব সময়ই ভালো হোতেই হবে এ আবার একটা কাজের কথা হল না কি? যেমন ধর না, এই যে বিয়ে থার নতুন আইন হল, এগুলোকে কি সব ক্ষেত্রেই ভালো বলা চলে? আমাকে তো প্রাণের দায়ে এক সপ্তাহের মধ্যে তিনটে বিয়ে করতে হয়েছিল। কি মন্দটা হয়েছে শুনি। কি, অবাক হলি নাকি? শোন। সেবার আমিও এম্-এ পাশ করে বাড়ি গেলাম, বাবাও মহা হাঙ্গামা বাধিয়ে দিলেন। জানিস তো দামোদরের ধারে আমাদের চাঁপাডাঙা গাঁয়ে বাবার কি প্রবল প্রতিপত্তি ছিল। তেজারতি করে মেলা পয়সা কামিয়েছেন, এখন ধরাখানাকে সরাখানা মনে হয়, ছেলের উপরো তম্বি।

কবে থেকে কি একটা আমবাগান বন্ধক ছিল বাবার বন্ধু বঙ্কুবাবুর কাছে; তিনি এখন সব কাগজপত্র ছেড়ে দিতে রাজী যদি আমি তাঁব মেয়ে বিয়ে করি। কম পরীক্ষা গেছে আমাব ওপর মনে করিস? বিয়েতে আমার একেবারে মত নেই, তায় সে ছিল এক সাংঘাতিক মেয়ে, রোগা টিংটিঙে, মাথায় কতকগুলা ঝাঁটাকাঠির মতো সোজা সোজা চুল, গায়ের রং রোদে পুড়ে ঝামা, আর চোখে মুখে কথা বলে; ওদিকে আকাট মুখ্যু, কিন্তু তর্কে ওর সামনে দাঁড়ায় কার সাধ্যি!

বেগতিক দেখে আমি স্রেফ কাউকে কিছু না বলে একদিন রাত্রে কেটে পড়লাম। শঙ্কটের হাত থেকে রক্ষা পাবার ওর চাইতে ভালো উপায় আর নেই, এই তোদের বলে রাখলাম।

যাই হক, এখানে ওখানে পালিয়ে বেড়াচ্ছি, এমন সময় এটাওয়া ষ্টেশনে আসামের ওদিককার এক কুমার বাহাদুরের সঙ্গে আলাপ হল, খানদানী ঘর তাঁদের, নাম বললেই চিনে ফেলবি, তাই আর বললাম না। আমার নামও জানেন না, ছদ্মনামেই তখন ঘোরাফেরা করছিলাম কি না। নইলে আর এখানে বসে তোদের মতো লোকের সঙ্গে গুলতানি করতে হত না, এদ্দিনে হয় একটা উঁচু মসনদে চড়ে বসতাম, নয় তো একটা সোনার তিনকোণা ঢালের উপর আমার কাটা মুণ্ডুটা কবে শোভা পেত।

কি, বিশ্বাস হচ্ছে না? তবে শোন। পৈতের সময় পাওয়া ঠাকুরদার হীরের অংটি তিন হাজার টাকায় বেচে, তাই দিয়ে ফার্ষ্ট ক্লাসে যাতায়াত করছি তখন। মনে কেমন একটা বেপরোয়া ভাবও এসে গেছে, কিছু ভালো কাপড়

চোপড়ো কিনে ফেলেছি, আর ইয়ে—কি—বলে, সে তোরা যাই বলিস না কেন, চেহারাটাও এমন কিছু মন্দ ছিল না। মেয়েরা তো প্রায়ই—সে যাক গে। শোনই তো।

মোট কথা রেলের ছোট্ট কামরায় দিনের পর দিন এক সঙ্গে বসে থেকে কুমার বাহাদুরের সঙ্গে খুব দহরম মহরম হয়ে গেল, শেষ পর্যন্ত তাঁর অনুরোধ এড়াতে না পেরে চলে গেলাম তাঁদের সঙ্গে আসামের পূর্ব প্রান্তে।

সেখানে তাঁর হাতী ধরার খেদার কথা কে না জানত। তাছাড়া বাঘ শিকারী বলে তাঁর নামডাকো ছিল। এমনি একটা কৌতূহল ছিলই মনে মনে, আবার ভাবলাম সেখানে গেলে বাবা আমার নাগাল পাবেন না, তাছাড়া বুদ্ধি করে অন্য নাম আর পরিচয় দিয়েছি যখন, তখন আর ভয় কিসের?

যে সব জঙ্গলে বাঘ আর হাতী ঘুরে বেড়ায়, গেছিস কখনো সেখানে? সে এমনি জায়গা যে তার গাছপালা তো অন্য রকমেরি, মানুষের প্রকৃতি পর্যন্ত কি যেন কেমন ধারা। পথে সিলং-এ দুদিন থেমেছিলাম। সেখানকার ফরেষ্ট আপিশের দরজার উপর লেখা আছে, "বন থেকে মানুষকে তুলে আনা যায় বটে কিন্তু মানুষের মন থেকে বনকে তুলে ফেলা যায় না।"

সেই ঘোর বনের মাঝে হাতী ধরার খেদায় বসে সেই কথা যে কতবার মনে হয়েছিল, সে আর কি বলব।

খেদায় পৌঁছেই আমাকে ধরে আনবার জন্য কুমার বাহাদুরের এত আগ্রহের একটা কারণ খুঁজে পেলাম। আমরা ঢুকবামাত্র শিকারীদের মতো খাকি পোষাক আর ব্রীচেস পরে কুমার বাহাদুরের বোন দিলারি বেরিয়ে এলেন। কি, হাসছিস যে বড়, এর চাইতেও অনেক আশ্চর্য জিনিস দুনিয়াতে হয়। তোদেরি তো—সে যাক গে।

পানুকাকা একটা ঢোক গিয়ে বলে যেতে লাগলেন.

প্যাণ্ট পরে থাকলে কি হবে, তবু মনে হোল সে যেন নারীত্বের প্রতিমূর্তি। তাছাড়া কি তার গায়ের জোর, যে-সব বন্দুক আমার ছুঁতে কেমন নার্ভাস লাগত, সে দিব্যি মাঝখানে থেকে মটকে গুলিটুলি নিয়ে কি সব করত। কি তার সাহস, যে সব বনের মধ্যে দিনের বেলাতে ঢুকতে ভয় করে, কাঁধে একটা বন্দুক তুলে, কোমরের বেল্টে একটা দুদিকে ধার দেওয়া ছোরা গুঁজে, সে অনায়াসে বাঘ খুঁজে বেড়াত। কি খাসা ইংরিজি বলত, শুনলে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়, আর রাঁধত যা, গুলাস, চিকেন ম্যারিনেটেড—সে সব রাঁধা দূরের কথা, খাসও নি কখনো, এমন কি হয়তো নামও শুনিস নি।

ফেলাদা আরেকবার থেমে এদিক ওদিক চেয়ে বলতে লাগলেন:

তার উপর কি আশ্চর্য সবুজ চোখ ছিল তার, তাকালে মনে হোত মণির পেছনে আলো জ্বলছে। কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে

চোখাচোখি হয়ে যেত। আমার কান লাল হয়ে উঠত, ও কিন্তু চেয়েই থাকত, চোখ আর ফেরাত না। কাঁচের মতো স্বচ্ছ সবুজ চোখ, ধারগুলো গাঢ় ঘন সবুজ, তার চারদিকে লম্বা লম্বা বাঁকা বাঁকা পক্ষ্ম, চোখ খুললে তাই দিয়ে ভুরু ঢেকে যায়। ধনুকের মতো ভুরু। ভুরু যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানটা একটু নিচু মতন, তার পাশে কয়েকটা মিহিমিহি শিরা, ঠিক নীলো নয় আবার সবুজো নয়—সে আমি মুখে বলতে পারব না। আচ্ছা, তোরা অমন করে চেয়ে আছিস যে, কিছু বলবার থাকে তো বললেই পারিস। আর কিছু বলবার না থাকে তো শোন। ও, হ্যাঁ, আর সে ছিল দারুণ ফর্সা।

তোরা কাকে ভালোবাসা বলিস তা জানি না, এতটা বয়স হল, আমি নিজেই জানি না ছাই—তা যাক গে, মোট কথা ওর চোখ থেকে চোখ সরাবার ক্ষমতা আমার লোপ পেত, হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যেত, কেমন যেন নেশা নেশা মনে হত। বুঝতাম কুমার বাহাদুর তাই দেখে মৃদু হাসছেন, কিন্তু কিচ্ছু করবার সাধ্য ছিল না আমার।

একদিন ওকে এক গোছা ড্যাফ্‌নি ফুল দিয়েছিলাম। খেদার ঘেরার বাইরে ফুটেছিল, ছোট ঘন সবুজ গাছে, এক গোছা সাদা ফুল, কি তার সুগন্ধ। দিলারি বললে,

ওটি উপড়ে দাও, ঘরে নিয়ে গিয়ে লাগাব।

বিশ্বাস কর, ও গাছ তোলা যায় না। মেলা চেষ্টা করেছিলাম, সে দাঁড়িয়ে দেখলে, ঠোঁটে একটু হাসি লেগে থাকল। গাছটাকে তুলতে না পেরে শুধু ফুলের গোছাটি তুলে ওর হাতে দিয়েছিলাম। মনটা তখন এমন হয়েছিল, যা কিছু করে ফেলতে পারতাম। কুমার বাহাদুর এসে পড়াতে অবিশ্যি কিছুই করিনি।

সেই রাত্রে খাবার পর উনি হঠাৎ বিয়ের কথা পাড়লেন। আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম, বারবার বললাম আমি নিতান্ত অযোগ্য, টাকা পয়সাও তেমন নেই, বংশও—কুমার বাহাদুর কাষ্ঠ হেসে বললেন, ওর বর বিয়ের আসন ছেড়ে চলে গেছিল সে আজ আট বছর হল ; ওর অত বাছ বিচার করা চলে না। তাছাড়া ভদ্রলোকের মেয়ের হাতে ড্যাফ্‌নি ফুলের গোছা দেবার সময় অযোগ্যতার কথা মনে ছিল না ? পুরুত ঠাকুর আছেন, আধ ঘণ্টা পরেই লগ্ন, তৈরী থেকো।

কথাটার যেন নিষ্পত্তি হয়ে গেল, এমনি করে কুমার বাহাদুর উঠে পড়লেন।

আমি খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই দিলারির সঙ্গে চোখাচোখি হল।

দিলে ধরে ওরা সত্যি সত্যি আমার বিয়ে। চারিদিকে ওদের লোক,

বনের মাঝখানে খেদা, পালাবার উপায়ও ছিল না, আর সত্যি কথা বলতে কি, বিশেষ ইচ্ছাও ছিল না। পুরুত ঠাকুর দেখলাম শিকারীদেরই একজন, অবসর সময় যজমানি করেন শুনলাম ; দারুণ ভালো বাঘ-শিকারীও।

বড় তাঁবুটিতে ওরা বাসর সাজাল। কে বাসর জাগবে? সে তল্লাটে দিলারি ছাড়া কোনো মেয়েই নেই, আর তারো দেখা নেই। অনেকক্ষণ বাদে, আর ধৈর্য ধরতে না পেরে গুটি গুটি বেরিয়ে পড়লাম। রাতে খেদার ধারে ধূনি জ্বালানো হয়, তার আলোয় দেখলাম, ওরা বিকেলে হরিণ মেরে এনেছে, তার ছাল ছাড়ানো হচ্ছে। কুমার বাহাদুর আর দিলারি দুদিকে ধার দেয়া ছুরি নিয়ে তাদের সঙ্গে জুটে গেছেন।

কি বলব তোদেব, তাই দেখে মনের মধ্যে একটা জোর পেলাম, সিংহের মত বল পেলাম, আমাব যৌতুকে পাওয়া নতুন বন্দুকটা ফেলেই স্রেফ পালিয়ে গেলাম। কি সাহস ভাব!—

ঘোর জঙ্গলে চাঁদনি রাতে গেছিস কখনো? কোথাও ঘন অন্ধকারে চোখ অন্ধ হয়ে যায়, আবার এক পা গেলেই ফুট ফুট করছে জ্যোৎস্না। কোথাও বাঁশঝাড় এমনি ঘন যেন একটা দুর্ভেদ্য দেযাল, পাঁচ হাত পরেই একেবারে ফাঁকা। আলোতে অন্ধকারে এমনি ছাযাবাজি খেলে, যে বারে বারে মনে হয় সামনে বুঝি ডোরা কাটা বাঘ : আবার চোখেব পাতা না ফেলতেই বাঁশ গাছের পাতা দোলে, বাঘেব ভুল ভেঙ্গে যায। দেখি সামনে কিছু নেই, খাঁ খাঁ করছে বন ভরা চাঁদের আলো। চাবপাশে ছায়ায় মোড়া বাঁশঝাড়। ভাবি কি হল, কি হল, আবার দেখি আলো অন্ধকার রূপ নিয়েছে, সামনে দাঁড়িয়ে আস্ত শাঁখের বালা পরা, হলদে কালো ডুরে সাড়ি গায়ে রূপসী জংলি মেয়ে।—

উঃ, কি বলব তোদের আরেকটা মানুষ দেখে যেন প্রাণ ফিরে পেলাম। কিন্তু মানুষ তো? হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলাম, অমনি সে—কি বলব তোদের, বিশ্বাস কর এর মধ্যে আমার সত্যি কোনো হাত ছিল না—সে নিজের গলার মালা খুলে আমাব গলা রয়ে দিলে—অমনি চারদিকে ঢোল বেজে উঠল একদল বুনো লোক আমাকে যেন ঘিরে ফেলল। জানি কেউ কোথাও নেই, কিন্তু ঐ মেয়েটা কি শেষে আমাকে গন্ধর্ব মতে বিয়ে করে ফেলল না কি?

জানিস তো বিপদে পড়লেই মানুষের বুদ্ধি খুলে যায়, আমারো তাই হোল। স্রেফ টেনে দৌড় দিলাম। ফিরেও তাকালাম না, কি জানি যদি মত বদলায়, কিম্বা ও যদি—যাক গে। একবারো থামলাম না, পূব দিক ফর্সা হয়ে এল, বারো মাইল দৌড়ে রেল ষ্টেশন পেলাম, একটা মালগাড়ি ছাড়ছিল তাতেই চেপে গেলাম, আড়াই দিন পরে আবার দামোদরের ধারে চাঁপাডাঙা গাঁয়ে পৌঁছেই শুনি আমাদের বাড়িতে শানাই বাজছে। আমাকে দেখেই বাবা বললেন, ঠিক জানি, তেজ দেখিয়ে মামা বাড়িতে লুকিয়ে থাকা হয়েছে, একটি তার ঝেড়ে

দিলেই চাঁদ সুড় সুড় করে বাড়ি এসে ছাদনা-তলায় দাঁড়িয়ে যাবেন—কি ওটা, পলার মালা পরেছিস গলায়, লক্ষ্মীছাড়া? খুলে ফেস বলছি, এটা সন্নিসির মন্ত্র নেবার সময় নয়।

কি বলব তোদের, কাষ্ঠ হেসে পলার মালাটা ছিঁড়ে ফেলে গায়ে-হলুদের পিঁড়ের উপর উঠলাম। কি মন্দটা করলাম তাই বল? আর না করেই বা কি উপায় ছিল? এখন তোরা আইন করিস আর যাই করিস।